কলিকাতা, বর্ধমান, যাদবপুর ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী অনুসারে
ত্রিবার্ষিক স্নাতকশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য লিখিত

শাসনতন্ত্র

[গ্রেট-ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও সুইজারল্যাণ্ড]

শ্রীপ্রদীপ সর্ব্বাধিকারী বি. এস্‌সি. (ইকন্), পি.এইচ্. ডি.
অধ্যাপক, ইণ্টারন্যাশনাল রিলেশন্‌স্, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
ও
শ্রীঅসীম ঘোষ বার-এ্যাট্-ল

বিদ্যাভবন
১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীগুরুপদ ঘোষ
৬৪, স্যার বি. সি. রোড, বর্ধমান

প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৬৩

মুদ্রাকর :
শ্রীনিত্যানন্দ চৌধুরী
নিউ অ্যাসোসিয়েটেড প্রিণ্টার্স
৩, মসজিদ বাড়ী স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষাদানের নীতি আজকাল সর্বত্র স্বীকৃত। কিন্তু বাংলা ভাষায় শাসনতন্ত্র বিষয়ে উপযুক্ত পুস্তকের অভাব সকলেই অনুভব করেন। এই অভাব পূরণের জন্য আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। বর্তমানে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে যে বিপুল পরিমাণ গবেষণা ও আলোচনা দেখা যাইতেছে, উহাদের ভিত্তিতে এই পুস্তক রচনার চেষ্টা করা হইয়াছে। আশা করি এই পুস্তকে ছাত্রছাত্রীরা এই সকল আধুনিকতম আলোচনার আস্বাদ লাভ করিবেন। যদি এই পুস্তকপাঠে ছাত্রছাত্রীদের রাজনৈতিক ও শাসনতন্ত্রবিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি পায় তবে আমাদের শ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব।

গ্রন্থকারদ্বয়

বিষয় সূচী

প্রারম্ভিক

সংবিধান কি ও কেন?

রাষ্ট্রের সাংগঠনিক প্রকাশ সংবিধানে। যে সব বিধি ও রীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সরকারের মাধ্যমে প্রযুক্ত হয়, যৌথভাবে তাকেই সংবিধান বলা চলে। লর্ড ব্রাইস বলেছেন, সংবিধান হল আইনের দ্বারা সংগঠিত একটি রাজনৈতিক সমাজ; অর্থাৎ আইনের দ্বারা যখন কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষমতা ও অধিকারসম্পন্ন স্থায়ী সংগঠন গড়ে ওঠে, তখনই সংবিধানের সূত্রপাত।[1]

আরও বিশদ করে বলতে হলে, সংবিধানকে কতকগুলি নীতির সমষ্টি হিসেবে বর্ণনা করা যায়, যেসব নীতি অনুসারে সরকারের ক্ষমতা, শাসিতের অধিকার এবং এই দুই-এর সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। সংবিধান নানাভাবে গড়ে ওঠে। কোনও কোনও দেশে ব্যাপক আলোচনান্তে কাগজে-কলমে লিখিতভাবে সংবিধান রচনা করা হয়েছে। কোথাও আবার কতকগুলি মূলগত আইনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে সংবিধানের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং শাসন পরিচালনার অন্যান্য পর্যায়ে কতকগুলি অলিখিত প্রথা বা রীতিকে অপরিহার্য বলে মনে নেওয়া হয়েছে। একথা অবশ্য খুবই সত্য যে, লিখিত আইন আর অলিখিত প্রথার মধ্যে গুরুতর কোন পার্থক্য নেই। কেননা, সংবিধান যতই বিস্তারিতভাবে লেখা হোক না কেন, সময়ের প্রভাবে রাষ্ট্রব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন আসতে বাধ্য এবং তার ফলে নতুন নতুন রীতি ও প্রথার উদ্ভব হতে থাকে। এছাড়া, সংবিধান তখনই কার্যকরী হয় যখন জনসমষ্টি তাকে মেনে নেয়। কাজেই প্রয়োজন হলে জনমতের চাপে সংবিধানের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

সংবিধানের প্রকৃতি
Nature of the constitution

1"...a frame of political society, organised through and by law, that is to say, one in which law has established permanent institutions with recognised functions and definite rights." – Bryce ; 'Studies in History & Jurisprudence' Vol. I.

লিখিত হোক বা অলিখিত হোক, মোটের ওপর সংবিধানের মধ্যে যে সমস্ত বিষয়ে নির্দেশ থাকা দরকার তা হল: প্রথমতঃ, কি ভাবে সরকারের বিভিন্ন সংস্থাগুলি সংগঠিত হবে; দ্বিতীয়তঃ ঐ সব সংস্থার ওপর কি কি ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করা হবে; এবং তৃতীয়তঃ, এই ক্ষমতা ও দায়িত্ব কিভাবে প্রয়োগ ও পালন করা হবে। এদিক থেকে জৈবিক মতবাদের (Organic Theory) অনুসরণে বলা যায়, সংবিধান হল রাষ্ট্রদেহের নিয়ামক শক্তি। সংবিধানের উদ্দেশ্যই হল শাসনব্যবস্থায় যাতে স্বেচ্ছাচারের প্রবেশ না হয় তার ব্যবস্থা করা এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও জন-অধিকারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা।[2] নিযন্ত্রিত শাসনব্যবস্থায় বিশ্বাসই সংবিধান প্রবর্তনের মূল কারণ। এই নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি ও ব্যাপকতা নির্ভর করে কি কি প্রাথমিক উদ্দেশ্য নিযে সংবিধান রচনা করা হয়েছে তার ওপর। সংবিধান রচনার একাধিক উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রথমতঃ শাসনব্যবস্থা যাতে ইচ্ছামত পরিবর্তিত বা বিকৃত না হয় তাব রক্ষাকবচ হিসেবে সংবিধান চালু করা হয। কোন কারণে শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য হলে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থা থাকে। দ্বিতীয়তঃ, সংসদ, কার্যপালিকা-বিভাগ এবং বিচারপর্ষৎ—সরকারের এই তিনটি বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ সংবিধানের অন্যতম উদ্দেশ্য। কার্যপালিকাবিভাগ সংসদের কাছে কতদূর দায়ী থাকবে বা বিচারপর্ষৎ-এর কতখানি স্বাধীনতা থাকা উচিত সে সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ না থাকলে শাসনব্যবস্থায় গোলযোগের সৃষ্টি হতে পারে। লিখিত সংবিধানে এই গোলযোগের অনেকটা নিরসন হয়। তৃতীয়তঃ, কতকগুলি মানবাধিকারের মৌলিক গুরুত্ব এত বেশি যে সরকারী হস্তক্ষেপ থেকে সেগুলি সংরক্ষণের জন্য সংবিধানের প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন হয়। চতুর্থতঃ, সংসদের আইন প্রণয়নের ব্যাপারেও কোন কোন সংবিধানে সীমারেখা নির্দেশ করে দেওয়ার প্রয়োজন থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় কেন্দ্রীয় সরকার আর রাজ্যসরকারের আইনপ্রণয়নের অধিকার বা এক্তিয়ারের সুস্পষ্ট সীমানা

সংবিধানের বিষয়বস্তু
Contents of the constitution

সংবিধানেব উদ্দেশ্য
Purposes of a constitution

[2] The objects of a constitution, in short, are to limit the arbitrary action of the government, to guarantee the rights of the governed and to define the operation of the sovereign power" — C. F. Strong : Modern Political Constitutions, P. 10

নির্ধারিত না হলে এধরনের দ্বৈতশাসন চালানো সম্ভব নয়। আবার কোন কোন দেশে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণে কতকগুলি আইনপ্রণয়নের অধিকার সংসদের হাতে দেওয়া না দেওয়ার ব্যাপারে অনেক বাধানিষেধ রয়েছে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ex post facto (ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর) আইন, আয়র্ল্যাণ্ডে বিবাহ-বিচ্ছেদের আইন (১৯৩৭-এর সংবিধানে), সুইজ্যারল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকায় সাম্প্রদায়িক আইন ইত্যাদি। সুতরাং সংবিধানগত নিয়ন্ত্রণের স্বরূপ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের। তবে সর্বত্রই এই নিয়ন্ত্রণকে স্বীকৃতি দিতে গিয়ে সংবিধানের সার্বভৌমিক প্রাধান্য মেনে নিতে হয়েছে। একথা তাই বলা চলে যে রাষ্ট্রের আইনগত সার্বভৌমত্ব সংবিধানেই নিহিত।

সংবিধানের প্রাধান্যের ভিত্তি: Basis of the authority of a Constitution

এখন প্রশ্ন হতে পারে সংবিধানের এই প্রাধান্যের ভিত্তি কি? নৈতিক দিকে থেকে বিচার করতে গেলে বলতে হয়, সংবিধান যেহেতু সাধারণ আইনের ঊর্ধ্বে মূলগত আইনের পর্যায়ে পড়ে, সেইহেতু সংবিধানকে আইন-শৃঙ্খলা প্রবর্তন ও সংরক্ষণের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে হয়।[৪] এই প্রসঙ্গে প্রাচীন রাষ্ট্রতত্ত্ববিদগণের প্রাকৃতিক অধিকারবাদের ধারণাও উল্লেখযোগ্য। এই মতবাদ অনুযায়ী, মানুষের কতকগুলি জন্মগত অধিকারের সংরক্ষণই রাষ্ট্রকর্তৃত্বের মূল উদ্দেশ্য এবং বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষাতেই আইনের যৌক্তিকতা। এর স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত হল, রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব একটি মহত্তর নিয়ম বা শৃঙ্খলা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। সংবিধানকে সেই মহত্তর শৃঙ্খলার মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে বলেই শাসনব্যবস্থা সংবিধান অনুসারে পরিচালিত হওয়া দরকার। আবার আইনবিদগণের মত অনুসরণ করলে দেখা যাবে, এমন একটি সংস্থার দ্বারা সংবিধান রচনা করা হয়ে থাকে যার আইনগত প্রাধান্য সর্বজনস্বীকৃত এবং কাজে কাজেই সংবিধানের চরম ক্ষমতাও সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত। এই সংস্থা রাষ্ট্রের সমগ্র জনসংখ্যার দ্বারা বা তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হতে পারে, যেমন ভারতবর্ষে হয়েছে; আবার ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত ডমিনিয়ন-

[৪] "a Constitution commands obedience because it is by nature a superior or supreme law"—K. C. Wheare Modern Constitutions, P. 91. Marbury V. Madison মামলায় মার্কিন সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি মার্শালও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

গুলির ক্ষেত্রে একটি বাইরের সংসদের ওপর সংবিধান প্রবর্তনের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। মোটের ওপর সংবিধানের প্রাধান্য একটি জনসমর্থিত সংস্থার সার্বভৌমিকতা থেকেই সৃষ্ট হয়। আধুনিক যুগের অধিকাংশ সংবিধানেই তাই জনগণকে সার্বভৌমিক ক্ষমতার উৎস বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। আসলে জনগণের ইচ্ছার প্রতীক বলেই সংবিধানকে শাসনপরিচালনায় মান্য করা হয়। সমাজতাত্ত্বিকেরা এই থেকেই সিদ্ধান্ত করে থাকেন যে, একটি দেশের শাসনব্যবস্থা—সংবিধানের লিখিত নির্দেশ-নিরপেক্ষ ভাবেই—নির্ভর করে সেই দেশের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তির ওপব। সংবিধান প্রকৃতপক্ষে দেশের সমাজব্যবস্থারই প্রতিফলন।

সংবিধান ও সমাজব্যবস্থা :

তুলনামূলকভাবে সংবিধানের আলোচনা করতে গেলে সংবিধানের বিভিন্ন ধারার আইনগত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলেই চলে না। যে-সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির ওপর সংবিধান নির্ভব করে আছে সেগুলিবও সম্যক ধারণা থাকা দরকার। রাজনৈতিক সংস্থাগুলি যে নিয়ত পরিবর্তনশীল সেকথা স্মবণ রাখতে হবে। বাহ্যিক আকার অপরিবর্তিত থাকলেও এই সংস্থাগুলিব গতি-প্রকৃতি এবং কার্যধাবা নানা কারণে পরিবর্তিত হতে থাকে। যেমন স্বৈরাচার থেকে ব্রিটিশ রাজতন্ত্র কিভাবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিল অথবা একই ধরনের রাজনৈতিক সংস্থা কেন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম অনুসরণ করে—এসব প্রশ্ন অবধারিতভাবেই রাজনীতিব অন্তরালে সামাজিক কাঠামোর প্রতি ইংগিত করে থাকে।

রাজনৈতিক কর্তৃত্বের কাজ হল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ। সুতরাং রাজনৈতিক সংস্থা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। আবার সমাজ যেহেতু গতিশীল সেইহেতু এই সম্পর্কের ভারসাম্য মাঝে মাঝে নূতন নূতন শক্তির উদ্ভবে বিঘ্নিত হয়। তখন রাজনৈতিক সংস্থাগুলিকেই সমাজের নূতন প্রযোজনের তাগিতে পরিবর্তিত ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। সেই কারণে একটি দেশের সংবিধানের মূলনীতিগুলি অনুসরণ করতে হলে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করা দরকার। সালে অনুন্নত কৃষি-প্রধান যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এখন সে-দেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রাগ্রসর, একচেটিয়া ব্যবসার কেন্দ্রস্থল এবং পাশ্চাত্য জগতের রাজনৈতিক

পুরোধা। সে-দেশের রাজনৈতিক সংস্থাগুলির ওপব যে এই ব্যাপক প্রগতির প্রতিচ্ছায়া বা প্রভাব পড়েছে সে-কথা বলাই বাহুল্য। মার্কিন প্রেসিডেন্টের যে বর্তমান সর্বময় প্রভুত্ব, তার হদিস এই দেড়শতাধিক বৎসবের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর বাজনৈতিক সংস্থাগুলি গড়ে ওঠে বলেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেটব্রিটেনের সংবিধানেব মধ্যে কতকগুলি বাহ্যিক আকাবগত পার্থক্য থাকলেও, একটি ভিন্ন ধবনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (যেমন সোভিযেট বাশিযা) সঙ্গে তুলনা কবলে উভযেব মধ্যে কতকগুলি মূলগত সাদৃশ্য খুঁজে পাওযা যাবে। একই কাবণে, বাজনৈতিক সংস্থাগুলিব মধ্যে আকারগত সাদৃশ্য থাকলেও, সমাজব্যবস্থাব বিভিন্নতাব দরুন সেই সব সংস্থাব বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কার্যক্রম দেখা যায।

সংবিধানের প্রকারভেদ :

সমাজশক্তিব কথা বাদ দিযেও শুধুমাত্র বাহ্যিক আকৃতির দিক থেকে আলোচনা কবলে, বিভিন্ন দেশেব সংবিধানে কতকগুলি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য দেখা যাবে। বাষ্ট্রবিজ্ঞান-আলোচনাব প্রথম যুগে আইসক্রেটিস, প্লেটো এবং বিশেষ কবে অ্যাবিস্টটল এ-বিষযে মনোযোগী হযেছিলেন। কিন্তু বাষ্ট্র কথনই স্থাণু নয, যুগপবিবর্তনেব সঙ্গে সঙ্গে বাষ্ট্রেব সংগঠন-ব্যবস্থায এমন সব অসংখ্য পবিবর্তন এসেছে যাব পূর্বাভাস গ্রীক দার্শনিকদেব আলোচনায পাওযা সম্ভব নয়। এছাড়া, বাষ্ট্রসংগঠনে এতই বৈচিত্র্য যে, কোন একটি মাত্র নীতি অনুসবণ করে পৃথিবীব সব বাষ্ট্রকে এক একটি শ্রেণীভুক্ত কবা চলে না। কতকগুলি সাধাবণ বৈশিষ্ট্যেব ক্ষেত্রে মিল থাকলেও অনেক পর্যাযেই একটি বাষ্ট্র থেকে আর একটি বাষ্ট্রেব পার্থক্য যথেষ্ট। এ যুগেব বাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তাই সংবিধানের শ্রেণীবিন্যাস কবতে গিযে একাধিক নীতিব অবতাবণা কবে থাকেন। যেমন যেমন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা হবে, বাষ্ট্রেব প্রকৃতি সেইভাবেই প্রকাশ পাবে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লিখিত ও অলিখিত এই দুইভাগে সংবিধানকে ভাগ কবা হযে থাকে। কিন্তু এ-ধরনেব শ্রেণীবিভাগেব কোন বাস্তব ভিত্তি নেই।

লিখিত ও অলিখিত সংবিধান
Written & Un-written Constitutions

কাবণ পৃথিবীতে কোন সংবিধানই সম্পূর্ণ অলিখিত বা সম্পূর্ণ লিখিত নয। গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানকে বলা হয অলিখিত সংবিধান। কিন্তু সেখানেও কতকগুলি লিখিত আইন বা বিধির মৌলিক প্রাধান্য স্বীকৃত হযেছে, যেমন অধিকারের সনদ উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর

ভোটাধিকার বিলসমূহ ১৯১১ ও ১৯৪৯ সালের পার্লামেণ্ট অ্যাক্ট ইত্যাদি। আবার ব্যাপকতম লিখিত সংবিধানের উদাহরণ হিসেবে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা হলেও, সেখানেও সংবিধান চালু হওয়ার পর থেকে একাধিক প্রথা বা রীতির উদ্ভব হয়েছে যেগুলি লিখিত আইনের পর্যায়ে পড়ে না। যেমন, ভারতীয় সংবিধানের ৫৩ এবং ৭৪।১ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিরই সর্বেসর্বা হওয়ার কথা। কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রের অপরিহার্য প্রভাবে মন্ত্রিসভাকেই কেন্দ্রীয় শাসনের সব দায়িত্ব নিতে হয়েছে। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র-প্রসাদের পর পর দুবারের কার্যক্রমে এই নীতি দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং লিখিত বা অলিখিত—এভাবে সংবিধানগুলিকে ভাগ করার অনেক অসুবিধা। আলোচনার সুবিধার্থে বড়ো জোর C F. Strong-এর ভাষায় এগুলিকে 'documentary' ও 'non-documentary' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান
Flexible & Rigid Constitutions

সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতিকে কেন্দ্র করেও সংবিধানের শ্রেণীবিন্যাস করা চলে। এক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখা দরকার। সংবিধান সুপরিবর্তনীয় কি দুষ্পরিবর্তনীয় সেটা সংবিধান লিখিত কি অলিখিত তার ওপর নির্ভর করে না। এখানে শ্রেণীবিন্যাসের মূলনীতি হল কি-পদ্ধতিতে সংবিধান সংশোধন করা হয়ে থাকে। যে-সব সংবিধানে সাধারণ আইনের মতই সংশোধনী প্রস্তাবগুলি বিধিবদ্ধ হয় সেগুলিকে সুপরিবর্তনীয় বলা যায়; আর যেখানে একটি বিশেষ পদ্ধতি, যেমন নির্দিষ্ট সংখ্যক সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনের প্রয়োজন সেখানে সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় বলা হয়। অবশ্য খুব কমসংখ্যক লিখিত সংবিধানই প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। একমাত্র নিউজীল্যাণ্ডের সংবিধানকেই এর উদাহরণ হিসাবে দাঁড় করানো যায়। পৃথিবীর আর সমস্ত লিখিত সংবিধানই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত, যদিও সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিতে কিছু কিছু পার্থক্য এখানেও বর্তমান। যেমন সোভিয়েট রাশিয়ায় সুপ্রীম সোভিয়েটের দুই কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সভ্যের সমর্থন যথেষ্ট হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে এ-ছাড়াও সহযোগী রাজ্য ব্যবস্থাপক সভাগুলিরও সম্মতি প্রয়োজন।

অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, কতকগুলি বিশেষ ধরনের আইনগত বাধা থাকলেই যে সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হবে তা সত্য নয়। এই অর্থে অনেক দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানই বহুবার সংশোধিত হতে দেখা গেছে; যেমন

সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধান। আবার প্রায় একই ধরনের সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থা থাকলেও, অস্ট্রেলিয়ার সংবিধান তেইশবারের চেষ্টায় মাত্র চারবার পরিবর্তিত হয়েছে। অধ্যাপক হুইয়ার তাই বলেছেন, কত সহজে বা কত দ্রুত সংবিধান সংশোধন করা যাবে সেটা সংশোধনের পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে না; নির্ভর করে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংস্থাগুলির পছন্দ-অপছন্দের ওপর।[4]

কেন্দ্রীয় সরকার এবং স্থানীয় সরকারের মধ্যে শাসনক্ষমতা কি-ভাবে বণ্টন করা হয়েছে সেদিক থেকে বিচার করলে সংবিধানগুলিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং এককেন্দ্রিক এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা : Federal & Unitary Constitutions

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় দুই ধরনের সরকারের মধ্যে শাসনক্ষমতা এমন ভাবে বণ্টন করা হয় যাতে উভয়েই নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে পারে। এখানে কোন সরকারই অন্য সরকারের অধীন (sub-ordinate) নয়, এবং উভয়েই উভয়ের সহযোগী (co-ordinate)। পক্ষান্তরে এককেন্দ্রিক শাসনে কেন্দ্রীয় সরকারকেই সার্বিক প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং স্থানীয় শাসন-সংস্থাগুলি তাদের কার্যক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুগ্রহে এবং অনুমতি-সাপেক্ষেই লাভ করে থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা করলে এখানে সহযোগিতার বদলে অধীনতার সম্পর্কই বেশি প্রকট বলে মনে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায়, লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান, নিজ নিজ ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলির স্বাতন্ত্র্য, সংবিধানের ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণের জন্য একটি সর্বময় কর্তৃত্বসম্পন্ন আদালত এবং দ্বিনাগরিকত্ব এই বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার সংবিধান নিখুঁত যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ। আবার যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে কতকগুলি এককেন্দ্রিক শাসনের বৈশিষ্ট্য থাকায় ভারতবর্ষের সংবিধান (১৯৫০) পশ্চিম জার্মানীর সংবিধান (১৯৪৯), সোভিয়েট সংবিধান (১৯৩৬) প্রভৃতিকে Quasi-federal state বা প্রায়-যুক্তরাষ্ট্র বলা হয়ে থাকে।

---

[4] "...The ease or the frequency with which a Constitution is amended depends not only on the legal provisions which prescribe the method of change but also on the predominant political and social groups in the community and the extent to which they are satisfied with or acquiesce in the organization and distribution of political power which the constitution prescribes" K. C. Wheare : Modern Constitutions. P. 23-24.

পক্ষান্তরে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার মধ্যে বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপ্তির কিছুট তারতম্য থাকলেও এদের মূলগত বৈশিষ্ট্য একই রকম এবং পৃথিবীর প্রা অধিকাংশ দেশেই এই ধরনের শাসনব্যবস্থা চালু আছে। ফ্রান্স, নিউজীল্যাণ্ড সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি এর উদাহরণ।

এককেন্দ্রিক আর যুক্তরাষ্ট্রীয়,—এদের মাঝামাঝি আর এক ধরনের শাসন ব্যবস্থা কল্পনা করা যায়। যখন কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তরাষ্ট্র গঠনেচ্ছু রাজ্যসরকার গুলির অধীনে থাকে তখন এই ধরনের বিচিত্র শাসনব্যবস্থার উদ্ভব হয়। এবে

রাষ্ট্রসম্মেলন
Confederations

রাষ্ট্রসম্মেলন বা Confederation বলা হয়ে থাকে কতকগুলি সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই বিভি রাজ্য একত্র হয়ে রাজ্যসম্মেলন গড়ে তোলে কিন্তু এ রাজ্যসম্মেলনের কার্যধারার ওপর তাদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে যথাযথ সার্বভৌম সরকার বলা চলে কিনা সে-সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। অতীতে রাজ্যসম্মেলন নিয়ে যেসব পরীক্ষানিরীক্ষ হয়েছে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের জন্মের প্রথম কয়েক বছর তার গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ এছাড়া ইউরোপের ইতিহাসে ১৫৭৯ থেকে নেদারল্যাণ্ডস ইউনিয়ন, বিভি জার্মান কনফেডারেশন এবং অস্ট্রো-হাংগেরীয় যুক্তশাসনব্যবস্থায় এর চিহ্ন র গেছে। বর্তমান যুগের জাতিসংঘ এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে এক অর্থে এ পর্যায়ে ফেলা যায়।

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতাবণ্টনের ভিত্তিতে যেমন এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ করা হল, সেইরকম একই সরকারে

রাষ্ট্রপতিশাসিত ও মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত শাসন-ব্যবস্থা :
Cabinet and Presidential forms of government

সংসদীয় ও কার্যপালিকা বিভাগের মধ্যে ক্ষমতাগত সম্পর্কের ভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত এই দুই ধরনের সংবিধানের কথা বলা যায় প্রথমটিতে ক্ষমতাবিভাজন করা হয় না; দ্বিতীয়টিতে দু বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার সীমারেখা স্থির করে দেওয় হয়। আরও বিশদ করে বলতে হলে, প্রথমটিতে কার্যপালিকাবিভাগ সংসদে কাছে যৌথভাবে দায়ী থাকে এবং সংসদের সমর্থনের ওপরই তার স্থায়ি নির্ভর করে। দ্বিতীয়টিতে সংসদের সঙ্গে কার্যপালিকা বিভাগের সরাসরি কোন যোগাযোগ থাকে না এবং দায়িত্বেরও প্রশ্ন ওঠেনা। আয়র্ল্যাণ্ড ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানে প্রথমোক্ত ধরনে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। এই সব দেশে কার্যপালিকাবিভাগের সর্বম

কর্তা হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ সংসদের কাজে যৌথভাবে দায়ী থাকে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও মধ্য আমেরিকার দেশগুলিতে ক্ষমতাবিভাজনের নীতিকে সাধারণভাবে স্বীকার করে নিয়ে রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে।

এই দিক দিয়ে বিচার করলে অবশ্য সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধানকে কোন শ্রেণীতেই ফেলা চলে না। সুইজারল্যাণ্ডের ফেডারাল কাউন্সিল সংসদের উভয়কক্ষের সম্মিলিত অধিবেশনে নির্বাচিত হলেও, কাউন্সিলের সদস্যগণ কেউই সংসদের সভ্য থাকেন না এবং তাঁদের কার্যকাল সংসদের উপর নির্ভর করে না। এক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত ব্যবস্থার মধ্যে একটি সুন্দর মধ্যপন্থা সৃষ্টি হয়েছে।

সুইজাবল্যাণ্ডেব বিচিত্র শাসন-পবিষদ—
The Swiss Executive, a peculiar institution

এছাড়া সংবিধানেব শ্রেণীবিন্যাস করতে গিয়ে আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা প্রাসঙ্গিক ভাবেই এসে পড়ে। যেমন, কোন কোন দেশের সংসদ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট; আবার কতকগুলিতে দ্বিতীয় বা উচ্চতর কক্ষের অস্তিত্ব নেই। অবশ্য একটি মাত্র কক্ষবিশিষ্ট সংসদ ফিনল্যাণ্ড নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি মাত্র কয়েকটি দেশেই বর্তমান। অধিকাংশ রাষ্ট্রেই সংসদের দুটি কক্ষ রয়েছে। কোন কোন দেশে আবাব উচ্চতব কক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংগঠিত হয—যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট, ভারতের রাজ্যসভা, সোভিয়েট রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, আয়র্ল্যাণ্ড, সুইজাবল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের উচ্চতর কক্ষ। অন্যদিকে গ্রেট ব্রিটেনের হাউস অব লর্ডস, কানাডার সেনেট প্রভৃতি নির্বাচনের মাধ্যমে সংগঠিত হয না। এছাডা, রাজনৈতিক দলের সংখ্যা, সংসদীয় আইন ও কার্যপালিকা বিভাগের সিদ্ধান্তের ওপর বিচার বিভাগের সমীক্ষণের ক্ষমতা, নির্বাচনকেন্দ্রেব সংগঠন, আনুপাতিক অথবা সরাসরি প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা—এ-সমস্ত দিক দিয়েও সংবিধানগুলির নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া এবং সুইজারল্যাণ্ড এই চারটি দেশের শাসনব্যবস্থার আলোচনা করার সময় এই সব বৈচিত্র্যের ওপর বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হবে।

গ্রেটব্রিটেনের সংবিধান

সংসদীয় শাসনব্যবস্থা ও ইংল্যাণ্ডে তার পরিবর্তন

সংসদীয় শাসনব্যবস্থার স্বরূপ ঃ

সংবিধান-সম্মত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মধ্যে সংসদীয় শাসন এ-যুগের সর্বাধিক জনপ্রিয় রাজনৈতিক সংস্থা। সংসদীয় শাসনে সরকারের দুই পরস্পর-নিরপেক্ষ বিভাগ—সংসদ এবং কার্যপালিকা বিভাগ—এর মধ্যে এমন একটি ভারসাম্য রক্ষা করা হয় যার ফলে একটি অপরটির উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে না। এই ধরনের দ্বৈতশাসনে একদিকে যেমন নীতি নির্ধারণে উভয়েই অংশ গ্রহণ করে, অন্যদিকে নীতি নিয়ন্ত্রণে পরস্পর পরস্পরকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই পারস্পরিক আদান-প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ চরম রূপ গ্রহণ করে যখন নির্বাচকমণ্ডলী একটি বিশেষ সময় অন্তর এই দুই বিভাগের ওপর তার সমর্থন বা অসমর্থন জ্ঞাপন করে।

সংসদীয় শাসনে কতকগুলি সাধারণ উপাদান প্রায়ই চোখে পড়ে।

সংসদীয় শাসনের উপাদান ঃ Elements of parliamentarism

প্রথমতঃ, সরকার বা মন্ত্রিপরিষদের সভ্যগণ এক-যোগে সংসদের ও সভ্য থাকেন। ফলে সংসদের পক্ষে মন্ত্রিপরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সহজ হয়।

দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রিপরিষদের সভ্যগণ সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল অথবা সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে এমন একটি coalition বা সংযুক্তির মধ্য থেকেই নির্বাচিত হন। এই অর্থে মন্ত্রিপরিষদকে সংসদেরই অন্তর্ভুক্ত একটি ক্ষুদ্রতর সংস্থা বলা চলে। এমনতরো পারস্পরিক সম্পর্ককে Loewenstein[1]-এর ভাষায় interdependence by integration' বা সংহতিজনিত পরস্পর-নির্ভরতা বলে বর্ণনা করা যায়।

তৃতীয়তঃ, মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে একজন প্রধানের হস্তে সার্বিক নেতৃত্ব ন্যস্ত থাকে। সমষ্টিগতভাবে কাজ করলেও অন্যান্য মন্ত্রিরা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে চলেন এবং তাঁর কাছে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকেন।

চতুর্থতঃ, যতদিন সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সভ্যদের সমর্থন থাকবে ততদিনই সরকারের অস্তিত্ব। যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সভ্যগণ কোন কারণে অনাস্থা জ্ঞাপন

[1] Karl Loewenstein, "Political Power and the Governmental Process". P, 88.

করে অথবা নূতন নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচকমণ্ডলী একটি নূতন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সংসদে প্রেরণ করে তাহলে মন্ত্রিপরিষদকে পদত্যাগ করতে হয়।

পঞ্চমতঃ, নীতিগতভাবে সমস্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণে মন্ত্রিপরিষদ এবং সংসদ উভয়েই সমানভাবে অংশ গ্রহণ করে। পারস্পরিক সম্মতি ছাড়া কোন সিদ্ধান্তই আইনের মর্যাদা পায় না। এছাড়া আইনগুলি কার্যকরী করার ব্যাপারে কার্যপালিকাবিভাগের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকলেও সংসদ সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখে।

ষষ্ঠতঃ, সরকার ও সংসদ—উভয়েরই নিয়ন্ত্রণক্ষমতার পারস্পরিকতা বজায় থাকে। অবাঞ্ছিত নীতি বা কার্যক্রমের জন্য সংসদ যেমন অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারে, সরকারের তরফ থেকেও তেমনই অবাধ্য সংসদের বিলোপ ঘোষণা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে একটি নূতন নির্বাচনে জনগণই রায় দিয়ে থাকে কোন্ পক্ষ তাদের আস্থাভাজন।

সংসদীয় শাসনব্যবস্থার এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়েছে। ইংল্যাণ্ডে গৌরবময় বিপ্লবের পর থেকেই এর অগ্রগতি, ১৮৩১ সালের বেলজিয়ান সংসদের মধ্য দিয়ে ইউরোপে এর অনুপ্রবেশ এবং ক্রমশঃ সারাবিশ্বে এর বিস্তার ও নব রূপায়ণ।

ইংল্যাণ্ডে সংসদীয় শাসনের বিবর্তন ঃ

বিরতি-বিহীন ক্রমবিকাশ ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মানী প্রভৃতি দেশে রাজনৈতিক সংস্থাগুলি অনেকসময় আকস্মিকভাবে বিপ্লবের পথে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ রাজনৈতিক ঐতিহ্যের ওপর এত বেশী আস্থাশীল যে, বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সেখানে প্রায় ঘটেনি বললেই চলে। যুগের তাগিদে যে-সমস্ত পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছে, ধীরগতি বিবর্তনের মধ্য দিয়েই সেই সব পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে তাই রাজনৈতিক বিবর্তনের রূপটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

এ্যাংলোস্যাক্সন উইটান

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে ইংল্যাণ্ডে সংসদীয় শাসনব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগে। এই সময় উইটান বা উইটেনাগেমাট (Witan or Witenagemot) নামে একটি বিদ্বজ্জনসভা রাজাকে শাসনকার্যে পরামর্শ দিতেন। এই সভায় রাজপুরুষগণ, বিশপ এবং 'শায়ারের' প্রতিনিধিরা নির্দিষ্ট সময় অন্তর মিলিত

হতেন। যদিও এই সভায় কোন নির্ধারিত প্রতিনিধি ছিল না এবং যদিও এই সভার মতামত গ্রহণ করা বা না করা রাজার ইচ্ছাধীন ছিল, তবু স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের যুগে পরামর্শ-পরিষদ হিসাবে এর উদ্ভব নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

ম্যাগ্নাম কন্সিলিয়ম
Magnum Concilium

১০৬৬ সালে নর্ম্যানদের ইংল্যাণ্ড বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সভার অবলুপ্তি ঘটে। তবে বিজয়ী উইলিয়ম রাজা হিসাবে নিজের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করলেও মাঝে মাঝে একটি মহাপরিষদ বা Magnum Conciliumএর অধিবেশন আহ্বান করতেন। আর্চবিশপ, বিশপ, অ্যাবট, আর্ল, নাইট প্রভৃথ রাজ্যের উচ্চতর শ্রেণীর প্রতিনিধিরা এই পরিষদে যোগ দিতেন।

ক্ষুদ্রতর পরিষদ
Curia Regos

মহাপরিষদের অধিবেশনগুলির অন্তবর্তীকালে একটি ক্ষুদ্রতর পরিষদ রাজাকে শাসনকার্যে পরামর্শ দিত। আইনপ্রণয়ন, রাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহ প্রভৃতি সাধারণ নীতিসংক্রান্ত বিষয়গুলি মহাপরিষদে আলোচিত হত এবং শাসনকার্যের খুঁটিনাটি নিয়ে ক্ষুদ্রতর পরিষদ ব্যস্ত থাকত। পরবর্তীযুগে এই মহাপরিষদ থেকে সংসদের এবং ক্ষুদ্র পরিষদ থেকে প্রিভি কাউন্সিল ও উচ্চতর আদালতের উদ্ভব হয়।

সামন্তপ্রথার দরুন ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ
Centralisation of power through a feudal set-up

উইলিয়মের সময়ের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা ইংল্যাণ্ডে সামন্ততন্ত্রের বিস্তার। এর ফলে প্রত্যেক জমিদারকে সরাসরি রাজার কাছে অনুগত থাকতে হত এবং শাসন-ক্ষমতা এইভাবে ক্রমশঃ এককেন্দ্রিক রূপ নিতে থাকে।

এরপর দ্বিতীয় হেনরীর রাজত্বকালে বিচার বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। পূর্বতন ক্ষুদ্রতর পরিষদকে ভেঙে প্রিভি কাউন্সিল ও উচ্চতর আদালত এই দুই স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয়। এছাড়া ভ্রাম্যমান বিচার-

বিচারবিভাগীয় সংস্কার এবং প্রতিনিধিত্বের সূত্রপাত
Judicial Reforms and origin of represen tation

ব্যবস্থার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সময় থেকে সারাদেশে একটি সাধারণ আইন (Common Law) প্রচলিত হতে থাকে। জুরীর সাহায্যে বিচারের বন্দোবস্তও এই সময় থেকেই শুরু হয়। পক্ষান্তরে মহাপরিষদের আয়তন ক্রমেই বাড়তে থাকে। বিশপ, অ্যাবট, আর্ল, নাইট ছাড়াও এখন থেকে ছোট ছোট ভূম্যধিকারীদেরও এই পরিষদে স্থান দেওয়া হল। এরপর ১২১৩ সালে রাজা

জনের সময় যখন প্রতি কাউন্টি থেকে চারজন করে নাইট পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল, তখন থেকেই প্রতিনিধিত্বির নিয়মের সূত্রপাত বলা যেতে পারে।

এ-পর্যন্ত রাজার শাসন সমগ্র নিয়ন্ত্রণের উর্ধ্বে ছিল। কিন্তু ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে রুনীমিডের প্রান্তরে সম্পাদিত 'মহাসনদে' সর্বপ্রথম রাজার কর্তৃত্বের উপর হস্তক্ষেপ করা হল। এই সনদে রাজা জনকে স্বীকার করে নিতে হল যে, মহাপরিষদের সম্মতি ছাড়া রাজা কতকগুলি বিশেষ কর আদায় করতে পারবেন না। একথা অবশ্য সত্য যে, মহাসনদে মূলতঃ ভূম্যধিকারী ও ধর্মযাজকের স্বার্থই সংরক্ষিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও মহাসনদ ইংল্যাণ্ডের সাংবিধানিক বিবর্তনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। একসময় যা কেবলমাত্র ভূম্যধিকারীদের স্বার্থ রক্ষার দলিল ছিল, পরবর্তী যুগে তাই থেকেই সমগ্র জনসাধারণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের প্রচেষ্টা দেখা দেয়। আধুনিক অর্থে মহাসনদকে গণতান্ত্রিক বলা না গেলেও, এই সনদে রাজার শাসন যে স্বেচ্ছাচারী না হয়ে নিয়মতান্ত্রিক শাসন হওয়া উচিত সেকথা স্পষ্ট ভাষায় বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।[2]

মহাসনদ ও রাজার ওপর নিয়ন্ত্রণ
Magna Carta, the first limitation on royal authority

ম্যাগনা কার্টার প্রায় অর্ধশতক পরে তৃতীয় হেনরীর রাজত্বকালে কর-ধার্য সংক্রান্ত ব্যাপারে আবার রাজার সঙ্গে ভূম্যধিকারীদের বিবাদ দেখা দেয়। সাইমন ডি মণ্টফোর্টের নেতৃত্বে রাজার বিরুদ্ধে আন্দোলন সফল হয় এবং ১২৬৫ সালে তিনি এক সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন। এই সংসদে শুধু প্রতি নগর থেকে দুজন করে ভূম্যধিকারীকেই ডাকা হয়নি প্রতি বরো বা শহর থেকেও দুজন করে প্রতিনিধিকে যোগ দিতে বলা হয়েছিল। যদিও এই সংসদ দলীয় সম্মেলনে পর্যবসিত হয়েছিল, তবু ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের এখানেই শুরু বললে ভুল করা হবে না। অবশ্য এরপর ১২৯৫ সালে প্রথম এডওয়ার্ড কর্তৃক আহূত মডেল পার্লামেণ্ট বা আদর্শ পার্লামেণ্টেই সংসদীয় ব্যবস্থার পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায়।

আদর্শ পার্লামেণ্ট
Model Parliament

এই সময় সংসদে যোগদান করা খুব একটা সুবিধা বলে গণ্য হত না।

[2] "The document was not democratic in any modern sense, but it reiterated the principle that the King was not unlimited in power and that abuses of power might be resisted" Carter, Herz & Ranney : The Government of Great Britain, (World Press), P. 26.

এখনকার মত সংসদীয় সুবিধা (Parliament privilege) আদায় করার বদলে তখন সংসদ সদস্যদের পক্ষে সংসদে যাতায়াতের ব্যয়বাহুল্য, বিভিন্ন অধিবেশনে নূতন নূতন কর ধার্য করার ব্যাপারে সম্মতি দান মোটেই আকর্ষণীয় ছিল না। এই কারণে সংসদে যোগদান তখন আবশ্যিক ছিল।

প্রথম পর্যায়ে সংসদের তিনটি বিভাগে অধিবেশন হত। একটি সামন্তদের, একটি যাজকদের এবং একটি সাধারণের। পরে ছোট ছোট যাজকরা নিজেদের সভ্যপদ প্রত্যাহার করে নিলে বড় বড় যাজকেরা সামন্তদের সঙ্গে হাত মেলালেন, আবার সামন্তদের মধ্যে ছোট ছোট ভূম্যধিকারীরা সাধারণদের সভায় যোগ দিতে শুরু করলেন। এইভাবে চতুর্দশ শতকেব শেষদিকে লর্ডস ও কমন্স এই দুই কক্ষের উদ্ভব হল। এরপর পঞ্চদশ শতকে দেখা গেল যে সমস্ত আর্থিক ও কর সংক্রান্ত প্রস্তাব কমন্স সভায় পেশ করা হচ্ছে এবং এই রীতিই ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হযে গেল। এইভাবে লর্ডস সভার থেকে কমন্সসভার মর্যাদা বৃদ্ধি পেল।

দ্বিকক্ষের উদ্ভব
Growth of bicameralism

এই সময় সংসদের আইন প্রণযন সংক্রান্ত ক্ষমতারও প্রসার হয। কমন্স সভার মাধ্যমে অনেকদিন থেকেই প্রজাদের নানা অভিযোগ রাজার কাছে জানানো হত। রাজা ক্রমেই এটা বুঝতে পারলেন যে, এই সমস্ত অভিযোগের প্রতিকারের ব্যবস্থা করলে নূতন নূতন করধার্যের প্রস্তাব সংসদকে দিয়ে সহজেই অনুমোদন করিয়ে নেওয়া যায। এইভাবে কমন্সের অনুরোধে এবং লর্ডসের অনুমোদনে রাজা আইন প্রণযনে সচেষ্ট হলেন। অবশ্য পঞ্চদশ শতকের আগে পর্যন্ত কমন্সের ইচ্ছা আইনের ওপর পুরোপুরি প্রতিফলিত হতে পারত না। গোলাপের যুদ্ধের সময়ে যখন ভূম্যধিকারীরা পরস্পর বিবাদে মত্ত ছিলেন তখনই কমন্সসভার শক্তিবৃদ্ধি শুরু হয়। ষষ্ঠ হেনরীর (১৪২২-৬১) সময় মেনে নেওয়া হল যে কমন্স এবং লর্ডস উভয়ের সম্মতি ছাড়া আইন প্রণয়ন করা যাবে না। এরপর অবশ্য সপ্তম হেনরীর স্বেচ্ছাতন্ত্রে সংসদের ক্ষমতা অনেকখানি খর্ব হয়েছিল। সংসদ তখন এক অর্থে রাজার হাতে ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু অষ্টম হেনরীর সময়ে আবার রোম্যান ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে রাজার বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সংসদের ক্ষমতা নূতন করে বৃদ্ধি

কমন্সসভা ও আইন প্রণযন
The Commons & Legislation

ধর্মসংস্কারের আন্দোলন ও পার্লামেন্ট
Reformation Movement & Parliament

গেল। ১৫২৯ থেকে ১৫৩৬-এর রিফর্মেশন পার্লামেণ্ট ধর্মের সংঘাতে রাজার পাশে দাঁড়িয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা অর্জন করল। এর ফলে সংসদ সদস্যদের মধ্যে এমন এক নূতন আত্মপ্রত্যয় গড়ে উঠল যার প্রভাবে রানী প্রথম এলিজাথের সময় থেকেই দেখা গেল সংসদ সদস্যরা রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনা এবং শাসনেব ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনায় আগের থেকে অনেক বেশি উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করছেন। স্টুয়ার্ট-বংশের প্রথম রাজা জেম্‌স এটাকে ভাল চোখে দেখলেন না। "রাজার ঐশ্বরিক ক্ষমতা" (Divine right of kings) সম্পর্কে তাঁর অন্ধবিশ্বাস স্বাভাবিকভাবেই সংসদকে তাঁর শত্রু কবে তুলল। বাজা আর সংসদের এই বিরোধ প্রথম চার্লসের সময় গুরুতর আকার ধারণ করে। ১৬২৮ সালে লর্ডস ও কমন্সসভা একযোগে এক অধিকাবের আবেদন (Petition of Rights দাখিল করে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজা চার্লস মেনে নিতে বাধ্য হন যে, সংসদের অনুমোদন ছাড়া রাজা কোন কর বা নজরানা আদায় করতে পারবেন না। কিন্তু কিছুদিন পরেই চার্লস এই শর্ত ভঙ্গ কবেন। ফলে ১৬৮২ থেকে ১৬৪৯ সাল পর্যন্ত দেশব্যাপী এক গৃহযুদ্ধ শুরু হয এবং পরাজিত রাজার মৃত্যুদণ্ডের পর সংসদের প্রতিভূ হিসাবে ক্রমওয়েল শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। কিন্তু সংসদের সঙ্গে নূতন করে বিরোধের সূত্রপাত হওয়াতে তাঁর মৃত্যুর পর আবার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হল দ্বিতীয় চার্লস-এর অধীনে। বিশ্বস্ততার সঙ্গে না হলেও, বাহ্যতঃ দ্বিতীয় চার্লস সংসদের প্রাধান্য মেনে নিলেন। কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় জেম্‌সের অবিবেচনায আবাব বিশৃঙ্খলা দেখা দিল, যার পরিণতি ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লব।

অধিকারের আবেদন
Petition of Rights

গৌরবময় বিপ্লব
Glorious Revolution

বিপ্লবের সাফল্য পার্লামেণ্টকে নূতন করে গৌরবের আসনে বসালো। ১৬৮৯-এর বিখ্যাত অধিকারের বিলে (Bill of Rights) সংসদের আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত ক্ষমতা স্বীকৃত হল; সংসদের অনুমোদন ছাড়া কোন কর বসানোর অধিকার রাজার আর রইল না, নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত ভাবে সংসদের অধিবেশন ডাকা হবে স্থির হল এবং কতকগুলি নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হল।

অধিকারের বিল
Bill of Rights

Statutes are made "by the king's most excellent majesty by and with the consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same"—Quoted in the Government of Great Britain; Carter, Herz, Ranney. (W. P.) P. 28.

এর পর হ্যানোভার বংশীয় জর্জ রাজাদের আমলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পথে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল মন্ত্রিপরিষদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর। ইতিপূর্বেই দেখা গিয়েছিল যে, শাসনকার্য চালানোর ব্যাপারে প্রিভি কাউন্সিলের থেকে আরও ছোট একটি সংস্থার দরকার। দ্বিতীয় চার্লস এই উদ্দেশ্যে একটি ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠী সৃষ্টি করেন; তার নাম ক্যাবাল (Cabal)। এই ক্যাবাল থেকেই ক্রমে ক্রমে আজকের ক্যাবিনেটের জন্ম। অবশ্য স্টুয়ার্ট রাজারা ইচ্ছামত মন্ত্রী নিয়োগ ও অপসারণ করতেন। ফলে সংসদ এবং কার্যপালিকা বিভাগের (যা রাজা আর মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত) মধ্যে একটা স্পষ্ট বিভাজক রেখার অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু উইলিয়ম ও অ্যানের রাজত্বকালে সংসদের সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয় এবং একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের মধ্য থেকে মন্ত্রিসভা গঠনের রীতি চালু হয়। ফলে আপেক্ষিকভাবে রাজার থেকে সংসদের কাছেই মন্ত্রিসভার আনুগত্য প্রকট হতে থাকে। হ্যানোভারীয় জর্জদের সময় এই প্রবণতা আরও জোরদার হয়ে উঠল। ইংল্যাণ্ডের চেয়ে মাতৃভূমি হ্যানোভারের প্রতিবেশী আকর্ষণ থাকায় এবং বিদেশী ইংরাজী ভাষার বিন্দুবিসর্গ না জানায় এঁরা ক্রমেই মন্ত্রীদের হাতে অধিকাংশ কর্তৃত্ব তুলে দিতে লাগলেন।

মন্ত্রিপরিষদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর
Transfer of power to the Cabinet

সংসদের প্রতি মন্ত্রিপরিষদের আনুগত্য প্রথা হিসেবে স্বীকৃতি পেল লর্ড ওয়ালপোলের সময়। ১৭২১ থেকে ১৭৪২ পর্যন্ত সংসদ তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেয় এবং তাঁকে এই অর্থে ব্রিটেনের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বলা যেতে পারে। ১৭৪২ সালে সংসদের আস্থার অভাবে তিনি যখন পদত্যাগ করলেন তখন থেকেই এই প্রথা চালু হল যে, যতদিন সংসদের আস্থা থাকবে ততদিনই মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব। এইভাবে তৃতীয় জর্জের সময়েই অধিকতর শক্তিশালী মন্ত্রিপরিষদ ও সংসদের পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাজতন্ত্রের একটা ধারণা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

সংসদের প্রতি মন্ত্রিপরিষদের আনুগত্যের সূচনা:
Growth of ministerial responsibility

ইংল্যাণ্ডে গণতান্ত্রিক শাসন-বিবর্তনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় দলতন্ত্রের উদ্ভব। সপ্তদশ শতাব্দীর আগে ভূম্যধিকারীদের এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের পৃথক পৃথক দল থাকলেও এইসব দলের কোন রাজনৈতিক চরিত্র ছিল না। গৃহযুদ্ধের সময়ই প্রথম দেখা গেল অভিজাত ও জঙ্গী সামন্তশ্রেণী

দলতন্ত্রের উদ্ভব
Rise of party government

রাজার পক্ষ অবলম্বন করছে এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও পিউরিটানেরা সংসদকে সমর্থন করছে। এইভাবে ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাসের পথ পরিষ্কার হল। দ্বিতীয় চার্লসের সময় চার্চ ও রাজার সমর্থক টোরী জমিদার সম্প্রদায় এবং সম্রান্ত হুইগ সম্প্রদায়, ননকনফর্মিস্ট ও বণিকশ্রেণীর সম্মিলিত গোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দিল। দ্বিতীয় জেম্‌স্‌ যখন চার্চের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে শুরু করলেন, তখন আবার প্রথম দলটিতে ভাঙন ধরল; কিছু লোক হুইগদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মেরী ও উইলিয়ামকে সিংহাসনে বসালো। গৌরবময় বিপ্লবের পর থেকেই এই দুই দলের রাজনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেল; ক্ষমতায় আসীন দল বিরোধী দলের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিল এবং একদল থেকে আর একদলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রথা প্রতিষ্ঠিত হল।

গৌরবময় বিপ্লবে হাউস অব কমন্সের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলেও এই কক্ষ কোন অর্থেই গণতান্ত্রিক ছিল না। একমাত্র সম্পত্তির মালিকানা ভোটাধিকারের ভিত্তি ছিল এবং জনসংখ্যার স্থানান্তরের প্রতি লক্ষ্য না রেখেই প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা স্থির করা হত। ভোটাধিকার প্রায়ই বিক্রয় করা হত এবং নির্বাচনে রাজা ও সামন্তশ্রেণী ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করতেন। ফলে নির্বাচন-ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য বহুদিন থেকেই দাবী জানানো হতে থাকে। বিশেষ করে শিল্পবিপ্লবের ফলে যেসব ধনী ব্যবসায়ীর সৃষ্টি হল, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের ক্ষমতা বিস্তারের জন্য তাঁরাও আগ্রহী হয়ে উঠলেন। স্বাভাবিক ভাবেই এর বিরুদ্ধে কায়েমী স্বার্থের প্রতিঘাত এলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংস্কারের দাবী সংসদের সমর্থন পেলো। ১৮৩২ সালের গ্রেট রিফর্ম অ্যাক্ট এইভাবে ব্রিটেনে গণতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করল। যদিও এই আইনে সবাইকে ভোটাধিকার দেওয়া হয়নি, তবুও পূর্বের ব্যবস্থায় যে-সমস্ত দোষত্রুটি এবং অন্যায্য ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল সেগুলির অবসান হল। এরপর ১৮৬৭, ১৮৮৪ এবং ১৯১৮ সালে পর পর কতকগুলি সংস্কারের আইন পাস করে একুশ বছরের ঊর্ধ্বে দেশের সমস্ত নাগরিককে ভোটাধিকার দেওয়া হল। মেয়েরা অবশ্য ১৯২৮ সালের আগে এই অধিকার লাভ করেন নি।

সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা
Introduction of Universal Adult Suffrage

এইভাবে যে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা হল, ইংল্যাণ্ডের রাজনীতিতে তার প্রভাব নানাভাবে দেখা দিয়েছে। প্রথমতঃ, ভোটদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি

পাওয়ার দলগত সংগঠনের ওপর ক্রমেই বেশী জোর দেওয়া হতে লাগল। দ্বিতীয়তঃ, ভোটদাতাদের বিচারেই মোটামুটিভাবে রাজনৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্থির হয়ে যায় বলে সংসদের বদলে নির্বাচকমণ্ডলীই মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতার উৎসস্থল বলে বিবেচিত হতে লাগল। তৃতীয়তঃ, রাজনৈতিক দলগুলির শ্রেণীচরিত্র আরও প্রকট হয়ে দেখা দিল। উদারনৈতিক দলের (Liberal) মধ্যে যেসব অভিজাত ব্যক্তি ছিলেন তাঁরা সকলে রক্ষণশীল দলে (Conservative Party) গিয়ে যোগ দিলেন আর শ্রমিক ও শিল্পপতিদের নিয়ে গঠিত উদারনৈতিক দল থেকে জন্ম নিল শ্রমিকদল (Labour Party)। শিল্পপতিরা শেষপর্যন্ত রক্ষণশীল দলের আশ্রয় না নিয়ে পারলেন না।

সার্বিক ভোটাধিকার ও রাজনৈতিক পরিবর্তন
Adult Suffrage & its political implications

ভোটাধিকারের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে লর্ডস্ সভার মধ্যেও মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হল। যতদিন কমন্স সভার কোন সংস্কার হয়নি ততদিন লর্ডস সভার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল এবং মন্ত্রিসভার অনেকেই লর্ডস সভারই সভ্য থাকতেন কিন্তু ভোটাধিকার প্রসারের ফলে নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতিনিধি হিসাবে কমন্স সভার গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেল। মন্ত্রিপরিষদের নেতৃত্বও কমন্স সভার ওপরই নির্ভর করতে লাগল। এ-ছাড়া একাধিক প্রগতিশীল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লর্ডস সভার ক্রমাগত বাধাদানের ফলে এই সভা জনপ্রিয়তা [illegible] শুরু করল। ফলে ১৯১১ সালে কমন্স ও লর্ডসের বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সরাসরিভাবে আইন পাস হয়ে গেল (Act of Parliament) যে, এমন কি অর্থসংক্রান্ত বিল ছাড়া অন্য বিলগুলিতেও লর্ডস সভার বিরোধিতা সত্ত্বেও কমন্স সভা আইন পাস করতে পারবে। এইভাবে গণতান্ত্রিক শাসনের শেষ পর্যায়টি সুপ্রতিষ্ঠিত হল। সুদীর্ঘ পনের শত বৎসরের এই ক্রমবিকাশের ইতিহাসে আজকের ব্রিটিশ শাসনের মূলনীতিগুলি এইভাবে বিধৃত হয়ে আছে।

লর্ডস সভার সংস্কার
Reform of the House of Lords

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের উৎস ও বৈচিত্র্য

শাসনতন্ত্রের দীর্ঘকালব্যাপী ধীরগতি বিবর্তন এবং জনগণের ঐতিহ্যের প্রতি আস্থার ফলে ব্রিটেনে কোনও সময়ই সমস্ত সাংবিধানিক রীতিনীতি ও আইন-কানুনগুলিকে নূতন করে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন দেখা দেয় নাই। এর ফলে শাসন-পদ্ধতির অনেক নিয়মই আজও অলিখিত রয়ে গেছে, আর যে-সমস্ত অংশ ঘটনাচক্রে দলিলে লিপিবদ্ধ হয়েছে সেগুলিরও প্রকৃত কার্যক্রম থেকে অনেক বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। যেমন, মন্ত্রিপরিষদ, বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি সম্পর্কে কোথাও কোন উল্লেখ নেই। আবার তত্ত্বগত-ভাবে রাজা বা রানীর অসংখ্য ক্ষমতা থাকলেও কোন ক্ষমতাই তাঁদের ইচ্ছামত প্রযোজ্য নয়।

লিখিত কোন সংবিধান না থাকায় এবং লিখিত অংশগুলি সংসদের দ্বারা সহজে পরিবর্তনীয় বলে সম্ভবতঃ সংবিধান বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। টমাস পেন বা ডি টকভাইল-এর মত লেখকেরা যাঁরা সংবিধান বলতে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন বিধিবদ্ধ মৌলিক আইন মনে করেন, তাঁদের মতে ব্রিটেনে কোন সংবিধান নেই।[1] এটা অবশ্য খুবই ভুল ধারণা। একথা সত্য যে, কোন গ্রন্থাগারে ব্রিটিশ সংবিধানের কোন বই খুঁজে পাওয়া যাবে না।[2] কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ব্রিটিশ সংবিধানের অস্তিত্ব নেই। আসলে আমেরিকান সংবিধানের মতো মুখ্যতঃ লিখিত না হলেও ব্রিটিশ সংবিধানকে একটি "লিখিত আইন, নজীর ও প্রথার" সমাহার বলা যেতে পারে ("a blend of formal law, precedent and tradition.")

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের উৎস (Sources of the British Constitution)

অসংখ্য উপাদান নিয়ে ব্রিটিশ সংবিধান গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে সর্ব প্রথমেই উল্লেখযোগ্য মহাসনদ, অধিকারের আবেদন, অধিকারের বিল, উত্তরাধিকারের আইন, ১৮৩২-এর সংস্কার আইন এবং ১৯১১-র পার্লামেণ্ট অ্যাক্ট প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সনদ ও বিধিনিয়ন্ত্রণসমূহ। এইসব দলিলের বৈশিষ্ট্য হল, ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয় সংকটের সমাধান হিসেবে এগুলি সৃষ্টি

গুরুত্বপূর্ণ সনদ
Important Charters

---

1 "In England, the constitution…there is no such thing." Alexis de Tocqueville.

2 "Can Mr. Burke produce the English Constitution? If he cannot, we may fairly conclude that though it has been so much talked about no such thing … a Constitution exists or ever did exist."

হয়েছিল। যদিও এদের মধ্যে কোন কোনটি সংসদে আইন হিসাবে পাস হয়নি, তবুও ঐতিহাসিক প্রয়োজনে সৃষ্ট বলে এগুলির অন্যথা করা হয় না।

ব্রিটিশ সংবিধানের দ্বিতীয় উৎস হল, বিভিন্ন সময়ে ব্রিটিশ সংসদ যে-সব গুরুত্বপূর্ণ বিধিবদ্ধ আইন পাস করেছে সেইগুলি। যদিও কোন ঐতিহাসিক সংকটের মুক্তিপর্বে এগুলির রচনা হয়নি, তবুও এদের মূলগত প্রকৃতি এমনই যে, সাধারণ আইনের ঊর্ধ্বে এগুলিকে স্থান দিতেই হয়। এই শ্রেণীতে যে-সব আইন পড়ে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—১৮৩২, ১৮৬৭, ১৮৮৪, ১৯১৮ ও ১৯২৮-এর ভোটাধিকার সংক্রান্ত আইনগুলি; ১৯৪৮ সালের জনপ্রতিনিধিত্বের আইন; ১৯২২ সালের আইরিশ ফ্রি স্টেট অ্যাক্ট; ১৯৩৫ সালের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যাক্ট; ১৮৮৮, ১৮৯৪, ১৯২৯ ও ১৯৩৩-এর স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন সংক্রান্ত আইনগুলি; ১৯৩৬-এর পাব্লিক অর্ডার অ্যাক্ট; ১৯৩৭-এর মিনিস্টার্স অব দি ক্রাউন অ্যাক্ট; ১৯৩১-এর স্ট্যাটুট অব ওয়েস্টমিন্স্টার প্রভৃতি।

বিধিবদ্ধ আইন
Statutes

ব্রিটিশ সংবিধানের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র আবার বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত সমূহে পাওয়া যাবে। বিচারকগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সনদ, বিধিবদ্ধ আইন, প্রথাগত আইন প্রভৃতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রায়ই তাদের অর্থ নিরূপণ ও সম্প্রসারণ করেছেন। এই ভাবে নূতন আইনেরও উদ্ভব হয়েছে। অধ্যাপক ডাইসী বলেছেন, "সাধারণ অর্থে আইন প্রণয়নের চেয়ে ব্রিটিশ সংবিধান আসলে আদালতে ব্যক্তি-অধিকার রাখার জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে।"

বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্তসমূহ
Judicial decisions

এই প্রসঙ্গে সাধারণ আইনের কথাও আসে। এই সাধারণ আইন বিচার-বিভাগীয় সিদ্ধান্ত থেকে গড়ে উঠলেও এর প্রাথমিক ভিত্তি হল বহুদিন থেকে প্রচলিত প্রথা, রীতিনীতি ও বিশ্বাসের ওপর। এগুলি কোন সময়েই রাজার নির্দেশে বা সংসদের প্রস্তাবে প্রবর্তিত হয়নি। ব্রিটিশ জনসাধারণের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা থেকেই এইসব প্রথাসিদ্ধ রীতিনীতি মেনে চলা হয়। এই সাধারণ আইনের ওপরেই নির্ভর করে আছে রাজকীয় বিশেষ ক্ষমতা, ফৌজদারী মামলায় জুরীর সাহায্যে বিচারের ব্যবস্থা, বাক্‌স্বাধীনতা ও সমাবেশের স্বাধীনতা ইত্যাদি। এক কথায় বলা যেতে পারে যে, সাধারণ আইনগুলি ব্রিটেনে

সাধারণ আইন
Common Law

ব্যক্তি-স্বাধীনতার সংরক্ষক এবং ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ।[3]

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল অলিখিত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি। এই সমস্ত রীতিনীতির দ্বারা শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। রাজার সঙ্গে মন্ত্রীদের সম্পর্ক, মন্ত্রীদের সঙ্গে পার্লামেন্টের সম্পর্ক, পার্লামেন্টের কার্যধারা ও অধিবেশন সংক্রান্ত নিয়মকানুন, ডমিনিয়নগুলির সহিত সম্পর্ক ইত্যাদি এই অলিখিত রীতির অন্তর্ভুক্ত। শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি কতকগুলি বোঝাপড়া ও অভ্যস্তগুলি প্রথা ছাড়া আর কিছু নয়। এই রীতিনীতিগুলিই আইনের শুকনো কাঠামোকে জীবন্ত করে তোলে। আইনের সঙ্গে এইসব রীতিনীতির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড। এগুলি মান্য করে না চললে শাসন-ব্যবস্থায় অনেক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয। এছাড়া জনমতের পরিপূর্ণ সমর্থন থেকে এগুলির উদ্ভব বলে এগুলি শাসনকর্তৃপক্ষকে মান্য করতেই হয়।

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি
Conventions of the Constitution

পরিশেষে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ আইনবিদ্‌গণের রচিত গ্রন্থসমূহেরও উল্লেখ করতে হয। প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে এগুলির গুরুত্ব অসামান্য। উদাহরণস্বরূপ অ্যানসনের 'সংবিধানের আইন ও রীতি' (Law and Custom of the Constitution : Anson), মে'র 'সংসদীয় কার্যবিধি' (Parliamentary Practice : May), ব্যাজহটের 'ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র' (The English Constitution : Bagehot), ডাইসীর 'সাংবিধানিক আইন' (Law of the Constitution : Dicey) ও জেনিংসের 'মন্ত্রিপরিষদের শাসন' (Cabinet Government : Ivor Jennings) উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ সংবিধানের গতিপ্রকৃতি বুঝতে হলে এইসব গ্রন্থ একান্ত অপরিহার্য।

প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ
Authoritative texts

সুতরাং কোন একটিমাত্র লিখিত দলিলে শাসনতন্ত্রের নিয়মকানুনগুলি লিপিবদ্ধ না থাকিলেও বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের মূলভিত্তির সন্ধান পাওয়া কঠিন নয়।

৫

[3]The English Constitution "far from being the result of legislation in the ordinary sense of the term, is the fruit of contests carried on in courts on behalf of the rights of the individuals" Dicey . The Law of the Constitution.

ব্রিটিশ সংবিধানের বৈচিত্র্য : (Salient features of the British Constitution)

সব দেশের শাসনতন্ত্রেই কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এইসব বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করেই শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিন্যাস ও প্রকৃতি নির্ণয় করা হয়। ব্রিটিশ সংবিধানের যেগুলি প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা যায় সেগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

প্রতিনিয়ত বিবর্তন
Continuity and Evolution

প্রতিনিয়ত বিবর্তন বৃটিশ সংবিধানের প্রথম বৈশিষ্ট্য। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ধীরগতিতে ব্রিটিশ শাসনের মূলনীতিগুলি বিবর্তিত হয়ে এসেছে। কোথাও কখনও কৃত্রিম উপায়ে বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কোন নূতনত্ব প্রবর্তনের চেষ্টা করা হয়নি। যা-কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে, ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী ধারায় তা রূপায়িত হয়েছে। মুনরো তাই বলেছেন, ইংল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থা একটি সম্পূর্ণরূপে তৈরী বস্তু নয়, বরং পরিবৃদ্ধির একটা পন্থা। ব্রিটিশ জনগণের ঐতিহ্যমুখিনতা এর একটি প্রধান কারণ।[4]

এককেন্দ্রিক কাঠামো
Unitary Set-up

দ্বিতীয়তঃ, ইংল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রিক, ভারতবর্ষ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত যুক্তরাষ্ট্রীয় নয়। স্থানীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও স্থানীয় শাসনযন্ত্রের সঙ্গে মূল শাসনব্যবস্থার সহযোগী সম্পর্ক নাই। ইংল্যাণ্ডে কেন্দ্রীয় সরকার বা পার্লামেণ্ট আইনতঃ সর্বময় কর্তা এবং সমস্ত শাসনক্ষমতা কেন্দ্রে ন্যস্ত। কাউন্টি, বরো এবং অন্যান্য স্থানীয় সরকারগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারই সৃষ্টি করেছে বা স্বীকার করে নিয়েছে। এদের অস্তিত্ব, কার্যক্রম, ক্ষমতা ইত্যাদি সমস্ত কিছু কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছাধীন। প্রয়োজনমত এই সব স্থানীয় শাসনের আকৃতি ও গঠনের পরিবর্তন বা সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের রয়েছে।

তৃতীয়তঃ, ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র লিখিত নয় এবং সহজেই পরিবর্তন করা চলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের মত এদেশে সাধারণ আইনের চেয়ে অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন কোন বিধিবদ্ধ মৌলিক সাংবিধানিক

---

[4] The English constitution "is not a completed thing, but a process of growth. It is a child of wisdom and chance whose course has sometimes been guided by accident and sometimes by high design." : Munro : "Governments of Europe."

আইন রচনা করা হয়নি। কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সনদে এবং বিধিবদ্ধ আইনে শাসনতান্ত্রিক মূলনীতিগুলির উল্লেখ থাকলেও মোটের ওপর ব্রিটিশ সংবিধানকে অলিখিত বলা চলে। এ-ছাড়া শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের জন্য এখানে কোন জটিলতর বা বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না। সংসদ যেভাবে সাধারণ আইন প্রণয়ন করে, ঠিক সেইভাবেই শাসনতান্ত্রিক বিধিনির্দেশ পাস করা যায়। এছাড়া লিখিত বিধানের পরিবর্তন করার চেয়ে অলিখিত রীতিনীতির পরিবর্তন অনেক সহজসাধ্য। অবশ্য এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে সংবিধানের পরিবর্তন সহজ কি কঠিন তা শুধু সংশোধন পদ্ধতির জটিলতা বা সরলতার ওপর নির্ভর করে না। দেশের প্রধান প্রধান স্বার্থগোষ্ঠীর আচরণের ওপর অনেককিছু নির্ভর করে।

অলিখিত ও সুপরিবর্তনীয় শাসনব্যবস্থা
Unwritten and flexible constitution

চতুর্থতঃ ইংল্যাণ্ডে সংসদীয় শাসন প্রবর্তিত হয়েছে। সংসদীয় শাসনের রীতি অনুযায়ী এখানে তাই দুইটি বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে—রাজা বা রানী নিয়মতান্ত্রিক শাসক মাত্র; প্রকৃত শাসনক্ষমতা মন্ত্রি-পরিষদের হাতে; আবার এই প্রকৃত শাসকবর্গ জনসাধারণের প্রতিনিধি, সংসদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং সংসদের কাছে যৌথভাবে দায়ী। সংসদে যে-দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলের মধ্য থেকেই মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। যতদিন এই সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন থাকবে ততদিনই এই মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব। কোনও কারণে যদি সংসদের কাছে মন্ত্রিসভার পরাজয় ঘটে বা মন্ত্রি-সভার প্রতি সংসদ অনাস্থা জ্ঞাপন করে, তাহলে অবিলম্বে সেই মন্ত্রিসভা পদ-ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ইংল্যাণ্ডে প্রকৃত শাসকমণ্ডলী সংসদের কাছে এবং সেই অর্থে শেষ পর্যন্ত জনগণের কাছে সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

সংসদীয় শাসন
Parliamentary government.

পঞ্চমতঃ, সংসদীয় শাসনব্যবস্থার অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে ইংল্যাণ্ডে ক্ষমতা-বিভাজনের অনুপস্থিতি খুবই স্বাভাবিক। সরকারের এক বিভাগের সঙ্গে অন্য বিভাগের পার্থক্য বা হস্তক্ষেপের বাধা বা ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ ইত্যাদি কোনও অর্থেই এদেশের শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে ক্ষমতা-বিভাজন নীতির সামঞ্জস্য দেখা যায় না। একই কর্তৃত্বের অধিকারী একাধিক বিভাগের সঙ্গে জড়িত থাকেন। যেমন, কার্যপালিকা বিভাগের মৌখিক

ক্ষমতা-বিভাজনের অনুপস্থিতি
Absence of Separation of powers

প্রধান রাজা বা রানী সংসদেরও অবিচ্ছেদ্য অংশ; প্রকৃত শাসনক্ষমতার অধিকারী মন্ত্রিবর্গও সংসদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ও সংসদের উচ্চতর কক্ষ লর্ডস সভা একাধারে দেশের সর্বোচ্চ আপীল আদালত। আবার, এক বিভাগ অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন, মন্ত্রিসভা সম্পূর্ণরূপে সংসদের উপর নির্ভরশীল, তেমনি অবাধ্য সংসদকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য মন্ত্রিসভার হাতে পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। একমাত্র বিচারবিভাগই আইন ও শাসনবিভাগের প্রভাব থেকে কিছুটা মুক্ত। আর, বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্যাবলী এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে প্রায়ই একটি বিভাগের কার্য অন্য বিভাগকে কিছু পরিমাণে করতে হয়। যেমন, আইন রচনার প্রকৃত অধিকার সংসদের হাতে থাকলেও, মন্ত্রিপরিষদ এবং তার অধীন প্রশাসন কর্তৃপক্ষ আইনগুলিকে বৈশেষিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযোগী করে তোলার জন্য নানাভাবে বিশদ আকার দিয়ে থাকেন। কিছু কিছু বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাও সাম্প্রতিক কালে কার্যপালিকা বিভাগের হাতে এসে গেছে। সুতরাং ইংল্যাণ্ডে আক্ষরিক অর্থে ক্ষমতা-বিভাজনের নীতি অনুসরণ করা হয় না, এ-কথা বলা চলে। অথচ ইংল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থা দেখেই মঁতেস্কু এই নীতি নিয়ে আলোচনা করতে উদ্বুদ্ধ হন। আসলে, ইংল্যাণ্ডে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের (checks & balances) নীতি কার্যকরী থাকাতেই ক্ষমতা-বিভাজনের মূল উদ্দেশ্য, অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাধীনতার সংরক্ষণ সংসাধিত হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে ক্ষমতা-বিভাজনের চেয়ে এই ব্যবস্থার গুণগত উৎকর্ষ হল এই যে, এর ফলে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বিরোধের ফলে কখনও অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় না। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের 'ভিটো' প্রয়োগ এবং কংগ্রেস কর্তৃক প্রেসিডেন্টের আনীত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের মত ঘটনা ব্রিটেনে কখনও ঘটে না। কোন বিরোধ দেখা দিলে হয় মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে, নয় সরাসরি সংসদ ভেঙে দিয়ে নূতন নির্বাচনের সম্মুখীন হয়।

ষষ্ঠতঃ, সংসদীয় শাসনের আর একটি অনুসিদ্ধান্ত হল সংসদের আইনগত প্রাধান্য। ইংল্যাণ্ডের সংবিধানে সংসদের প্রাধান্যকে ভিত্তিপ্রস্তর বলা হয়েছে।

সংসদের প্রাধান্য
Supremacy of Parliament.

এমনকি সংসদের সার্বিক ক্ষমতাকে উপলক্ষ্য করে একটি প্রবচন চালু হয়ে গেছে যে, স্ত্রীকে পুরুষ আর পুরুষকে স্ত্রীতে রূপান্তরিত করা ছাড়া সব ক্ষমতাই সংসদের আয়ত্তে।[5] আইনগত দিক থেকে বিচার করলে সংসদের এই প্রাধান্য প্রকাশ পেয়েছে তিনটি ক্ষেত্রে:—(১) মার্কিন

সুপ্রীম কোর্টের মত সংসদীয় আইনের সাংবিধানিক যৌক্তিকতা বা বৈধতা বিচার করার কোনও ক্ষমতা ইংল্যাণ্ডের বিচারবিভাগের নেই। (২) সংসদ ইচ্ছামত আইন প্রণয়ন ও পরিবর্তন করতে পারে। শাসনব্যবস্থা সংশোধনের জন্য কোনও বিশেষ ধরনের জটিল পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় না। সংসদের সাধারণ কার্যক্রম অনুসরণ করেই শাসনব্যবস্থার সংশোধন হয়; (৩) সংসদীয় আইনের ওপর কার্যপালিকা বিভাগের অর্থাৎ রাজার 'ভিটো' প্রয়োগ করার অবকাশ বর্তমানে নেই বললেই চলে; (৪) সংসদ প্রয়োজনমত নিজের মেয়াদ বা কার্যকাল বৃদ্ধি করতে পারে। ১৯৩৫ সালে নির্বাচিত সংসদ এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিল; (৫) এমনকি রাজতন্ত্রের বিলোপ করে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতাও সংসদের রয়েছে।

অবশ্য সংসদের এই প্রাধান্য যে একেবারে নির্বাধ সেকথা বলা যায় না। শাসনকার্যের স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে এবং কতকগুলি ঐতিহাসিক ও আন্তর্জাতিক কারণে এই প্রাধান্য অনেকাংশে সীমিত হয়েছে। যেমন:— (১) সংসদের প্রাধান্য ইচ্ছামত প্রযোগ করা হয না। গণতান্ত্রিক দায়িত্বশীলতার সঙ্গে এই প্রাধান্য কার্যকরী করা হয। সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি (Conventions) এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক শক্তি। (২) কার্যক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডে মন্ত্রিপরিষদের ক্রমশই ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আইনের খসড়া রচনা, প্রয়োগকালে আইনগুলির বিশদ রূপায়ণ, দলীয সংহতি, নির্বাচনপ্রথা, কার্যপালিকা বিভাগের হাতে সংসদের কার্যসূচী নির্ধারণের ক্ষমতা, অর্থসংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের জটিলতা এবং সর্বোপরি প্রধানমন্ত্রীর সংসদ ভেঙে দেওযার ক্ষমতা প্রভৃতি কারণে সংসদ ক্রমেই মন্ত্রিপরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ছে। (৩) এ-ছাড়া, ব্রিটিশ সংসদের এই প্রাধান্য উপনিবেশগুলির ওপর প্রযোজ্য নয এবং আন্তর্জাতিক আইনের বিভিন্ন বাধানিষেধ আইন প্রণযনের সময় সংসদকে স্মরণ রাখতেই হয়। সুতরাং সংসদের প্রাধান্য কথাটি আক্ষরিক অর্থে না গ্রহণ করে এই অর্থ করা উচিত যে, ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার প্রাণশক্তি সংসদেই বিধৃত।

5 প্রসঙ্গত: Greaves-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : "The right to govern in England flows through the legislature to the Cabinet ; is not separately conferred on a popularly elected chief executive and on a popularly elected parliament ; the right is not capable therefore of conflicting interpretation by two bodies having an equal moral claim to speak for the public." (The British Constitution)

"The Parliament can do everything but make a woman a man and a man a woman."

"Though Parliament is legally supreme, 'Parliamentary responsible government' is a more accurate term for describing the way in which the system works" —Carter, Herz & Ranney, ibid, P. 45.

সপ্তমতঃ, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের পীঠস্থান হলেও ইংল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থায় কতকগুলি বিসদৃশ উপাদান রয়ে গেছে। যেমন সেদেশে রাজতন্ত্রকে আজও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা হয়, যদিও কার্যক্ষেত্রে রাজা বা রানীকে নিয়মতান্ত্রিক শাসকের ভূমিকাই নিতে হয়। এছাড়া উত্তরাধিকার সূত্রে সংগঠিত লর্ডস্ সভার সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র, স্থানীয় শাসনে বহিরাগত সদস্য গ্রহণের প্রথা প্রভৃতির মধ্যে যথেষ্ট অগণতান্ত্রিকতার ছাপ রয়েছে। বিশেষ করে ব্যক্তি হিসাবে রাজা এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাজতন্ত্রের যে তত্ত্বগত পার্থক্য রয়েছে তার মধ্যেও ব্রিটিশ জনসাধারণের রাজনৈতিক মনোভঙ্গীর একটা বিচিত্র পরিচয় পাওয়া যায়।

অসমঞ্জ উপাদান
Elements of anachronism

পরিশেষে, শাসনব্যবস্থা হিসাবে ইংল্যাণ্ডে নিয়মতান্ত্রিকতার চরম উদাহরণ আইনের অনুশাসন। আইনের অনুশাসনের অর্থ হল, সরকার ও তার বিভিন্ন বিভাগ এবং সমগ্র নাগরিক আইনের অধীন। এই আইন সুনির্দিষ্ট এবং সুবিদিত। একমাত্র সংসদের অনুমোদন ছাড়া এর সংশোধন বা পরিবর্তন সম্ভব নয়। এছাড়া এই আইনের শাসন পদমর্যাদা নির্বিশেষে প্রযোজ্য। কোন ব্যক্তিই আইনের উর্ধ্বে নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, আইন অমান্য করার সুস্পষ্ট প্রমাণসাপেক্ষ অভিযোগ কোন আদালতে প্রমাণ করা ছাড়া এবং ঐ আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া ছাড়া, কোন নাগরিককেই কোনরকম শাস্তি দেওয়া যাবে না। এই আইন একই ভাবে সরকারী কর্মচারীদের উপরেও প্রযোজ্য হবে যদি তাঁরা অন্যায়ভাবে কোন নাগরিকের অধিকার হস্তক্ষেপ করেন। কোনও সুলিখিত অধিকারের সনদ না থাকলেও একমাত্র আইনের অনুশাসনের বলেই ইংরাজ নাগরিকদের মূলগত অধিকারগুলি সংরক্ষিত হয়।

আইনের অনুশাসন
Rule of law

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, কোনও একটিমাত্র সংজ্ঞা দিয়ে এই শাসনব্যবস্থাকে বিশেষিত করা যায় না। একাধিক বিচিত্র ধরনের ও পরস্পরবিরোধী উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত এই শাসন ব্যবস্থাকে অগের* ভাষায় বলা যায়: "যুক্তরাজ্যের শাসনব্যবস্থাকে তত্ত্বগত দিক থেকে শেষপর্যন্ত একটি নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র, আকৃতির দিকথেকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র এবং যথার্থ প্রকৃতিবিচারে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলতে হয়।"

---

*"The governmet of U. K. is in ultimate theory an absolute monarchy, in form a constitutional limited monarchy and in actual character a democratic republic"—Ogg, "European Government and Politics."

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি (Conventions of the Constitution)

বিধিবদ্ধ আইনের বাইরে অসংখ্য রীতিনীতি ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে। আইনের সঙ্গে এগুলির বিরোধ তো নাই-ই, উপরন্ত আইনের কার্যক্রমকে আরও স্বচ্ছন্দ করার জন্যই এই রীতিনীতিগুলি প্রযুক্ত হয়। শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির উৎপত্তি নানাভাবে হয়েছে। কোনও কোনও নিয়ম বহুদিন ধরে অনুসৃত হতে হতে বাধ্যতামূলক নজীরে পরিণত হতে পারে। বিশেষ করে যদি প্রচলিত রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে কোন বিরোধ না থাকে তাহলে সহজেই এগুলি স্থায়িত্ব লাভ করে। আবার কখনও কখনও কতকগুলি সংশ্লিষ্ট স্বার্থগোষ্ঠী কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নিয়ম মেনে নিতে পারে—যেমন, ডমিনিয়ন বা উপনিবেশগুলির সঙ্গে গ্রেটব্রিটেনের সম্পর্ক এই ধরনের রীতিনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির উদ্ভব
Growth of the Conventions

ব্রিটিশ সংবিধান সম্পর্কে লেখকমাত্রেই সাংবিধানিক রীতিনীতির ওপর নানাভাবে আলোকপাত করেছেন। ডাইসী (Dicey) এগুলি "সাংবিধানিক রীতিনীতি" (constitutional conventions) আখ্যা দিয়েছেন। মিল (J. S. Mill) বলেছেন এগুলি "সংবিধানের অলিখিত নির্দেশ" ("unwritten maxim of the constitution") ; অ্যানসনের (Anson) ভাষায় এগুলি "সংবিধানের প্রথা"মাত্র (customs of the constitution)। যদিও লিখিত আইনের পরিপূরক হিসাবে এগুলি প্রযুক্ত হয়, তবু সূক্ষ্মবিচারে আইনের সঙ্গে এগুলির তিনটি পার্থক্য লেখা যায়।

প্রথমতঃ আইনসমূহ প্রায় সব ক্ষেত্রেই নিখুঁতভাবে শব্দায়িত এবং সংসদ কর্তৃক বিধিবদ্ধ। পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা ছাড়া আর কেউ শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলি লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেনি। এগুলি চলতি প্রথা থেকে জন্ম নেয় ; চলতি প্রথার প্রভাবেই এদের পরিবর্তন। কোন বিশেষ সময়ে কোন প্রথা শাসনতান্ত্রিক রীতি হিসাবে গৃহীত হল কিনা সেকথা বলা কঠিন। তবে আজ যা অলিখিত রীতি হিসাবে প্রচলিত, ভবিষ্যতে তা লিখিত আইনে পরিণত হতে পারে। যেমন, ডমিনিয়নগুলির সঙ্গে গ্রেটব্রিটেনের সম্পর্ক নিয়ে যেসব রীতিনীতি গড়ে উঠেছিল তাতে অধিকাংশই 'স্ট্যাট্যুট অব ওয়েস্টমিনস্টারে' বিধিবদ্ধ হয়েছে।

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও আইনের পার্থক্য
Difference between law and the conventions

দ্বিতীয়তঃ, সংবিধানের বিধিবদ্ধ আইনের শ্রেণীতে ঐতিহাসিক সনদ,

সংসদের অনুমোদিত বিধিসমূহ, বিচারবিভাগীয় নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত, এবং সাধারণ আইন—এগুলি অন্তর্ভুক্ত। এইসব আইন বিচার-বিভাগের মাধ্যমে সর্বথা প্রযোজ্য। কিন্তু, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাসনকার্যের সঙ্গে জড়িত হলেও, রীতি-নীতিগুলির প্রয়োগের জন্য বিচার বিভাগের শরণাপন্ন হওয়া যায় না। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে আইনের মর্যাদা বেশী বলা যেতে পারে; কেন না আইনভঙ্গ সহজে কেউ করতে চায় না। আইন মান্য করা কর্তব্য হিসাবে গণ্য; কারণ আইন ভঙ্গ করা স্পষ্টতই সংবিধানবিরোধী; এর বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে পারে। কিন্তু রীতিনীতি থেকে কখনও কোন বিচ্যুতি ঘটলে সাধারণতঃ তত স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না বা ধরা পড়লেও তত বেশি আন্দোলনের সৃষ্টি হয় না।

তৃতীয়তঃ, বিধিবদ্ধ আইন কমবেশী স্থাণু প্রকৃতির। রীতিনীতিগুলির সুবিধা এই যে, লিখিত না থাকায় অবস্থার তারতম্যের সঙ্গে সঙ্গে এগুলি সহজেই পরিবর্তিত হয়। রীতিনীতিগুলির উদ্ভব ও প্রসার ধীরগতিতে হয়; লিখিত আইনের পরিবর্তন আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয়। পুরোন আইনকে বাতিল করে দিয়ে যে-কোন মুহূর্তে নতুন আইন চালু করে দেওয়া যায়। অবশ্য সূক্ষ্ম বিচারেই এইসব প্রভেদ দেখা যায়। মূলগতভাবে ব্রিটেনে আইন ও শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির মধ্যে এই পার্থক্য অতি অস্পষ্ট।

ইংল্যাণ্ডের শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলিকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:—(১) রাজতন্ত্র ও মন্ত্রিপরিষদ-শাসনের সামঞ্জস্যমূলক রীতিনীতি; (২) পার্লামেণ্টের আভ্যন্তরীণ কর্মধারা সম্পর্কিত রীতিনীতি এবং (৩) ব্রিটিশ কমনওয়েলথ সংক্রান্ত রীতিনীতি। সংসদ অনুমোদিত বিলে সম্মতিদানে রাজা বা রানী বাধ্য, কমন্স সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মন্ত্রিত্ব গঠনের অধিকার, কমন্স সভার নিকট মন্ত্রিসভার দায়িত্ব ইত্যাদি রীতি-নীতি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর রীতিনীতির মধ্যে বৎসরে কমপক্ষে একবার পার্লামেণ্টের সভা আহ্বান, সংসদে বিতর্কের নিয়ম, চরম আপীলের আদালত হিসাবে লর্ড সভার সংগঠনে পরিবর্তন ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। যুক্তরাজ্য এবং ডমিনিয়নের প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন সম্মেলনে মিলিত হয়ে যেসব যুক্তি করেছেন বা যেসব নিয়মকানুন মেনে নিয়েছেন সেগুলি তৃতীয় শ্রেণীর রীতিনীতির উদাহরণ। এগুলির অধিকাংশই ১৯৩১ সালের ওয়েস্ট-মিন্স্টারের আইনে বিধিবদ্ধ হয়েছে।

রীতিনীতিগুলির শ্রেণীবিভাগ: Classification of the coventions

সবদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থাতেই শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির একটা ভূমিকা

রয়েছে। কিন্তু বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডে এদের গুরুত্ব অপরিসীম। রীতিনীতি-গুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে এদেশের শাসন পদ্ধতি অনুধাবন করা অনেক সময় অসম্ভব হয়। জেনিংস বলেছেন, "এই শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি-গুলি আইনের শুকনো অস্থিপঞ্জরকে রক্তমাংসের আবরণে সজীব করে রাখে; আইনগত সংবিধান এদের শক্তিতেই চলে; আর পরিবর্তনশীল ধ্যানধারণার সংগে সংবিধানের সামঞ্জস্য এই সব রীতিনীতিই রক্ষা করে থাকে। সাধারণ অবস্থায় অনমনীয় শাসন ব্যবস্থাকে সামাজিক প্রয়োজন এবং রাজনৈতিক ধ্যানধারণার পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়াই শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রধান কাজ।"*

ইংল্যাণ্ডে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির গুরুত্ব
Importance of the conventions in England

শুধু তাই নয়, মিশ্র সংবিধানে (mixed constitution) শাসন-ব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার আবহাওয়া সৃষ্টি করে এইসব রীতিনীতি লিখিত আইনসমূহকে বাস্তবে কার্যকরী করে। এইসব অভ্যাস, বোঝাপড়া, চলতি রীতিনীতির প্রভাবেই শাসনতান্ত্রিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় না। গ্রীভ্সের (Greaves) মতে দুভাবে এই আন্তর্বিভাগীয় সংহতি সাধন হয়ে থাকে। প্রথমতঃ পথপ্রদর্শন বা কাজের সুবিধার্থে গৃহীত কতকগুলি রীতিনীতি সংসদ ও কার্যপালিকা বিভাগের সম্পর্ক সংসদীয় প্রাধান্যের আলোকে নির্ধারণ করে। যেমন, সংসদের কাছে মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্ব; সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন; সংসদ বাতিল করে সোজাসুজি জনসাধারণের কাছে শাসন-বিভাগের আবেদন ইত্যাদি। দ্বিতীয় পর্যায়ে কতকগুলি রীতিনীতি রয়েছে যেগুলি একদিকে সরকার ও সংসদ এবং অন্যদিকে নির্বাচক মণ্ডলীর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করে। যেমন, বিসংবাদমূলক কোন আইনই নির্বাচকমণ্ডলীর অনুমোদন ছাড়া পাশ করা চলে না। সংশ্লিষ্ট সরকারের বিপক্ষে যদি নির্বাচক-মণ্ডলী রায় দেয়, তবে সেই মন্ত্রিত্বের পতন অবশ্যম্ভাবী।

এছাড়া কতকগুলি রীতিনীতি চালু থাকায় শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া অনেক সুবিধাজনক হয়েছে। যেমন রাজা বা রানী স্বভাবতঃ মন্ত্রিপরিষদের

"The convention are not really very different from laws. Indeed it is friquently different to place a set of rules in one class of the other"—Iror Jennings : Cabinet Government.

*"Conventions provide the flesh which clothes the dry bones of the laws, they make the legal constitution work, they keep it in touch with the growth of idea."

[illegible] কমন্স সভার স্পীকার রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন না ; বিরোধী দলের অস্তিত্ব এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপে কোন বাধা দেওয়া হয় না ; আপীল আদালতের কাজ করবার সময় লর্ডস্ সভায় একমাত্র আইনজ্ঞ লর্ডগণই উপস্থিত থাকেন, ইত্যাদি।

আইনের সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির পার্থক্য আলোচনা করার সময় দেখা গেছে যে এগুলি আইনের পর্যায়ে পড়ে না ; বিচার বিভাগের মাধ্যমেও এগুলি প্রযোজ্য নয়। কমন্স সভায় অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাশ হয়ে যাওয়ার পরেও যদি কোন প্রধান মন্ত্রী পদত্যাগ না করে (যেমন, লর্ড পামারস্টোন) কমন্স সভা ভেঙে দেন এবং পুনর্নির্বাচনে গঠিত নূতন সংসদের কাছে আবার অনাস্থাভাজন হলেও বহাল তবিয়তে থাকেন, সেক্ষেত্রে তিনি যে অবৈধ কাজ করেছেন এ বিষয়ে দ্বিমত থাকে না। কিন্তু কোনও বিচারালয়েই এই ধরনের আচরণ নিয়ে কোন অভিযোগ আনা চলে না। আবার ধরা যাক, বৎসরাধিককাল সংসদের কোন অধিবেশন ডাকা হয়নি। এ ধরনের সংবিধানবিরোধী ঘটনা নিয়েও কোন বিচারবিভাগীয় হস্তক্ষেপ হওয়ার সুযোগ নেই।

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির বাধ্যবাধকতা
Sanctions behind the conventions

কিন্তু এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করা ঠিক হবে না যে শাসনতান্ত্রিক রীতি-নীতিগুলির কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ফ্রীম্যানের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলছেন যে, সংবিধানের রীতিনীতিগুলি আইন না হলেও কার্যত: মহাসনদ বা অধিকারের আবেদনের মত বিধিবদ্ধ দলিলের যে কোন নীতির থেকে কম মর্যাদাসম্পন্ন নয়।[6] লিখিত আইন না হলেও শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলিকে কেন মেনে চলা হয় সে সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ আছে।

অধ্যাপক ডাইসী এই সম্পর্কে দুটি মত নিয়ে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ঐ দুটির কোনটিও রীতিনীতির বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। প্রথম মতানুসারে শাস্তির ভয়েই এইসব রীতিনীতি মান্য করা হয়। ডাইসী স্বীকার করেছেন যে সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে শাসনব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য আদায়ের জন্য শাস্তি দানের ভীতিপ্রদর্শন

---

6 Conventions, "are in practice held hardly less sacred than any principle embodied in the Great charter or the Petition of Rights" – Freeman : Growth of the English constitution.

প্রয়োজন হবে। [illegible] অচল। রাষ্ট্রনায়ক বা মন্ত্রিপরিষদের সভ্যগণের কাছে এসমস্ত ব্যবস্থার কোন অর্থই নেই। বিশেষ করে দায়িত্বশীল মন্ত্রিপরিষদ শাসনের সঙ্গে রাষ্ট্রদ্রোহমূলক অভিযোগ ও শাস্তিদানের কোন সামঞ্জস্য নেই। প্রকৃতপক্ষে লিখিত আইনের ক্ষেত্রেই শাস্তির প্রশ্ন উঠতে পারে; অলিখিত রীতিনীতির ক্ষেত্রে সে প্রশ্ন অবান্তর।

রীতিনীতির বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে ডাইসী-উল্লিখিত দ্বিতীয় মতটি হল, জনমতের চাপে পড়েই এইসব রীতিনীতি মান্য করা হয়। ডাইসী এর যৌক্তিকতা খণ্ডন করে বলেছেন, সাংবিধানিক রীতিগুলি জনমতের শক্তিতেই শক্তিমান একথা বলাও যা, আন্তর্জাতিক আইন একমাত্র নৈতিক ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান একথা বলাও তাই। কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তি ছাড়া সকলেই স্বীকার করবেন যে, জনমত ছাড়াও আন্তর্জাতিক আইনের মতই শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির পশ্চাতে একটি বিশেষ শক্তি রয়েছে। শাস্তির ভয় এবং জনমতের চাপে হয়তো রাজনৈতিক ন্যায়নীতির সৃষ্টি এবং বিবর্তন হতে পারে, কিন্তু সাংবিধানিক রীতিনীতির পশ্চাতে আসল যে শক্তি রয়েছে তা হল, এইগুলি অমান্য করলে স্বাভাবিকভাবেই দেশের লিখিত আইন ব্যবস্থার সঙ্গে বিরোধ দেখা দেবে। রীতিনীতিগুলির অধিকাংশই এমনভাবে লিখিত আইনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে আইনভঙ্গ না করে অথবা যে উদ্দেশ্যে আইনের সৃষ্টি সেই উদ্দেশ্যের বিরোধিতা না করে এগুলি অমান্য করা চলে না। প্রমাণস্বরূপ ডাইসী প্রায়শঃই যে উদাহরণটি উপস্থিত করতেন তা হল বছরে অন্ততঃ একবার সংসদের অধিবেশন হওয়া আবশ্যক। যদি কখনও এমন হয় যে পুরো এক বছর সংসদের কোন অধিবেশন ডাকা হল না তাহলে একাধিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। প্রথমতঃ, বার্ষিক সৈন্যবিভাগীয় বিধি (Annual Army Act) বাতিল হয়ে যাবে এবং সৈন্যবাহিনীর ওপর শাসনবিভাগের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কর আদায়ের ক্ষমতাও এর ফলে লোপ পাবে। ফলে প্রশাসন প্রতিরক্ষা ইত্যাদি খাতে প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে না। কাজেই সংসদের বার্ষিক অধিবেশন বিচার বিভাগ কর্তৃক অবশ্যকর্তব্য বলে ঘোষিত না হলেও কার্যক্ষেত্রে এর একটা বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এর ব্যতিক্রম হলে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ যাই করুন না কেন সেসব অবৈধ বলে মনে করা হবে এবং শেষপর্যন্ত শাসন ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়বে। অন্যান্য রীতিনীতি অমান্য করলেও একই ধরনের পরিণতি

দেখা দেবে। সংক্ষেপে বলা যায়, এই সব রীতিনীতি মান্য করার ব্যাপারে যদি কোন অসুবিধা থাকে তার থেকে বেশী অসুবিধা দেখা দেবে যদি সেগুলি কার্যকরী না হয়।

ডাইসীর আলোচনা নিঃসন্দেহে যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু রীতিনীতির বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ব্যাখ্যা এতে পাওয়া যায় না। হার্ভার্ডের অধ্যাপক লোয়েল তাই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, প্রতিবছর নূতন করে সৈন্য বিভাগীয় আইন প্রণয়ণ করতে হবে বলে বা নূতন করধার্য করার প্রযোজনেই ইংল্যাণ্ডে সংসদের বার্ষিক অধিবেশন ডাকা হয় না। অশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন সংসদ ইচ্ছা করলে একটি চিরস্থায়ী সৈন্যবিভাগীয় আইন পাশ করে নিতে পারে, বা বার্ষিক করগুলির আদায়কাল আরও কিছু বৃদ্ধি করে দিতে পারে এবং শাসনকার্যের সমস্ত খরচা সংরক্ষিত তহবিল থেকে আদায় করার অনুমোদন দিতে পারে—যার ফলে বাৎসরিক অনুমোদনের আর প্রয়োজন নাও হতে পারে। কেবলমাত্র চলতি আইনের বিবোধিতা হবে এই আশঙ্কা করেই রীতিনীতিগুলি মানা হয় না। কেননা, আইন মাত্রই পরিবর্তিত হতে পাবে। এছাড়া কতকগুলি রীতিনীতি এতই অস্পষ্ট যে সেগুলি অমান্য করলে সরাসরি কোন আইনগত বিশৃঙ্খলা দেখা নাও দিতে পারে। যেমন, নির্দিষ্টসংখ্যক পাঠ ছাড়া যদি কোন বিল সংসদে পাশ হয়, বা অনাস্থাসূচক প্রস্তাব সত্ত্বেও মন্ত্রিসভা যদি পদত্যাগ না করে তাহলেও আইনভঙ্গ করা হয়েছে বলে মনে করার সংগত কোন কারণ নেই। উপরন্তু, রীতিনীতির প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যাও উপস্থাপিত করা যেতে পারে।

সুতরাং শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলির বাধ্যবাধকতার পশ্চাতে আসলে কি শক্তি কাজ করছে তার প্রকৃত স্বরূপ জানতে হলে পরম্পরাগত বিশ্বাস, দেশের রাজনৈতিক ধ্যানধারণা, সমাজে শ্রেণী চরিত্র এবং সর্বোপরি জনমতের গতিপ্রকৃতির ওপর লক্ষ্য রাখতে হবে। অধ্যাপক জেনিংস-এর প্রতিধ্বনি করে তাই বলা যায় যে বাধ্যতার ভিত্তি সাধারণের ইচ্ছার ওপর, কোনও জোর জুলুমের ওপর নয়। সুতরাং শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি কেন মান্য করা হয় তার ব্যাখ্যা হল, সরকারী কর্তৃপক্ষের এইগুলি অনুসরণ করা উচিত বলে জনসাধারণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে বলেই রীতিনীতিগুলি চালু আছে।

ইংল্যাণ্ডে আইনের শাসন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা (Rule of Law and Personal Liberty in England) :

লিখিত সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি না থাকা সত্ত্বেও গ্রেটব্রিটেনে কি ভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষিত হয় তার একটি তত্ত্বগত ব্যাখ্যা দিয়েছেন অধ্যাপক ডাইসী। তিনি বলেছেন, ইংল্যাণ্ডে সমস্ত রকম রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ একটিমাত্র সূত্রে গ্রথিত। সেটি হল আইনের অনুশাসন।

আইনের শাসনের ঐতিহাসিক পটভূমি
Historical background to the Rule of Law.

ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে এই আইনের শাসন বিবর্তিত হয়েছে। কতকগুলি যুগসন্ধিক্ষণের উদাহরণ দিলেই কথাটি সুস্পষ্ট হবে। ১২১৫ সালে অর্জিত মহাসনদে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অর্থেই এর সূত্রপাত। তখন কারাদণ্ড বা করধার্য করার ব্যাপারে রাজা যে দেশের আইন মেনে চলবেন, মাত্র এইটুকু প্রতিশ্রুতির মধ্যেই আইনের শাসন চালু হয়। আবার ১৬৮৮ সালের বিপ্লবের ফলে সংসদের যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হল তাতে আইনের শাসনের অর্থ আরও প্রসারিত হল। ইতিপূর্বেই ষোড়শ-শতকে প্রথাগত আইনের প্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এর পর উনবিংশ শতকে ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লবের প্রসার ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আইনের শাসনে ক্রমশঃই ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর জোর দেওয়া হতে লাগল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুযায়ী শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংরক্ষণের মধ্যেই রাষ্ট্রের কার্যধারা সীমিত। সুতরাং আইনের চোখে সকলের সমান অধিকার থাকবে এবং অবাধে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার ও পণ্য বা শ্রমবিনিময়ের সুযোগ দেওয়া হবে বলে দাবী জানানো হল। এই ভাবেই অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা এবং ধনতন্ত্রের ভিত্তিস্থাপন হয়েছিল। এদিক থেকে আইনের অনুশাসনে শুধু ব্যক্তিস্বাধীনতার একটি দিকের ওপরই জোর দেওয়া হল। যে অর্থনৈতিক সাম্য ও সামাজিক ন্যায় ছাড়া ব্যক্তিস্বাধীনতা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না তাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হল। সুতরাং আইনের শাসনের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠা হয়নি একথা বলা অযৌক্তিক নয়।

ডাইসীর আলোচনা অনুযায়ী আইনের শাসন তিনটি ভিত্তির ওপর নির্ভর

করে আছে। প্রথমতঃ, আইনের সর্বময় প্রাধান্ত। রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ আইনের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ। সরকারের এমন কোন বিশেষ ক্ষমতা নাই যার যথেচ্ছ প্রয়োগ হতে পারে ; এমন কি স্থলবিশেষে নিজস্ব বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করাও আইনবিরুদ্ধ বলে পরিগণিত হতে পারে। একমাত্র সর্বজনস্বীকৃত ও যথাযথ রীতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইনের অনুজ্ঞাই রাষ্ট্রের কার্যধারার নিয়ামক। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট আইন ভঙ্গ করা ছাড়া বা আদালতের বিচারে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যাবে না।

আইনের শাসনের তিনটি মূল নীতি :
Three basic principles of the Rule of law

দ্বিতীয়তঃ, আইনের চোখে সকলেই সমান বলে গণ্য হবে। শ্রেণী-সম্প্রদায় সামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে সকল লোকই দেশের সাধারণ আইন মেনে চলতে বাধ্য। সুতরাং সরকার বা শাসনকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণও সাধারণ নাগরিকদের মত একই আইনের অনুগত এবং আইনভঙ্গের জন্য সমভাবে দণ্ডনীয়। এক্ষেত্রে ফ্রান্সে প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের আইনের শাসনে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ফ্রান্সে সরকার ও নাগরিকদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার জন্য পৃথক আইন—যাকে (droit administratif) বা প্রশাসনিক বিধি বলা হয়—রয়েছে। শুধু তাই নয়, এই সব বিরোধ নিরসনের জন্য বিশেষ ধরনের প্রশাসনিক আদালত তৈরী করা হয়েছে ইংল্যাণ্ডে যা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। সরকারী কাজকর্ম করার সময় আইনভঙ্গ করলে ইংল্যাণ্ডে সাধারণ আইন অনুযায়ী সাধারণ আদালতেই সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিচার ও শাস্তিবিধান হয়ে থাকে। ফরাসী সাধারণ আদালতের এই ধরনের এক্তিয়ার নেই।

তৃতীয়তঃ, আইনের শাসন জনসাধারণের মৌলিক অধিকারগুলির রক্ষা-কবচ। অন্যান্য দেশে লিখিত সংবিধানের দ্বারা নাগরিকদের কতকগুলি অপরিহার্য অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং সেগুলি সংরক্ষণের জন্য সরকার বাধ্য থাকে। ইংল্যাণ্ডে কয়েকটি অধিকারের সনদ ছাড়া সাধারণের অধিকারের কোন সুবিস্তৃত সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি নাই। তৎসত্ত্বেও ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে শাসনতান্ত্রিক বিবর্তন ও বিচারবিভাগীয় নজিরের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের শাসনতান্ত্রিক আইন ও সেই সঙ্গে জনসাধারণের অধিকারের ভিত্তিও গড়ে উঠেছে। সুতরাং সরকারের তরফে বা সাধারণ নাগরিকের দ্বারা কোন ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ হলে দেশের সাধারণ আইনেই তার প্রতিকারের ব্যবস্থা রয়েছে। এর জন্যে বিশেষভাবে সংরক্ষিত অধিকারনামার প্রয়োজন হয়নি।

আইনের শাসনের যে ব্যাখ্যা ডাইসী দিয়েছেন, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার অনেকগুলি বিষয়ে খুঁত ধরা পড়েছে। জেনিংস, ল্যাস্কি প্রভৃতি সাংবিধানিকদের আলোচনায় এই দিকটি তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথমতঃ, ডাইসীর আইনের ধারণা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সংসদ কর্তৃক বিধিবদ্ধ বা প্রথাসিদ্ধ আইন ছাড়া অন্য কোন নিয়ম কানুনকে তিনি আলোচনায় স্থান দেন নি। সেইজন্যই সরকারের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বা বিবেচনাপ্রসূত কোন ধরনের আইন করার কথা তিনি স্বীকার করেন নি। অথচ বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের কার্যের পরিধি ও জটিলতা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে সংসদের পক্ষে সমস্ত বিষয়ে আইন করা সম্ভব নয়। সেই জন্যে সংসদ-প্রণীত আইনগুলিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সময় তার বিশদীকরণের ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, কোন কোন বিষয়ে সরকার স্বয়ং আদেশ-নির্দেশ (ordinances, order etc.) জারী করতে পারে। অবশ্য জনস্বার্থে এই সব সরকার-প্রণীত আইন যথাযথভাবে প্রচারিত হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সংসদের পরীক্ষণ ও অনুমোদনের জন্যও ঘোষিত হয়ে থাকে। আবার দেশরক্ষা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপরিচালনা, আর্থিক পরিকল্পনা ইত্যাদি কতকগুলি ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণের ব্যাপারটি সরকারের নিজস্ব বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া ছাড়া কোন উপায় নাই।

আইনের শাসনের ত্রুটি বিচ্যুতি :
Deficiencies of the Rule of Law

শাসনবিভাগীয় বিধি ছাড়াও সাধারণ আইনের বাইরে আরও অনেক রকমের নিয়ম কানুন দেশে প্রচলিত থাকে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে উৎপাদন ও পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণমূলক নিয়মকানুন, চাকুরীজীবীদের পক্ষে পেশা-সংক্রান্ত নিয়মকানুন, ধর্মসম্প্রদায়ের নিজস্ব বিধি ব্যবস্থা, সৈন্যবিভাগীয় আইন ও বিচারালয় ইত্যাদি এর উদাহরণ। বহুরূপাত্মক (pluralistic) সামাজিক কাঠামোয় এসব নিয়মকানুন অপরিহার্য।

দ্বিতীয়তঃ, ডাইসী-ব্যাখ্যাত আইনের দৃষ্টিতে সাম্য কথাটিও ভ্রমাত্মক। দেশের সর্বোচ্চ শাসক থেকে শুরু করে সামান্যতম শ্রমিক পর্যন্ত একই আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন। একথা উৎসাহব্যঞ্জক হলেও বাস্তবে এর কোন ভিত্তি নাই। আইনের চোখে সাম্যের অর্থ এমন হতেই পারে না যে, শ্রেণীনির্বিশেষে সকলেরই এক রকমের অধিকার ও কর্তব্য থাকবে। পেশা বৃত্তি বয়স ইত্যাদি অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ নিয়মকানুন রয়েছে। তবে স্ব স্ব শ্রেণীর মধ্যে যেহেতু ঐসব নিয়মকানুন সমানভাবে প্রযোজ্য

এবং বিশেষ বিচার-পরিষদে (Special tribunal) মোটের উপর সাধারণ বিচার-পদ্ধতি মেনে চলা হয় বলে একথা মনে করা যেতে পারে যে আইনের দৃষ্টিতে সমতার নীতি ক্ষুণ্ণ হয় নি। প্রকৃতপক্ষে আইন প্রয়োগের বেলায় নয়, আইনভঙ্গজনিত শাস্তিদানের বেলাতেই আইনের চোখে সমতা যাতে রক্ষিত হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়।

তৃতীয়তঃ, আইনানুসারে দণ্ডের ব্যাপারে সরকারী কর্মচারী ও সাধারণ নাগরিকের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না এবং একই আদালতে ও একই আইনে উভয়ের বিচার পরিচালিত হয় বলে ডাইসী মনে করেন যে ইংল্যাণ্ডে ব্যক্তি-অধিকার অক্ষুণ্ণ রয়েছে। পক্ষান্তরে ফ্রান্সে প্রশাসনিক বিধি এবং প্রশাসনিক আদালত থাকায় সরকারের হাতে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে এবং অনুষ্ঠিত অপরাধের শাস্তি থেকে সরকারী কর্মচারীদের রক্ষা করা হয়ে থাকে বলে মনে করা হয়। এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। কার্যতঃ ফ্রান্সে সরকারী কর্মচারীর কার্যকলাপকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যেসব ক্ষেত্রে সরকারী কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে সরকারী কর্তব্যজনিত কোন আইন ভঙ্গ করা হয় সেক্ষেত্রে বিশেষ প্রশাসনিক বিধি অনুযায়ী প্রশাসনিক আদালতে সেই অপরাধের বিচার করা হয়। কিন্তু সরকারী কর্মচারীগণ ব্যক্তিগত দায়িত্বে যে অপরাধ করেন এবং যার সঙ্গে সরকারী কার্যের কোন সম্পর্ক নাই, সেক্ষেত্রে সাধারণ আদালতে সাধারণ পদ্ধতিতেই তাঁদের অভিযোগ ও বিচার হয়ে থাকে। এছাড়া, ইংল্যাণ্ডেও যে প্রশাসনিক বিধি ও বিশেষ বিচার ব্যবস্থার প্রসার হয়নি সে কথা মনে করা ভুল হবে। প্রকৃতপক্ষে, সরকারের বিভিন্ন কর্তব্যের মধ্যে বর্তমানে এমন কতকগুলি বিষয় অঙ্গীভূত হয়েছে যে সব বিষয়ে নাগরিকদের সঙ্গে সরকারী কর্মচারীদের বিরোধ দেখা দিলে বিভাগীয় পর্যায়ে বা বিশেষ বিচার-সংস্থার মাধ্যমেই সেগুলির মীমাংসা হয়। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহন, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি এর উদাহরণ।

চতুর্থতঃ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উপর ভিত্তি করে যে ধনবৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থা ইংল্যাণ্ডে বর্তমানে প্রচলিত তার পরিপ্রেক্ষিতে 'আইনের চক্ষে সমতা' কথাটি অন্তঃসারশূন্য বলে মনে হয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক [illegible] বলে আইন ও আদালতের সুযোগ গ্রহণ করে স্বার্থসাধন [illegible] সমাজে অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনায় দাঁড়িয়ে গেছে।

পঞ্চমতঃ, ডাইসী বলেছেন, যে ইংল্যাণ্ডে ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে সাধারণ আইন ও সাধারণ আদালতের ওপর নির্ভরশীল। অথচ ইতিহাস

অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে অধিকাংশ অধিকারই বিচারালয় বা চিরাচরিত আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই সব অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শাসনপরিচালনা সংক্রান্ত কতকগুলি নীতি আবার সম্পূর্ণরূপে অলিখিত প্রথা বা রীতিনীতির ওপর নির্ভর করে আছে। ইংল্যাণ্ডে ব্যক্তিস্বাধীনতা যে ধরনের প্রতিশ্রুতির ওপরই নির্ভরশীল হোক না কেন, একথা অনস্বীকার্য যে এক্ষেত্রে সংসদের সার্বভৌমিকতাই হয় চরম নিয়ামক শক্তি। সংসদ প্রয়োজনমত সাধারণ আইনকে যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবে পরিবর্তিত করতে পারে এবং এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করার অধিকার কোন আদালতকে দেওয়া হয়নি। সুতরাং জনস্বার্থবিরোধী আইনের বিরুদ্ধে কোন আইনসংগত প্রতিকারের সুযোগ ইংল্যাণ্ডে নাই। তবে, চরম-অবস্থায় সরকারকে জনমতের কাছে নতি স্বীকার করতেই হয়। তাই গণ-অধিকার রক্ষার একমাত্র রক্ষাকবচ হল সজাগ জনমত।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও তার তাৎপর্য
(Constitutional Monarchy and Its Implications)

১৬৪৯ থেকে ১৬৬০ সাল পর্যন্ত স্বল্প সময়ের জন্য ক্রমওয়েলের অধীনে সাধারণতন্ত্রের কথা বাদ দিলে বলা যায়, ইংল্যাণ্ডে এ্যাংলো-স্যাকসন যুগ থেকে রাজতন্ত্র অব্যাহতভাবে চলে আসছে। এই রাজতন্ত্রের ইতিহাস নানা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। টিউডর বংশের শাসন পর্যন্ত রাজার হাতে অসীম ক্ষমতা ছিল এবং তিনি সেগুলির যথেচ্ছ প্রয়োগ করলে বাধা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। এর পর ষ্টুয়ার্ট রাজারাও এই ঐতিহ্যকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন। এমন কি প্রথম জেম্‌স্ সরাসরি রাজতন্ত্রকে দৈবী ক্ষমতার (divine right) অধিকারী বলে মনে করতেন। ততদিনে অবশ্য অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। চার্চ ও রাজতন্ত্রের তীব্র বিরোধে রাজার পাশে দাঁড়িয়ে সংসদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সঙ্গে সামন্ত-শ্রেণীর প্রভাব হ্রাস ও নূতন বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভবের ফলে রাজার সমর্থকদের সংখ্যা কমে গেল এবং সংসদের ক্ষমতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল। রাজকার্যের সমালোচনা ছাড়াও প্রত্যক্ষভাবে নানাক্ষেত্রে, বিশেষ করে করধার্য করার ব্যাপারে, বিরোধ দেখা দিলে ষ্টুয়ার্ট রাজারা সংসদ ভেঙে দিতে শুরু করলেন। এর ফলে যে বিক্ষোভ সঞ্চার হল তা সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি গৃহযুদ্ধ এবং

১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লবে পরিণতি লাভ করে। সংসদ ও রাজতন্ত্রের এই বিরোধে সংসদের জয় হল এবং নূতন রাজা উইলিয়ম সংসদের নিয়ন্ত্রণ মেনে নিলেন। এর পরে হ্যানোভার বংশীয় রাজাদের সময় কি ভাবে মন্ত্রীসভার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং কিভাবে রাজার ক্ষমতাগুলি একে একে মন্ত্রিসভার হাতে চলে আসে সে কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। মোটের উপর রাজার নিজস্ব ক্ষমতা বলতে প্রায় কিছুই আর অবশিষ্ট রইল না। বাজা এখন নামে মাত্র রাষ্ট্রপ্রধান; আসলে তিনি নিয়মতান্ত্রিক শাসন ছাড়া আর কিছুই নন। তবে ক্ষমতা হ্রাস পেলেও রাজতন্ত্রের অস্তিত্বের ওপব এ পর্যন্ত কোন আঘাত আসেনি। ইংল্যাণ্ডের ঐতিহ্যপ্রিয়তা এই বহু পুরাতন প্রতিষ্ঠানটিকে আজও সযত্নে রক্ষা করে আসছে। সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও রাজতন্ত্রেব জনপ্রিয়তার দরুণ উভয়ের মধ্যে এক সামঞ্জস্য স্থাপনেব চেষ্টা কবা হযেছে, এব ফলেই উদ্ভব হযেছে নিয়মতান্ত্রিক বাজতন্ত্রেব।

রাজা ও রাজতন্ত্র (The King and the Crown): রাজতন্ত্রেব প্রথম-যুগে স্বৈরাচারী রাজার ব্যক্তিগত ভূমিকাব সঙ্গে প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাজতন্ত্রের কোন পার্থক্য করা হত না। কিন্তু ক্রমেই সংসদীয় নিয়মতান্ত্রিকতা এবং উত্তরাধিকারের সূত্রাদি প্রয়োগে রাজতন্ত্র এখন মুখ্যতঃ একটি সম্মানার্হ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তিগতভাবে রাজাব সঙ্গে এব অনেক পার্থক্য। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় শব্দযোজনাব নানা সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু গ্ল্যাডস্টোন বলেছেন তাব মধ্যে সব চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হল বাজা ও বাজতন্ত্রের পার্থক্য। এই পার্থক্যের ভিত্তিতেই "রাজাব মৃত্যু হযেছে, রাজা দীর্ঘজীবী হোন" প্রভৃতি বিচিত্র প্রবাদেব প্রচলন হযেছে। এব অর্থ হল কোন একজন বিশেষ রাজার মৃত্যু হলেও রাজতন্ত্রেব প্রতিষ্ঠানটি অব্যাহত থাকে। রাজা ষষ্ঠ জর্জের মৃত্যুর পর বাজপদ শূন্য হয়নি—তাঁব প্রথমা কন্যা রানী এলিজাবেথ রাজমুকুট ধারণ করেছেন। সুতরাং বাজতন্ত্রের বিনাশ নাই। রাজার কার্যক্রম ও বিশেষ ক্ষমতাসমূহ কোন সময়েই মুলতুবী থাকে না। কেননা এগুলির বিধৃতি কোন একটি ব্যক্তিতে না, একটি বিশেষ সম্মানিত পদমর্যাদায়।

পদমর্যাদা হিসেবে রাজতন্ত্রের এই যে বিশেষ ধারণা, এর ফলে রাজতন্ত্রকে একটি বিমূর্ত ভাব বলে কেউ কেউ মনে কবেন।[1] অধ্যাপক ডাঃ হারমান ফাইনার অবশ্য তথ্যটিকে আরও বস্তুনিষ্ঠ ভঙ্গীতে উপস্থাপিত করে বলেছেন,

[1] "The Crown is an artificial or juristic person, it is not incarnate, and it never dies"—Munro: "Govts. of Europe".

"রাজনীতিতে রাজার কার্যকলাপের কথা বলে থাকি তখন তার অর্থ হল, বহু শতাব্দী ধরে শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত বিধিসম্মত পন্থায় জনসাধারণ, সংসদ এবং মন্ত্রিপরিষদ সেইসব কার্যকলাপের পরিচালনশক্তি সঞ্চার করে থাকে। রাজনৈতিক কর্মক্ষমতাব এই সব কার্যকরী কেন্দ্রাবস্থার ওপর রাজতন্ত্র একটি আভরণ ও আচরণ মাত্র।" শাসনপরিচালনায় যাবতীয় ক্ষমতার প্রতীক হল রাজতন্ত্র। আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এটি একটি চরম-ক্ষমতার সংহতি-বিশেষ।

রাজার ক্ষমতা (Powers of the Crown) :

তত্ত্বগতভাবে ব্রিটিশ রাজশক্তিব যে সমস্ত ক্ষমতা আছে বলে মনে কবা হয় সেগুলির দুটি উৎস : একটি হল পুবোন যুগ থেকে চলে আসা রীতিনীতি, অপরটি সংসদ কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইন। প্রাচীন রীতিনীতির উপর যে সমস্ত ক্ষমতা নির্ভর করে আছে সেগুলিকে রাজার বিশেষাধিকার (Prerogatives of the Crown) বলা হয়। বিশেষাধিকারগুলির বিশদ আলোচনার আগে আইনেব দ্বারা বিধিবদ্ধ ও অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত রাজার ক্ষমতাগুলি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই ক্ষমতাগুলিকে শাসনসংক্রান্ত, আইনসংক্রান্ত, বিচার-সংক্রান্ত এবং বিবিধ—এই চার শ্রেণীতে ভাগ কবা যেতে পারে।

শাসনসংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা রাজা বা রানীর নামেই প্রয়োগ করা হয়।

শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা
Executive Powers

কেন না, রাজশক্তিই দেশের শাসনব্যবস্থার শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত। আইন কানুন যাতে যথাযথভাবে কার্যকরী হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা রাজা বা রানীর কর্তব্য।

শাসনবিভাগের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে (মন্ত্রিপরিষদসহ) রাজাই কর্মচারীদের নিয়োগ করেন। বিচারবিভাগ ছাড়া অন্যান্য কর্মচারীদের সাময়িকভাবে বা চিরতরে অপসারণের ক্ষমতাও তাঁর রয়েছে। তিনিই স্থল, নৌ ও বিমান বিভাগীয় সেনাবাহিনীর সর্বময় অধিনায়ক।

[2] "When we talk of the actions of the Crown in politics, we mean that the people, Parliament and the Cabinet have supplied the motive power through the formal arrangements established by centuries of constitutional development. The Crown is the ornamental cap over all these effective centres of political energy."
—Finer, H : "The Theory and Practice of Modern Government."

বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনা করার ভারও রাজা বা রানীর উপর ন্যস্ত। রাষ্ট্রদূত ও বিদেশে বিভিন্ন প্রতিনিধিকে নিয়োগ, প্রেরণ ও নির্দেশ দেওয়া এবং বিদেশ থেকে আগত কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের গ্রহণ করা তাঁর কর্তব্য। যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তিস্থাপনও তাঁর নামেই হয়ে থাকে। অবশ্য যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়বরাদ্দের জন্য সংসদের অনুমোদন প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতাও রাজাকে দেওয়া হয়েছে। তবে যদি কোন চুক্তি দ্বারা দেশের সাধারণ আইনের বা ব্রিটিশ নাগরিকদের অধিকারের কোন পরিবর্তন বা ভূখণ্ড সমর্পণ বা রাজকোষ থেকে অর্থ প্রদান করতে হয়, সেক্ষেত্রে সংসদের অনুমোদন ছাড়া চুক্তি সম্পাদন করা যায় না।

আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা
Legislative Powers

ইংল্যাণ্ডে সংসদ বলতে রাজা বা রানীসহ সংসদ বোঝায় (the King or Queen in Parliament)। রাজা সংসদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং সংসদেরই পরামর্শক্রমে তিনি আইন প্রণয়ন করে থাকেন। প্রত্যেক আইনের শুরুতেই তাই মুখবন্ধ থাকে : "ধর্মীয় ও লৌকিক সামন্তবর্গ এবং জনসাধারণের অনুমোদনক্রমে রাজার চরম কর্তৃত্বে ইহা বিধিবদ্ধ হউক যে · " ইত্যাদি।[1]

সংসদের অধিবেশন আহ্বান ও অবসান করা এবং সংসদকে ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতাও আইনতঃ রাজার হাতে ন্যস্ত। সংসদের নূতন অধিবেশনে রাজা বা রাণী উদ্বোধনী বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। এই রাজকীয় অভিভাষণ যদিও রাজা স্বয়ং বা তাঁর তরফে লর্ড চ্যান্সেলর পাঠ করে থাকেন, আসলে ভাষণটি মন্ত্রিসভার নির্দেশে রচিত হয়। কারণ সরকারের প্রধান প্রধান নীতি ও কর্মসূচী এই অভিভাষনের উপজীব্য। সুতরাং অভিভাষণের সঙ্গে রাজা বা রানীর ব্যক্তিগত মতামতের কোন সম্পর্ক নাই। এটি মন্ত্রিসভার নীতির ঘোষণামাত্র। ভাষনের কোন অংশ সম্পর্কে রাজা বা রানীর আপত্তি থাকলেও তাঁকে মন্ত্রিদের অনুসারে চলতে হয়।

আইনপ্রণয়নের ব্যাপারেও রাজা বা রানীর বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে, রাজা বা রানীর সম্মতি ছাড়া কোন বিলই আইনে পরিণত হতে পারে না, সংসদে সমস্ত অর্থসংক্রান্ত ব্যয়বরাদ্দের দাবী এবং করধার্যের প্রস্তাবও রাজার নামেই আনয়ন করা হয়।

---

[1] "Be it enacted by the King's most excellent majesty with the consent of the Lords Spiritual and Temporal and the Commons…".

দেখা যাচ্ছে যে সংসদ ভেঙে দেওয়া বা আইন প্রণয়নে সম্মতি ও অসম্মতি দেওয়ার ক্ষমতা যখন রয়েছে তখন রাজাকে আইনসংক্রান্ত ব্যাপারে চরম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এই সমস্ত ক্ষমতাই রাজা বা রানী প্রধান মন্ত্রির পরামর্শক্রমে প্রয়োগ করে থাকেন। মন্ত্রিসভার পরামর্শ ছাড়া ব্যক্তিগত দায়িত্বে সংসদ ভেঙে দেওয়া বা আইনে সম্মতি না দেওয়ার তথ্যগত ক্ষমতা থাকলেও কার্যতঃ এই ক্ষমতার প্রয়োগ সম্ভব নয়। কারণ সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করতে পারে। একমাত্র যদি একথা স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায় যে ক্ষমতাশীল মন্ত্রিসভা জনগণের আস্থা হারিয়েছে বা রাজার সঙ্গে একমত এমন একটি বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব যে মন্ত্রিসভা রাজা বা রানী কর্তৃক সংসদ ভেঙে দেওয়ার পক্ষপাতী তাহলেই সংসদ ভেঙে দেওয়া চলতে পারে। ইচ্ছামত আইন প্রণয়নে সম্মতি বা অসম্মতি দানের ব্যাপারেও সেই একই বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনের সমস্যা দেখা দেয়। ক্ষমতাশীল মন্ত্রিসভা যতদিন সংসদের আস্থাভাজন থাকবে ততদিন বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। সুতরাং এই সমস্ত ক্ষমতা মন্ত্রিসভার পরামর্শ ছাড়া প্রয়োগ করা বিপজ্জনক। রাজাকে সব রকম দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে মনে করা হয়। এই রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হলে রাজা ইচ্ছামত আচরণ করতে পারেন না।

দ্বাদশ শতকে দ্বিতীয় হেনরীর সময় শাসনবিভাগ থেকে বিচারবিভাগ পৃথক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রাজা বা রানী প্রত্যক্ষভাবে বিচারকার্যে হস্তক্ষেপ করতেন; এমনকি বিচারালয়ের সিদ্ধান্তকেও বাতিল করে দিতে পারতেন। সেইসূত্রে তত্ত্বগতভাবে রাজা বা রানীকে এখনও ন্যায়বিচারের উৎস বলে মনে করা হয়। কার্যতঃ অবশ্য বিচারবিভাগীয় কাজকর্মে এখন আর রাজার কোন প্রত্যক্ষ হাত নাই। বিচারকদের কর্মের মেয়াদ, বেতন, অপসারণের নিয়ম ইত্যাদি সংসদের আইনেই স্থিরীকৃত হয়। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজাই সমস্ত বিচারকদের নিয়োগ করেন। সমস্ত ফৌজদারী মামলা রাজশক্তির নামেই উত্থাপিত হয়।

বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা
Judicial Powers

সাগরপারের উপনিবেশ ও ডমিনিয়নগুলি থেকে আগত তত্রস্থ আদালতের বিরুদ্ধে সমস্ত আপীল রাজার দপ্তরে দাখিল করা হয় এবং প্রিভিকাউন্সিলের বিচারবিভাগীয় সমিতির পরামর্শক্রমে রাজা এইসব আপীলের বিচার করে থাকেন। সর্বোপরি দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন এবং কোন দণ্ডাদেশ হ্রাস বা রহিত করার ক্ষমতা রাজশক্তির আছে।

এছাড়া রাজশক্তিকেই ইংল্যাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত গীর্জাগুলির প্রধান বলে গণ্য করা হয়। আর্চবিশপ, বিশপ ও বিশিষ্ট যাজকদের রাজা নিয়োগ করে থাকেন। আবার রাজাই রাজ্যের সমুদয় সম্মানের উৎস। তিনি লর্ডের পদাধিকার ও অন্যান্য সম্মান ও উপাধি বিতরণ করে থাকেন।

অন্যান্য ক্ষমতা
Other Powers

রাজার বিশেষ ক্ষমতাসমূহ (Prerogatives of the Crown) :

প্রাচীনকাল থেকেই রাজা একাধিক বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করে আসছেন। এই সব বিশেষ ক্ষমতার প্রকৃতি নির্দেশ করতে গিয়ে আইনবিদ ব্ল্যাকষ্টোন বলেছেন, নিজস্ব রাজকীয় মর্যাদাবলে আইনের ক্ষেত্রাধিকার বহির্ভূত যে বিশেষ প্রাধান্য অন্যান্য সকলের ওপর রাজার রয়েছে তাকেই রাজার বিশেষ ক্ষমতা বলা যায়।[1] এই সংজ্ঞাটির ত্রুটি হল রাজার বিশেষ ক্ষমতাকে আইনের এক্তিয়ারমুক্ত বলে মনে করা। আসলে কিন্তু রাজার এই সব ক্ষমতা প্রথাগত আইনের থেকেই সঞ্জাত এবং কোন কোন ক্ষমতা এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত সে সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠলে সাধারণ আদালতই তার মীমাংসা করে থাকে। অপেক্ষাকৃত নিখুঁত এবং স্পষ্ট একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন ডাইসী। তাঁর ভাষায় কোন রাজার নিজের বিবেচনা অনুযায়ী অথবা স্বেচ্ছায় কাজ করার যে সব ক্ষমতা ছিল কোন বিশেষ সময়ে তার আইনানুমোদিত অবশিষ্টাংশই রাজকীয় বিশেষ ক্ষমতা।[2] এই অবশিষ্টাংশ কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে যে সংসদ যে কোন সময় আইনের বলে রাজার ক্ষমতা সংকুচিত করতে পারে। একমাত্র তদতিরিক্ত যে ক্ষমতাটুকু অক্ষুণ্ণ থাকে সেটুকুই রাজার বিশেষ ক্ষমতার অঙ্গীভূত।

বিশেষ ক্ষমতাগুলির প্রকৃতি :
Nature of the Prerogatives

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বিশেষাধিকারের কতকগুলি সীমা আছে। আদালতের সিদ্ধান্ত এবং সংসদীয় আইন তার মধ্যে অন্যতম। এ ছাড়া,

---

1 A prerogative is "that preeminence which the king hath over and above all other persons, not by virtue of any law, but out of its ordinary course in right of his royal dignity".—Blackstone.

2 "The residue of the discretionary or arbitrary authority which at any time is legally left in the hands of the Crown".—Dicey.

মন্ত্রিপরিষদের দ্বারা পরিচালিত দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজার এই বিশেষ ক্ষমতাগুলি মূলতঃ সরকার রাজা বা রানীর তরফে প্রয়োগ করে থাকে। এর জন্যে সরকারকে সংসদের কাছে দায়ী থাকতে হয়। বিশেষ ক্ষমতার অপপ্রয়োগ হলে সংসদ মন্ত্রিসভার সমালোচনা করতে পারে। সুতরাং কোন ক্ষমতা

বিশেষ ক্ষমতাগুলির সংকোচন
Limitations on the Prerogatives

বিশেষ ক্ষমতার পর্যায়ভুক্ত কিনা তা নির্ধারণ করার অধিকার আদালতের থাকলেও, যে মুহূর্তে কোন ক্ষমতা এই মর্যাদাপ্রাপ্ত বলে স্বীকৃত হবে সেই মুহূর্তে ঐ ক্ষমতার প্রয়োগ সম্বন্ধে আদালতের কিছু বলার থাকবে না। একমাত্র সংসদেই সে বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। বিশেষ ক্ষমতা ও সংসদের আইনের সম্পর্ক নিয়ে 'এ্যাটর্ণী জেনারেল বনাম ডি কেইসার রয়্যাল হোটেল' মামলার সিদ্ধান্তে নেওয়া হয়েছে যে সংসদের দ্বারা রহিত হলে বা ঐ বিষয়েই বিধিবদ্ধ নির্দেশ দ্বারা ক্ষমতা দেওয়া হলে প্রথাভিত্তিক বিশেষ ক্ষমতার বিলোপ ঘটে।

রাজার কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল :

(১) রাজা সমস্ত ন্যায়বিচারের উৎস। রাজ্যের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাজার। সুতরাং শান্তিভঙ্গকারী ব্যক্তিকে রাজার নামেই অভিযুক্ত করা হবে। আবার বিচারবিভাগীয় দণ্ড থেকে অব্যাহতি দান বা আপীল ইত্যাদির বিচারও রাজাই করে থাকেন।

(২) সংসদের অধিবেশন আহ্বান করা, স্থগিত রাখা বা বাতিল করার ক্ষমতাও রাজার রয়েছে। যদিও মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমেই সংসদ ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতাটি রাজা প্রয়োগ করে থাকেন, তবু এই ব্যাপারে রাজাকে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে দেখতে হয়। সরকারের বিরুদ্ধবাদী সংসদে যদি সত্যসত্যই জনমত প্রতিফলিত না হয় একমাত্র তখনই তিনি সংসদ ভেঙে দিতে পারেন।

(৩) সংসদ যদিও একটি আইন পাশ করে প্রতি বৎসর সৈন্যবাহিনীর আইনগত অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়, তবু স্থল, নৌ ও বিমান বহরের সমস্ত পরিচালনা রাজার নির্দেশেই হয়ে থাকে।

(৪) রাজাই সমুদয় সম্মান বিতরণের অধিকারী। ইচ্ছামত লর্ড সৃষ্টির ক্ষমতা তাঁর আছে। ক্ষেত্র বিশেষে অবশ্য এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। একটি সংস্কার বিল। লর্ডস সভার মাধ্যমে পাশ করানোর জন্য চতুর্থ উইলিয়াম

[illegible]
সাংবিধানিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে এমন কাজ করলে স্বভাবতঃই বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে ও বিক্ষোভের সঞ্চার হবে।

(৫) রাজার বয়স যতই হোক না কেন তাঁর রাজকীয় মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক রাজা সংসদের বিল অনুমোদন করলে সে বিলের আইনগত বৈধতা সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৬) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাজা জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে কূটনৈতিক কর্তব্যাদি সম্পাদন করেন।

(৭) রাজার কখনই মৃত্যু নেই। এক বিশেষ রাজার মৃত্যু হলেও রাজপদ শূন্য থাকে না। প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদের পর প্রায় এক বৎসর বাদে দ্বিতীয় চার্লস সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু অন্তর্বর্তীকালটুকু প্রথম চার্লসের রাজত্বকাল বলে ধরা হয়। কৌতুকাবহ হলেও রাজার অমরত্বের এই ধারণার ব্যবহারিক প্রয়োগ রয়েছে। ১৯১০ সালের রাজমৃত্যু আইন (Demise of the Crown Act, 1910) অনুসারে রাজার মৃত্যু হলেও রাজকর্মচারীদের কর্মের কোন পরিবর্তন হয় না বা সংসদ ভেঙে যায় না। কারণ রাজকর্মচারী নিয়োগ বা সংসদ আহ্বান রাজা ব্যক্তিগত ক্ষমতায় করেন। পদাধিকার বলেই রাজশক্তিতে এই কাজগুলি হয়ে থাকে।

(৮) অনুরূপ ভাবে একথাও বলা হয় যে 'রাজা সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত' বা 'রাজা কোন অন্যায়ই করিতে পারেন না' ("The King can do no wrong")। এর অর্থ এই নয় যে রাজা ব্যক্তিজীবনে কোন অপরাধ করতে পারেন না। সেকথা কল্পনা করা অযৌক্তিক। প্রকৃতপক্ষে রাজার রাজকীয় ক্ষমতাগুলি যেহেতু মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমেই প্রযুক্ত হয় এবং রাজাও সেইসব পরামর্শ মেনে নিতে বাধ্য থাকেন, সেই হেতু রাজকার্যের কোন দায়িত্ব রাজাকে স্পর্শ করে না। শাসন পরিচালনার সমগ্র ঝুঁকি মন্ত্রিসভাকেই বহন করতে হয়। 'রাজা কোন অন্যায় করতে পারেন না'। সুতরাং রাজকর্মচারীরা স্বকৃত অন্যায়ের দায়িত্ব রাজার নামে চালিয়ে দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আইনভঙ্গের অভিযোগ ও তজ্জনিত শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারেন না। আগে অবশ্য রাজার বিরুদ্ধে কোন ক্ষেত্রেই অভিযোগ আনয়ন করা যেত না বলে শাসন বিভাগের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিকার লাভ করা সম্ভব ছিল না। ১৯৪৭ সালের 'The Crown Proceedings Act' পাশ হওয়ার পর এইসব অসুবিধা দূর হয়েছে। বর্তমানে কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া আদালতে

রাজার বিরুদ্ধে বা রাজকর্মচারীর বিরুদ্ধে দেওয়ানী দায়িত্ব, চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ বা অন্যায় অনুষ্ঠানের অভিযোগ আনয়ন করা যেতে পারে।

অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, বর্তমানে রাজার প্রথাভিত্তিক বিশেষ ক্ষমতার সঙ্গে আইনপ্রদত্ত অধিকারের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। কারণ উভয়ক্ষেত্রে সংসদের অনুমোদন এবং মন্ত্রিসভার পরামর্শ সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। এর ফলে রাজার বিশেষাধিকারের ক্ষেত্রটি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে একথা সত্য। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলী বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ক্রমবর্ধমান কর্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে সংসদকে নিত্য নূতন আইন করে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হচ্ছে। অগ ও জিঙ্ক এই ঘটনাটিকেই স্মরণ রেখে বলেছেন গণতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে রাজার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।[1] অর্থাৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিভিন্ন আদর্শ রূপায়ণ করতে গিয়ে রাজার নামে জনগণের প্রতিনিধি সরকারের হাতে ক্রমশঃ অধিক হারে ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের স্বরূপ (Implications of Constitutional Monarchy) :

আপাতদৃষ্টিতে রাজশক্তির এই প্রবল ক্ষমতা ও সম্রাট হিসাবে অসামান্য মর্যাদার দিকটি বিবেচনা করলে রাজাকে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের সর্বাধিক শক্তিমান সার্বভৌম ব্যক্তিত্ব বলে মনে হবে। কিন্তু গভীর বাস্তববুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে তত্ত্ব ও ঘটনার মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য সমস্ত ব্রিটিশ শাসনযন্ত্রে ছড়িয়ে আছে, শাসন তন্ত্রে রাজার স্থানটি তার একটি যথার্থ দৃষ্টান্তরূপে উপস্থিত করা যাবে। সামাজিক ও আনুষ্ঠানিক দিক থেকে রাজশক্তির গুরুত্ব পূর্বের থেকে কিছুই কমেনি একথা সত্য। কিন্তু জনশাসনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তাঁর কিছুই নেই। আইনত যদিও বলা হয় যে, গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ থেকে শুরু করে আইনপ্রণয়নের খুঁটিনাটি পর্যন্ত সরকারের সমস্ত কার্যকলাপ রাজাজ্ঞায় পরিচালিত হয়, আসলে মন্ত্রিরাই রাজার নামে এইসব কার্য পরিচালনা করে থাকেন এবং তার জন্যে জনসাধারণের কাছে সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকেন। এইজন্যই দেখা যায় যে বিচারপতিগণ তদীয় প্রভুত্বেরই অধীন (His Majesty's Judges) বলে বর্ণনা করা হলেও ষ্টুয়ার্ট শাসনের সময়

---

1 "the powers of the Crown have expanded as democracy has grown." Ogg and Zink : Modern Foreign Governments

কোন পরামর্শ মানতে বাধ্য থাকেন না। অবশ্য যতক্ষণ সংসদে সুস্পষ্ট সংখ্যা-গরিষ্ঠতা সম্পন্ন কোন একটি দলের সর্বজনস্বীকৃত নেতা থাকবে ততক্ষণ রাজার নিজস্ব ইচ্ছানুযায়ী মনোনয়নের কোন সুযোগ নাই, তবে এমন কতকগুলি অবস্থার কথা কল্পনা করা যায় যখন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করতে গিয়ে রাজার নিজস্ব বিবেচনা প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, যদি প্রধানমন্ত্রি হঠাৎ মারা যান বা পদত্যাগ করেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলটির অন্য কোন বিকল্প নেতা স্থির করা না থাকে বা স্থির করা সম্ভব না হয় অথবা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের পর কোন দলই স্পষ্ট কোন সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারে তাহলে রাজাকে নিজ দায়িত্বে কোন একজন রাজনৈতিক নেতাকে প্রধানমন্ত্রিপদে নিয়োগ করতেই হয়। এই ব্যাপারে নিজস্ব মতামত বা বিবেচনা অনুসারেই তাঁকে কাজ করতে হয়। ১৯৩১ সালে র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের অধীনে জাতীয় সংযুক্ত সরকার (National Coalition Govt.) গঠন করার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব রাজা পঞ্চম জর্জের।

সংসদ ভেঙে দেওয়া সম্পর্কে দ্বিতীয় ক্ষমতাটি নিয়ে অবশ্য অনেক বিতর্ক হয়ে গেছে। ল্যাস্কি প্রভৃতি লেখকদের মতে সংসদ ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে মন্ত্রিসভাই নিয়ে থাকেন; তবে এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে হলে রাজার অনুমোদন দরকার। রাজা নিজেই যদি এই ব্যাপারে ইচ্ছামত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তাহলে তাঁকে রাজনীতির আবর্তের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে একাধিক সমালোচনামূলক প্রশ্নের অবতারণা হবে। পক্ষান্তরে অধ্যাপক কীথ বলছেন, "রাজাই আসলে শাসনব্যবস্থার রাজনীতিগুলি বজায় রাখার ব্যাপারে চূড়ান্ত দায়িত্বসম্পন্ন"[4] এবং জরুরী অবস্থায় জনসাধারণের হিতার্থে নিজের বিবেচনা অনুসারেই তিনি এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন। এমন কি এই উদ্দেশ্যে সম্মতি আদায়ের জন্য মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করার ভীতি প্রদর্শনও তিনি করতে পারেন। অতি চতুর মন্ত্রিসভাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এই ক্ষমতার প্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে যুক্তিযুক্ত হবে যদি তিনি স্থিরনিশ্চয় হন যে, মন্ত্রিসভা কৌশলে জনমতকে অগ্রাহ্য করছে বা সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন থাকলেও সংসদের বাইরে জনগণের আস্থা হারিয়েছে।

---

[4] "The Crown remains in fact an authority charged with the final duty of preserving the essentials of the Constitution" – Prof. Keith : "The British Cabinet System."

রাজতন্ত্রের সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব হল, বিমূর্ত রাষ্ট্রের ব্যক্তিগত প্রতীক হিসাবে রাজা শাসনব্যবস্থার শীর্ষাভরণ এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতির কেন্দ্রবিন্দু। দলাদলি ও রেষারেষির ফলে শাসন-শৃঙ্খলা ব্যাহত হবার উপক্রম হলে বা কোন সংকট থেকে সমগ্র জাতিকে উদ্ধার করতে হলে রাজা নিজের ব্যক্তিত্ব প্রয়োগ করে এই ঐক্য রক্ষা করেন। এই ক্ষেত্রে রাজার আজীবন কার্যকাল তাঁকে প্রতিটি সমস্যাকে স্বার্থ-নিরপেক্ষ ও বস্তু-নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করতে সাহায্য করে। আচার, সংবিধান, শাসনতন্ত্র, সরকার প্রভৃতি ভাববাচক শব্দে জনসাধারণের রাষ্ট্রানুগত্য খুব সামান্যই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। কিন্তু রাজার অস্তিত্ব শাসন-ব্যবস্থায় এক ধরনের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণীয়তা এনে দেয় করে যার ফলে সহজেই জনতার মধ্যে আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার সঞ্চার হয়। সরকার যা কিছু ভাল কাজ করেন জনগণ সে সবই রাজার হিতৈষণা বলে মেনে নেয়; আর সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়িত্ব বহন করতে হয় অস্থায়ী বা পরিবর্তনশীল মন্ত্রিসভাকে।

শাসনব্যবস্থার শীর্ষাভরণ ও ঐক্যের প্রতীক: Ornamental head of the government and symbol of unity

সরকারের কাযকলাপ সমালোচনা করার জন্য সংসদে যে বিরোধীদল রয়েছে তারও মর্যাদা ও অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকার কারণই হল এই বিরোধীদল রাজাদিষ্ট। ক্ষণস্থায়ী শাসনক্ষমতাসীন সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিরোধীদল দেশের স্থায়ী ও সাধারণ স্বার্থকে বজায় রাখার চেষ্টা করে। যে রক্ষণশীলতা ব্রিটিশ জনমানসের একটি আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য, তারও প্রতীক এই রাজশক্তি। অতীতের যা কিছু ভাল বলে গৃহীত তার সংরক্ষণ এবং অবিবেচনাপ্রসূত ত্বরিৎ পরিবর্তনের নিবারণ রাজার মাধ্যমেই সম্ভব। ভাষান্তরে, জনগণের ঐতিহ্যপ্রিয়তা রাজতন্ত্রের অবসান ঘটতে দেয়নি।

রাজাদিষ্ট বিরোধী দল: His Majesty's Opposition

রাজা শুধু গ্রেটব্রিটেনেরই ঐক্যের প্রতীক নন, ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশন্‌-এরও তিনি সাধারণ বন্ধনসূত্র। ১৯৪৯ সালে লণ্ডনে আহূত কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে এই ঐক্যবন্ধন বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়। বহুদূরে অবস্থিত ডমিনিয়ন, উপনিবেশ এবং সাম্প্রতিককালে স্বাধীনতা-প্রাপ্ত দেশগুলির মধ্যে অজস্র রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভেদ সত্ত্বেও রাজাকে কমনওয়েলথের শীর্ষস্থানীয় বলে সকলে একবাক্যে স্বীকার করেছেন।

ব্রিটিশ কমনওয়েলথের বন্ধনসূত্র: Tie of Unity in the Commonwealth

ব্রিটেনে রাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ও তার স্থায়িত্বের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার। প্রথমতঃ, রাজার অস্তিত্বের ফলে ক্রমবর্ধমান গণতান্ত্রিক শাসনের পথে কোন বাধা জন্মায়নি। যদি জনগণের দ্বারা বা জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা সরকার পরিচালনার ব্যাপারে রাজা বাধা দিতেন তাহলে গত এক শতাব্দীর অধিককালব্যাপী এই প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখা একমাত্র পরম্পরানুগত শক্তির (traditional forces) দ্বারা সম্ভব হ'ত না।

রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সহাবস্থান : Co-existence of Monarchy and Democracy

দ্বিতীয়তঃ, যে মন্ত্রিপরিষদ ব্যবস্থার উপর সমস্ত ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা নির্ভর করে আছে, কোন আনুষ্ঠানিক বা নামসর্বস্ব অধিনেতা (titular head) ছাড়া তার কার্যকলাপ সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা সম্ভব হত না। সমস্ত দলাদলির ঊর্ধ্বে, নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ কোন ব্যক্তি ছাড়া শাসনতান্ত্রিক বিরোধসমূহের সহজ সামঞ্জস্য বিধানের অন্য কোন উপায় নাই, অন্যান্য গণতন্ত্রী দেশেও রাষ্ট্রপতি বা অন্য কোন শীর্ষস্থানীয় নেতার ওপর এই দায়িত্ব অর্পিত। ব্রিটেনে রাজতন্ত্রকে বাদ দিলে এই ধরনের কোন পদ সৃষ্টি করাতে অনেক অসুবিধা। কেননা মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে ঐ ধরনের রাষ্ট্রনায়কের সম্পর্কটি রাজা ও মন্ত্রিসভার সম্পর্কের মত সহজ ও বিবর্তনভিত্তিক হত না। তাছাড়া দেশে-বিদেশে ঐক্য ও সংহতির প্রতীক হিসাবে রাজার যে ভূমিকা, অন্য কোনভাবে তার রূপায়ণ সম্ভব বলে মনে হয় না।

ইংল্যাণ্ডে রাজা মন্ত্রিসভার পরিপূরক : The king supplements the Cabinet in England

পরিশেষে, অশেষ মর্যাদাসম্পন্ন রাজশক্তি ব্রিটিশ সমাজে সাড়ম্বর নেতৃত্বের স্থান অধিকার করে আছে, আদব-কায়দা, রুচি, সমাজিকপ্রথা ইত্যাদি ব্যাপারে রাজপরিবার সারাদেশকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করে। আবার সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠানে ও জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানে পৌরোহিত্যের ভার নিয়ে রাজা একদিকে জনসাধারণকে উৎসাহিত করেন ; আবার অপরদিকে প্রধান-মন্ত্রিকে এই সমস্ত সময়সাপেক্ষ দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন।

রাজার সামাজিক নেতৃত্ব : Social leadership of the Monarch

মন্ত্রিসভা ও মন্ত্রিপরিষদ

(The Ministry and the Cabinet)

আইন ও বাস্তবতার মধ্যে যে আপাতবিরোধ সারা ব্রিটিশ সংবিধানের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে ব্রিটেনের মন্ত্রিপরিষদ তার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। সরকারের সমস্ত কর্তৃত্ব মন্ত্রিপরিষদেই বিধৃত, কমন্সসভার নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রিপরিষদই করে থাকেন; প্রশাসনব্যবস্থাও মন্ত্রিপরিষদের নির্দেশেই পরিচালিত হয়। অথচ ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত দু'একটি ইংগিত ছাড়া লিখিত বা বিধিবদ্ধ সাংবিধানিক আইনের মধ্যে কোথাও এর উল্লেখ পাওয়া যাবে না। দীর্ঘদিনের বিবর্তনের ফলে এর জন্ম এবং আইনগত ভিত্তি না থাকা সত্ত্বেও এই মন্ত্রিপরিষদই ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র।

রাজকীয় ক্ষমতা হস্তান্তর ও মন্ত্রিপরিষদের উদ্ভব (Transfer of Royal powers and growth of the Cabinet) :

গৌরবময় বিপ্লবের পর থেকে ইংল্যাণ্ডের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে দুটি লক্ষণীয় পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। এক, সংসদের ক্রমান্বয়ে ক্ষমতাবৃদ্ধি; দুই, পরামর্শ পরিষদ বা মন্ত্রিসভার ওপর রাজার ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা। আগে রাজাই সর্বেসর্বা ছিলেন। এখন এই দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শাসনকর্তৃত্ব বণ্টন হয়ে যাওয়াতে স্বাভাবিকভাবেই একটি নূতন ভারসাম্য সৃষ্টির প্রয়োজনে মন্ত্রিসভা ও সংসদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের বনিয়াদ গড়ে উঠল। প্রকৃতপক্ষে এই বনিয়াদের ওপরেই আজকের ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে।

সাধারণত: বলা হয়ে থাকে যে দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে যে 'ক্যাবাল' (Cabal) ছিল, তার থেকেই বর্তমান মন্ত্রিপরিষদের উদ্ভব। প্রিভিকৌন্সিলের মধ্য থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি নিয়ে এই ক্যাবাল গঠিত হয়েছিল। রাজা মৌখিকভাবে এইসব ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করবেন। নর্মান আমলের মহা-পরিষদ (Great council) থেকে যেমন প্রিভিকৌন্সিলের জন্ম, ক্যাবালও তেমনি প্রিভিকৌন্সিল থেকেই গড়ে উঠেছে। এইরকম ক্ষুদ্রতর পরামর্শ-পরিষদের দৃষ্টান্ত অবশ্য আগেও পাওয়া যায়, তবে ১৬৬০ সালের পর থেকেই এর মধ্যে মন্ত্রিপরিষদের সম্ভাবনা দেখা দেয়। পুনরুদ্ধার (Restoration) এবং গৌরবময় বিপ্লবের (Glorious revolution) পরিপ্রেক্ষিতে এর ক্রমপ্রসার॥

দ্বিতীয় চার্লস-এর 'ক্যাবাল'
'Cabal' of Charles II

দ্বিতীয় চার্লসের ক্যাবালের মধ্যে সংসদের সভ্যও দু'একজন থাকতেন, তবে তাঁরা কোন্ দলীয় মতাবলম্বী রাজা সে সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন না। এ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ রাজকীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় রাজা যে তাঁর খাসকামরায় (Cabinet) তাঁদের আলাদা ডেকে নিয়ে পরামর্শ করতেন এটা সাধারণে ভাল দৃষ্টিতে দেখেনি। তাই Cabinet কথাটি প্রথমযুগে কিছুটা নিন্দাসূচক ছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি যার ফলশ্রুতি সংসদের সার্বভৌমত্ব তাকে একটি কার্যকরী রূপ দেওয়ার প্রয়োজনে মন্ত্রিপরিষদের ভূমিকা অপরিহার্য হয়ে পড়ল।

তৃতীয় উইলিয়মের সময় গঠনগত দিক থেকে মন্ত্রিপরিষদের কিছু পরিমার্জনার চেষ্টা করা হয়। যদিও মন্ত্রিনির্বাচনের ব্যাপারে উইলিয়মের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল, তবু, হুইগ এবং টোরী উভয় দল থেকেই তিনি তাঁর মন্ত্রী মনোনয়ন করতেন। পরে দেখা গেল এতে অনেক অসুবিধা আছে এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। ফলে ১৬৯৩-৯৬ সালে একমাত্র হুইগ দল থেকেই তিনি মন্ত্রী মনোনয়ন করতে লাগলেন। ক্রমশ এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত রীতিতে পরিণতি লাভ করে। ফলে সভায় যে-দলের প্রাধান্য সেই দলই মন্ত্রিত্বের অধিকারী হয়। প্রথম প্রথম অবশ্য সংসদের তরফ থেকে এতে বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছিল। উত্তরাধিকারের আইনের একটি ধারা অনুযায়ী সরকারী কাজে বা লাভজনক কাজকর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির সংসদ-সদস্যপদ লাভ করার কোন অধিকার ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে রানী অ্যানের সময় এসব বিধি লোপ পেয়ে যায়। ক্রমেই এই প্রথা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে যে যখনই কোন নূতন উচ্চতর রাজনৈতিক পদ সৃষ্টি করা হবে তখনই আইনতঃ ঐ পদাধিকারীর সংসদের সভ্য হওয়ার অধিকার জন্মেছে বলে মনে করা হবে। বিশেষত মন্ত্রিগণকে সাধারণ রাজকর্মচারী বলে গণ্য করার ভিত্তি না থাকায়, এই প্রথাবলে তাঁরা সংসদ-সদস্য হওয়ার অধিকারী হলেন।

তৃতীয় উইলিয়মের সময়ে পরিবর্তন
Changes during the reign of William III

এর পর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জর্জের আমলে মন্ত্রিপরিষদ ক্রমশঃই স্বাভাবিক রূপ নিতে থাকে এবং উত্তরোত্তর ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। জার্মানীর হ্যানোভার দেশ থেকে আগত জর্জ রাজারা ইংরাজী ভাষা জানতেন না বলে এবং শাসনকার্যে তাঁদের ঔদাসীন্যের ফলে রাজকর্মের অনেক দায়িত্ব

বাধ্য হয়ে মন্ত্রিদের হাতে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। এই সময় ক্ষমতাসীন হুইগ দল এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে উদ্যোগী হল। যে কোন ভাবে কমন্সসভাকে বশে রাখা ছাড়াও, মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে দলনেতা ওয়ালপোল সভাপতিত্ব করতে শুরু করলেন। এইভাবে প্রধানমন্ত্রি পদের সূচনা হয়। তৃতীয় জর্জের ব্যক্তিগত শাসনের সময়েও রাজা মন্ত্রিপরিষদের অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকতে লাগলেন। বলতে গেলে এই ক'বছরের হুইগশাসনের সময়ই আধুনিক মন্ত্রি-পরিষদশাসিত শাসনব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি দানা বেঁধে ওঠে। সমস্ত মন্ত্রীই একটি দলের প্রতি অনুগত ছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর অধীনে তাঁরা কাজ করতেন; এমন কি সংসদের প্রতি দায়িত্বের নীতিও তাঁরা মেনে নেন। ১৭৪২ সালে হাউস অব কমনস্-এ পরাজয়ের পর ওয়ালপোল পদত্যাগ করেন। তৃতীয় জর্জের সময় অবশ্য রাজ-উদ্যোগে এই সমস্ত প্রথা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল; রাজা নিজের খুশীমত লর্ড নর্থকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসিয়ে নিজে শাসনকার্যের সবদিকে দৃষ্টি দিতে শুরু করলেন। কিন্তু আমেরিকায় স্বাধীনতার যুদ্ধে ব্রিটেনের পরাজয়ের ফলে ঘটনার গতি পরিবর্তিত হল। এই সময় ছোট পিট প্রধান-মন্ত্রী হলেন, তিনি রাজা ও জনসাধারণ উভয়েরই আস্থাভাজন ছিলেন। ক্রমে উনবিংশ শতাব্দীতে মোটামুটিভাবে মন্ত্রিপরিষদের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠল। স্বাভাবিক অবস্থায় দৈনন্দিন শাসনপদ্ধতি এভাবে স্থির হয়ে গেলেও, সংকটকালে মন্ত্রিসভার দায়িত্ব যে শতগুণ বৃদ্ধি পায় বিংশ শতকের দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক সংকটে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। এই সময় দলীয় বিরোধিতা তুচ্ছ হয়ে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য সর্বদলীয় সম্মিলিত মন্ত্রিপরিষদ (Coalition Cabinet) গঠন করার প্রয়োজন স্বীকৃত হল। লয়েড জর্জ, র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ও চার্চিলের সরকার এর উদাহরণ।

জর্জদের রাজত্বকাল
Reign of the Georges

সংকটকাল ও মন্ত্রিসভা
The Cabinet and emergency

মন্ত্রিপরিষদের গঠনগত বৈশিষ্ট্য (Structural Characteristics of the Cabinet):

ঐতিহাসিক দিক থেকে দীর্ঘদিন ধরে বিবর্তিত হলেও মন্ত্রিপরিষদের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে তত্ত্বগত অনুসন্ধান অতি সাম্প্রতিক। ব্ল্যাকস্টোনের 'কমেণ্টারী', বা আমেরিকার সংবিধান বা ১৭৯১ সালে ক্যানাডার শাসনসংক্রান্ত আইনেও এর কোন উল্লেখ দেখা যায় না। ডু-লোমকৃত (De Lolme) ব্রিটিশ সংবিধানের

বর্ণনাতেও মন্ত্রিপরিষদের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। একমাত্র ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত বেজহটের (Bagehot) প্রামাণ্য গ্রন্থে এর বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদের সংগঠন-স্বরূপ অনুধাবন করতে হলে প্রথমেই স্মরণ রাখা দরকার যে ব্রিটেনে মন্ত্রিসভা ও মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য রয়েছে। সংসদে যে সমস্ত সভ্য সরকারী দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং মন্ত্রিপরিষদের মতই যাঁদের কার্যকাল তাঁরা সবাই মিলে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। পক্ষান্তরে মন্ত্রিপরিষদ আরও ছোট একটি সংস্থা। মন্ত্রিসভার মধ্যে এটি একটি আভ্যন্তরীণ চক্রবিশেষ। সুতরাং মন্ত্রী-মাত্রেই মন্ত্রিপরিষদের সভ্য নন। একত্রে মন্ত্রিসভার অধিবেশন হয়না বললেই চলে; কিন্তু প্রায়ই মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক বসে। দপ্তর পরিচালনা ছাড়াও পরিষদভুক্ত মন্ত্রিরা সরকারী নীতিনির্ধারণ করেন, সাধারণ মন্ত্রিরা শুধু নিজ নিজ দপ্তর নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। ১৯৩৭ সালের 'মিনিষ্টার্স অব দি ক্রাউন এ্যাক্টে' এই প্রভেদটি সুস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী (যার বেতন ১০,০০০ পাউণ্ড) ছাড়া ১৭ জন অন্য মন্ত্রিদের (যাদের বেতন ৫০০০ পাউণ্ড) নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। প্রধান মন্ত্রীই স্থির করেন কোন কোন্ মন্ত্রী পরিষদভুক্ত হবেন।

মন্ত্রিসভার সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদের পার্থক্য:
Defference between the Cabinet and the Ministry

এছাড়া স্যার সিডনী লো-র আলোচনায় একটি 'আভ্যন্তরীণ মন্ত্রিগোষ্ঠী'র কথাও বলা হয়েছে। এই মন্ত্রিগোষ্ঠীকে মন্ত্রিপরিষদও বলা যায়না, মন্ত্রিসভাও বলা যায় না।[1] এটি মন্ত্রিসভা নয় এই কারণে যে এর অন্তর্ভুক্ত সভ্যেরা শাসনকার্যের পরিচালনা ছাড়াও মূলনীতি নির্ধারণ করে থাকে। আবার একে সরাসরি মন্ত্রিপরিষদ বলা চলে না এই কারণে যে সংসদের সঙ্গে মন্ত্রিসভার মত ঘনিষ্ট যোগ এর নাই। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে অবলুপ্তির (Dissolution) ভীতিপ্রদর্শন করে সংসদের ওপর এই গোষ্ঠী কর্তৃত্ব করে থাকে। এসব খুঁটি-নাটি বাদ দিলে, মোটের ওপর একথা বলা যায় যে কার্য ও ক্ষমতার দিক থেকে পার্থক্য থাকলেও মন্ত্রিপরিষদ বৃহত্তর সংস্থা মন্ত্রিসভারই অন্তর্ভুক্ত।

আভ্যন্তরীণ মন্ত্রিগোষ্ঠী
"Inner Cabinet"

রাজা সংসদের গরিষ্ঠ দল থেকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করার পর তাঁর ওপরেই প্রায় সত্তরটির মত ছোট বড় পদ পূরণের দায়িত্ব পড়ে যেগুলি সম্মিলিতভাবে

---

1 " We have a Cabinet which is not a ministry and a ministry which is not a cabinet" —Sir Sidney Low : The Govt of England.

মন্ত্রিসভা সৃষ্টি করে। এর মধ্যে প্রায় ৩০ জন প্রকৃত মন্ত্রী পর্যায়ে পড়েন, যদিও তাঁদের সকলে মন্ত্রিপরিষদভুক্ত নাও হতে পারেন। মন্ত্রিপরিষদভুক্ত হওয়া না-হওয়া রাজনৈতিক অবস্থার তারতম্যের ওপর নির্ভর করে। চেম্বারলিনের সময় ১৯৩৯ সালে ১৩ জন, মন্ত্রিপরিষদের সভ্য ছিলেন। আবার চার্চিলের সময় সমরকালীন মন্ত্রী-পরিষদে মাত্র ৮ জন সভ্য ছিলেন। মন্ত্রিপরিষদের সভ্যপদের স্থিরতা না থাকলেও প্রধান মন্ত্রী, রাজ-কোষাধ্যক্ষ (Chancellor of the Exchequer), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, বৈদেশিক মন্ত্রী, বিচারবিভাগীয় মন্ত্রী (Lord Chancellor), কমনওয়েলথ সেক্রেটারী, 'বোর্ড অফ্ ট্রেডের' সভাপতি, প্রতিরক্ষা ও শ্রমমন্ত্রী সাধারণতঃ এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হন। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, বয়স, প্রশাসনিক যোগ্যতা ইত্যাদি বিবেচনা করে বিভিন্ন মন্ত্রীর মধ্যে কার্য বণ্টন করে দেওয়া হয়। সময়বিশেষে কতকগুলি সাধারণ দপ্তরের গুরুত্ব আকস্মিকভাবে বর্ধিত হয়; সেক্ষেত্রে সাময়িকভাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে মন্ত্রিপরিষদে উন্নীত করারও ব্যবস্থা আছে। ১৯৪৫ সালের পর সরকারের জাতীয়করণ এবং সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাগুলির রূপায়ণের জন্য জ্বালানী ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রীর এইভাবে পদোন্নতি ঘটে। পরে এই সমস্ত কার্যভার সম্পন্ন হলে তাঁদের আবার সাধারণ মন্ত্রীর পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া কয়েকজন সাধারণ মন্ত্রী আছেন তাঁদের পরিষদভুক্ত করা না হলেও পরিষদীয় মন্ত্রীদের সমশ্রেণীভুক্ত (of Cabinet rank) বলে মনে করা হয় এবং পরিষদের বৈঠকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়।

মন্ত্রিপরিষদের গঠন
Composition of the Cabinet

এ ছাড়া কয়েকজন সংসদীয় সচিব থাকেন যাঁরা স্বরাষ্ট্র, বৈদেশিক, আর্থিক, স্বাস্থ্য ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে সংসদীয় দায়িত্বপালনে সাহায্য করে থাকেন। সাধারণতঃ অল্পবয়স্ক সংসদ-সদস্যদের রাজনীতির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ এই সব পদাধিকারের সুযোগে হয়ে থাকে। উপরন্তু মন্ত্রিপরিষদের সাধারণ কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করার জন্য ১৯১৬ সাল থেকে একটি ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েট চালু রয়েছে।

সংসদীয় সচিববৃন্দ
Parliamentary Secretaries

মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা ও কার্যধারা (Powers and functions of the Cabinet) :

১৯১৮ সালে 'শাসনযন্ত্র অনুসন্ধান কমিটির' রিপোর্ট (Report of the

Machinery of Government Committee, 1918) অনুসারে মন্ত্রিপরিষদের ত্রিসত্রেণীয় কার্য রয়েছে। (ক) সংসদে উপস্থাপনের জন্য চূড়ান্ত নীতি নির্ধারণ, (খ) সংসদে গৃহীত নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রের কার্যপালিক বিভাগের সমুদয় কার্য নিয়ন্ত্রণ এবং (গ) রাষ্ট্রের বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগের কাজকর্মের সমন্বয় সাধন ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রাধিকার নিরূপণ।

সংসদে উপস্থাপনের জন্য চূড়ান্ত নীতিনির্ধারণের অর্থই হল আইনপ্রণয়নের ব্যবস্থা করা। ছয়শতাধিক কমন্সসভার সদস্যদের দিয়ে জটিল ও বিপুলবিস্তার আইনসমূহের খসড়া রচনা করা সম্ভব নয় বলেই এই ব্যবস্থার প্রয়োজন। মন্ত্রিপরিষদও এ বিষয়ে প্রশাসন বিভাগের দক্ষ কর্মিগণের পরামর্শের ওপর নির্ভর করেন। মোটের ওপর কোন নীতি আইনে পরিণত হবে কিনা সেটা মন্ত্রিপরিষদই নির্ধারণ করেন। যে আইন মন্ত্রিপরিষদ উত্থাপন করে তা অন্ততঃ কমন্সসভায় পাশ হবেই; আর মন্ত্রিপরিষদ যে আইনের বিরোধিতা করে সে আইন বাতিল হতে বাধ্য। সুতরাং সর্বাত্মক একটি আইন প্রণয়নের কর্মসূচী মন্ত্রিপরিষদকে স্থির করতে হয়, যেভাবে সংসদে সেগুলি আলোচিত ও অনুমোদিত হবে। এমন কি কোন্ ভাষায় আইনের প্রস্তাবগুলি আনা হবে সে বিষয়েও মন্ত্রিপরিষদ লক্ষ্য রাখে। মন্ত্রিপরিষদকে তাই এক অর্থে একটি ক্ষুদ্র আইনসভা বলা যেতে পারে।

নীতিনির্ধারণ
Policy decision

মন্ত্রিপরিষদের আরও অনেক কর্তব্য আছে। পরিষদের সভ্যদের সংসদে উপস্থিত থাকতে হয়, অন্ততঃ যখন তাঁদের নিজ নিজ দপ্তরের কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা চলে। দপ্তরের কাজের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কমিটির অধিবেশনেও তাঁদের উপস্থিত থাকতে হয়। এর ওপর সরকারী নীতির সমর্থনে সংসদে আলোচনা ও বিতর্কের উত্তরের জন্যও তাঁদের প্রস্তুত থাকতে হয়। এর জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর (সাধারণতঃ সপ্তাহে দু'বার) মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক বসে। এই বৈঠক কতকগুলি পদ্ধতি (procedure) অনুসরণ করে পরিচালনা করা হয়। সাধারণতঃ মন্ত্রিপরিষদের অধিবেশনের বিবরণ গোপন রাখা হয়; তবে পঞ্জীয়ন, নথিভুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েট সেগুলি সব সময় সরকারের পুনঃসমীক্ষার জন্য প্রস্তুত রাখে। প্রতি বৈঠকের পূর্বে আলোচ্য বিষয়ের তালিকা এবং বৈঠক অন্তে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের সংক্ষিপ্তসার প্রত্যেক মন্ত্রীর কাছে প্রেরণ করা হয়। যে সমস্ত বিষয়ে একাধিক দপ্তর জড়িত সে সব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি একত্র পরামর্শ এবং আলাপ আলোচনার শেষে

একটি সর্বসম্মত নীতি স্থির করে মন্ত্রিপরিষদের সম্মুখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করে থাকে। কাজ চালানোর সুবিধের জন্য সংসদের মত মন্ত্রিপরিষদেও স্থায়ী বা অস্থায়ী কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপসমিতি (Sub-Committee) গঠন করা হয়। আইনপ্রণয়ন, আর্থিক নীতি স্থিরীকরণ, বৈদেশিক সম্পর্কগত সমস্তার সমাধান, আইনগত খুঁটিনাটি পরীক্ষা ইত্যাদি জটিল কাজ সহজে ও কমসময়ে করবার জন্য এই ধরনের ক্ষুদ্র সংস্থা বিশেষ উপযোগী।

মন্ত্রিপরিষদের দ্বিতীয় বৃহত্তম কাজ হল, সংসদে গৃহীত আইনগুলি কার্যকরী করা এবং এই কার্যকরী করার জন্য কোন ক্ষেত্রে যদি কোন স্পষ্ট আইনগত পদ্ধতি না থাকে, তখন মন্ত্রিপরিষদই আইনের সেই অসম্পূর্ণ অংশগুলিকে সম্পূর্ণ আকার দিয়ে থাকে। আধুনিক কার্যপালিকাবিভাগের এটি একটি অবশ্যম্ভাবী দায়িত্বে দাঁড়িয়ে গেছে। দিনের পর দিন আইনপ্রণয়ন এত জটিল এবং বিপুল আকার ধারণ করছে যে সংসদের পক্ষে সাধারণ সূত্রের আকারে সেগুলি অনুমোদন করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সেই সব আইন প্রয়োগ করবার সময় যে যে বিধান, নির্দেশ বা উপবিধি (rules, orders, bye-laws etc) প্রয়োজন সেগুলি মন্ত্রিপরিষদই প্রশাসন বিভাগের সহায়তায় স্থির করে দেয়। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সাধারণ মন্ত্রীর পক্ষে এইসব বিধিনির্দেশ প্রণয়ন করা সম্ভব কিনা? মন্ত্রিপরিষদে একজনের অবস্থানের অর্থ সবসময় তাঁর প্রশাসনিক খুঁটিনাটি সংক্রান্ত দক্ষতা নাও হতে পারে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা বা অভিজ্ঞতার বলে অনেকেই মন্ত্রিপদ অধিকার করেন। সুতরাং কুশলী প্রশাসনিক কর্মীদের সহায়তা ছাড়া এসব আইনকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া বা কার্যকরী করবার সম্ভাবনা নাই। এজন্য প্রায়ই অভিযোগ করা হয় যে মন্ত্রিদের আসলে কোন ক্ষমতা নাই। প্রশাসন কর্মচারীরা তাঁদের যেমন নির্দেশ দেন সেভাবে তাঁরা কাজ করেন। এর দ্বারা নাকি গণতন্ত্র আমলাতন্ত্রে পর্যবসিত হচ্ছে বলে মনে করা হয়। এ অভিযোগ অবশ্য যথেষ্ট অতিরঞ্জিত। প্রকৃতপক্ষে, মন্ত্রিগণ জনগণের স্বার্থের প্রতিভূ—প্রশাসনিক দক্ষতা নয়, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং সাধারণ নীতিনির্ধারণের ক্ষমতা থাকাই তাঁদের আসল যোগ্যতা। সুতরাং প্রশাসন বিভাগের ওপর নির্ভর করার ফলে তাঁদের মূল দায়িত্ব কোন অংশেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। তাছাড়া, পরামর্শ বা উপদেশের জন্য প্রশাসনবিভাগ ছাড়াও বিভিন্ন উপসমিতি, সরকারী-বেসরকারী উপদেষ্টা পরিষদও রয়েছে। সর্বোপরি

[Margin note: প্রশাসন পরিচালনা / Administrative functions]

উপরে সংসদ এবং জনমতের পথনির্দেশ মন্ত্রিপরিষদকে নিরন্তর সহায়তা করে থাকে।

সাধারণভাবে দপ্তর পরিচালনা ছাড়াও মন্ত্রিগণের প্রশাসনিক দায়িত্বের আরও একটি গুরুত্ব হল ব্যক্তিগতভাবে বা রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে মন্ত্রিগণ সংসদসভ্য ;ঃ ফলে জনসাধারণের কাছে প্রশাসন কর্মচারীদের অপেক্ষা অনেক বেশী সহজগম্য। প্রত্যেক মন্ত্রীই যেহেতু তাঁর আগামী নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যতের কথা ভেবে কাজ করেন, সেইহেতু প্রত্যেক মন্ত্রীকে সংসদের কাছে দায়ী থাকা এবং বিরোধীদলের প্রশ্ন ও সমালোচনার জবাব দেওয়ার অর্থই হল, সামগ্রিকভাবে দপ্তরগুলিকে দায়িত্বশীল করে তোলা। সুতরাং বিভিন্ন দপ্তরের প্রশাসনিক কর্মীরা এমন কিছু করেন না, যার জন্য তাঁদের কর্তৃস্থানীয় মন্ত্রীকে সংসদীয় বিতর্কের সময় অসুবিধায় পড়তে হয়। মন্ত্রিরাও এ বিষয়ে সজাগ থাকেন।

বর্তমান শাসনব্যবস্থার এত বিভিন্ন রকমের দায়িত্ব যে, কেবল একটি বিভাগের অধীনে সমস্ত কিছু পরিচালনা করা সম্ভব নয়। অথচ একাধিক বিভাগের কাজকর্মে অসামঞ্জস্য দেখা দিতে পারে বা আমলাতন্ত্রের প্রভাবে একবিভাগের দীর্ঘসূত্রতায় অন্য বিভাগের কাজকর্ম বানচাল হয়ে যেতে পারে। এককথায় সুষ্ঠু শাসন-পরিচালনার জন্য যে-ঐক্যবদ্ধ সুসমঞ্জস প্রচেষ্টা থাকা দরকার তার অভাব হতে পারে। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য মন্ত্রিপরিষদকে সংযোগসূত্র হিসাবে কাজ করতে হয়। একটি সাধারণ নীতির প্রতীক হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগীয় কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকে। মন্ত্রিপরিষদের পক্ষেও অবশ্য পরিপূর্ণ সমন্বয়-সাধন সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ, বিভিন্ন মন্ত্রী অসংখ্য কাজে ব্যস্ত থাকেন। তদুপরি কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে মন্ত্রিপরিষদকেও অতি বৃহৎ বলে মনে হয়। সেজন্য মন্ত্রিপরিষদকে ভেঙে কতকগুলি উপসমিতি গঠন করা হয়েছে যার ওপর এই সমস্ত কার্যভার অর্পিত।

আন্তর্বিভাগীয় সংহতি সাধন
Inter-departmental Co-ordination

মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতার কথা বলতে গেলে মনে রাখতে হবে যে এই সংস্থাটির যেমন কোন আইনগত ভিত্তি নেই অথচ শাসনযন্ত্রের এটি অপরিহার্য অঙ্গ, তেমনি বিধিবদ্ধ কোন ক্ষমতা পরিষদকে দেওয়া না হলেও প্রথা ও রীতির জোরে শাসনসংক্রান্ত প্রায় সব ক্ষমতাই মন্ত্রিপরিষদের হাতে এসে

রাজশক্তির নিয়ন্ত্রক
Regulator of Royal authority

পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ইংল্যাণ্ডে রাজার তত্ত্বগত যে সমস্ত ক্ষমতা রয়েছে সেগুলি মন্ত্রিসভাই কার্যত প্রয়োগ করেন। এমন কি রাজার যেগুলি বিশেষাধিকার সেগুলিও মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমেই রাজা ব্যবহার করে থাকেন। এইভাবেই রাজতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের প্রতিভূ দায়িত্বশীল মন্ত্রিপরিষদের সহাবস্থানেব ফলে ইংল্যাণ্ডে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে।

ব্রিটিশ মন্ত্রিপরিষদের মূলসূত্র ও বৈশিষ্ট্য (Basic principles and features of the British Cabinet system):

ব্রিটিশ মন্ত্রিপরিষদকে আইনপ্রণয়ন ও শাসনব্যবস্থা উভয়ের উপরই চরমকর্তৃত্বের সম্মেলন হয়েছে এমন একটি দায়িত্বশীল যৌথগোষ্ঠীরূপে বর্ণনা করা চলে। নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতিব (Checks & balances) পরিবর্তে সহযোগিতা ও সংহতির আদর্শই এর মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদেব বৈশিষ্ট্যগুলি অধ্যাপক হাবমান ফাইনাব[২] চারটি মূলসূত্রে সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। সূত্রগুলি হল :

(১) মন্ত্রিপরিষদের সভ্যগণ সংসদেরও সভ্য হবেন ; (২) তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলেব প্রতিনিধি হবেন ; (৩) কমন্সসভার যতদিন আস্থা থাকবে ততদিন মন্ত্রিপরিষদ স্থায়ী হবে ; এবং (৪) কমন্সসভার কাছে মন্ত্রিপরিষদ দায়ী থাকবে।

(১) প্রথম সূত্রটির তাৎপর্য হল, মন্ত্রিপরিষদের সভ্যবৃন্দ পূর্বাহ্নেই সংসদের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন অথবা মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পরে কমন্সসভায় নির্বাচনের ব্যবস্থা করে নেবেন অথবা লর্ডস সভায় আসন লাভ করবেন। ১৯১৯ সালের মন্ত্রিগণের পুনর্নির্বাচন আইন ও ১৯২৬ সালে তার সংশোধনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশ আছে। এই নীতিটির মূল উদ্দেশ্য হল এমন একটি সরকার সৃষ্টি করা যা আইনবিভাগ ও কার্যপালিকাবিভাগের সহযোগিতায় অসামান্য দক্ষতা লাভ করবে। সংসদের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ সহযোগের ফলে মন্ত্রিপরিষদ সমস্ত কাজকর্মেই সংসদের কথা স্মরণ রাখে, যে সংসদ সমস্ত জনগণের সংঘবদ্ধ প্রতিফলন। আধুনিক শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনে কার্যপালিকাবিভাগের ক্রমবর্ধমান নেতৃত্ব অপরিহার্য হলেও, সংসদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে তার কুফলগুলি হ্রাস পায়। এই ব্যবস্থার

সংসদ সদস্যপদ
Membership of the Parliament

---

[২] Herman Finer : "Theory and Practice of Modern Government," Pp. 576-99.

[illegible] নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশগ্রহণে অনিচ্ছুক অথচ প্রতিভাসম্পন্ন বহু ব্যক্তিগণকে মন্ত্রিপরিষদে আনা চলে না।

(২) দ্বিতীয় নীতিটির অনুসরণে প্রত্যেক মন্ত্রীই সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠদলের প্রতিনিধি। এর ফলে মন্ত্রিনির্বাচনে রাজার ইচ্ছামত নিয়োগের ক্ষমতা নাই; জনসাধারণের ইচ্ছাই মন্ত্রিপরিষদ গঠনের পূর্ব ইঙ্গিত দিয়ে রাখে। সংখ্যাগরিষ্ঠদলের [illegible] প্রধানমন্ত্রীপদে নিযুক্ত করে তাঁর পরামর্শ অনুসারেই রাজা অন্যান্য [illegible] নিযুক্ত করেন। গণতন্ত্রে এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতিটির বিরাট তাৎপর্য। [illegible] যদি 'আলোচনার দ্বারা শাসন' হয়, তাহলে স্বভাবতই এখানে মতপার্থক্য দেখা দেবে। কিন্তু সুষ্ঠু শাসনের জন্য এই মতপার্থক্যকে হ্রাস করে একটি সাধারণ পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে, যেটা একমাত্র কোন একটি দলের প্রতি আনুগত্যের দ্বারাই সম্ভব। যে দলের ওপর মন্ত্রিসভা নির্ভর করে আছে সেটি যদি একটি একক সংস্থা না হয় তাহলে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলার আশংকা দেখা দেয়। যদিও সম্মিলিত মন্ত্রি পরিষদও (Coalition ministry) দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে, তবু একমাত্র আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসাবেই তার প্রয়োজন। এছাড়া সংসদ ছাড়াও একটি বিশেষ দলের সঙ্গে যুক্ত থাকায় সাধারণভাবে নির্বাচক মণ্ডলীর সঙ্গেও একটা পরোক্ষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সর্বোপরি, সংখ্যাগরিষ্ঠদলের সঙ্গে যুক্ত থাকায় সরকার সবসময়ই আইনপ্রণয়নের ব্যাপারে সংসদের সমর্থন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি :
The majority principle

(৩) সাধারণ শাসনকর্তৃত্ব ও বিশেষ বিশেষ নীতির ক্ষেত্রে যতদিন সংসদের সমর্থন থাকে ততদিনই মন্ত্রিপরিষদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারে। কখনও যদি প্রতিকূল সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা কোন একটিতে মন্ত্রিপরিষদের পরাজয় ঘটে, তাহলে মন্ত্রিপরিষদ পদত্যাগ করতে বাধ্য থাকে। ১৮৩৪ সালে রবার্ট পীলের মন্ত্রিপরিষদের পরাজয় এইরকম একাধিক ঘটনার একটি উদাহরণ। সংসদের প্রতি এই দায়িত্ব আইনবলে অথবা শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রভাবে রক্ষিত হয়। আইনের দিক থেকে, সরকার যদি পদত্যাগ না করে তাহলে বাজেট অনুমোদন বা বাৎসরিক সামরিক আইনের পুনরনুমোদন করতে অস্বীকার করে সংসদ মন্ত্রিপরিষদকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে। এই আইনের ব্যবস্থা অবশ্য চরমক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়। সাধারণভাবে, দৈনন্দিন কার্যক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলি এত

সংসদের প্রতি দায়িত্ব
Responsibility to the Parliament

সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে [illegible]
হয়। 'কোন সরকারী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোটদান, কোন বিশেষ দপ্তরের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক সমালোচনা, নিন্দাসূচক বা অসমর্থনজ্ঞাপক প্রস্তাব পাশ ইত্যাদি এইসব প্রথাসিদ্ধ নিয়ন্ত্রণের পর্যায়ে পড়ে।

তবে বিগত কয়েক দশকের কতকগুলি নূতন পরিবর্তনের ফলে সংসদের এই নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা সম্পর্কে অনেকে সন্দিহান। প্রথমতঃ, একটি ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী ও বিরোধী দুটি দলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ব্রিটিশ মন্ত্রিপরিষদ চলছে। নির্বাচকমণ্ডলী একবার সরকারী ক্ষমতা কোন দলের ওপর অর্পণ করলে, সেই দল সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে নিজের নীতি ও কার্যক্রম অবাধে চালিয়ে যেতে পারে। আবার প্রতিকূল অবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ সংসদ ভেঙে দেওয়ার ভীতিপ্রদর্শনও করতে পারে। ১৯১৮ সালে এইরকম-ভাবে সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। তদুপরি আইনপ্রণয়নের ক্রমবর্ধমান জটিলতা শাসনক্ষেত্রে কার্যপালিকা বিভাগের নেতৃত্বকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলছে। সুতরাং নিয়ন্ত্রণ বলে যদি কিছু থাকে সেটা এখন উভয়তঃই প্রযোজ্য। সংসদ মন্ত্রিপরিষদকে এবং মন্ত্রিপরিষদ সংসদকে সমানভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

যৌথ দায়িত্বের নীতি :
Principle of collective Responsibility

(৪) এরপর মন্ত্রিপরিষদের ঐক্যের কথা আসে যৌথ দায়িত্বের নীতিতে যার প্রকাশ। লর্ড মর্লে বলেছিলেন, "মন্ত্রিপরিষদের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যই হল ঐক্যবদ্ধ এবং অবিভাজ্য দায়িত্ব"।[4] আইনতঃ রাজাকে মন্ত্রিগণ যে পরামর্শ দেন তার জন্য মন্ত্রিগণই দায়ী, কারণ 'রাজা কোন অন্যায় করতে পারেন না।' এর চেয়ে গুরুতর প্রশ্ন হল মন্ত্রিদের রাজনৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে। মন্ত্রিগণ ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ দপ্তরের জন্য এবং যৌথ ভাবে সমগ্র শাসনব্যবস্থার জন্য দায়ী থাকেন। কোন একজন মাত্র মন্ত্রীর সংসদে পরাজয়ের ফলে সমগ্র মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করতে পারে। এর অর্থই হল যে সরকারের একটা সাধারণ দায়িত্ব আছে যা মন্ত্রিগণ সবাই মিলে একসঙ্গে পালন করেন। অবশ্য মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্বের অর্থ এই নয় যে সমস্ত সিদ্ধান্তই সকলে একযোগে গ্রহণ করেন। তবে কোন মন্ত্রী একবার কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে হয় সামগ্রিক ভাবে মন্ত্রিসভা তাঁকে সমর্থন করবে, নয়তো

[4] "The first mark of the Cabinet is united and indivisible responsibility. Lord morey.

[illegible] পদত্যাগ করতে হবে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে কোন মন্ত্রী অন্য সকলের সঙ্গে একমত হতে নাও পারেন। কিন্তু যেই মুহূর্তে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হল, তখন থেকে প্রকাশ্যে তিনি তার বিরোধিতা করতে পারবেন না। যে মন্ত্রী কোন নীতি সম্পর্কে তবুও সন্দেহ পোষণ করবেন তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। লর্ড সল্সবেরী এ বিষয়ে একটি প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করেছিলেন, "মন্ত্রিপরিষদে যা কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, পদত্যাগ না করলে তার জন্যে প্রত্যেক মন্ত্রীর নির্বিশেষ এবং অপূরণীয় দায়িত্ব রয়েছে বলেই, পরে একথা বলা চলে না যে একটি ক্ষেত্রে তিনি সামঞ্জস্য করে নিতে রাজী হলেও অন্যান্য বিষয়ে মন্ত্রীরা তাঁকে রাজী হতে উপরোধ করেছে।"[5] সংক্ষেপে, মতৈক্যই হল মন্ত্রিপরিষদ-শাসনের মূল কথা। মন্ত্রিপরিষদ একটি যৌথসংস্থা, যার সভ্যদের উত্থান-পতন একসূত্রে বাঁধা।

উপরোক্ত সাংগঠানিক তাৎপর্য ছাড়াও ব্রিটেনের মন্ত্রিপরিষদের আরও দু'একটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। যেমন, মন্ত্রিপরিষদে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব অবিসংবাদিত ভাবে স্বীকৃত। যদিও পরিষদের সব মন্ত্রী আইনতঃ সমান মর্যাদাসম্পন্ন, তবু প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্য স্বাভাবিকভাবেই সকলে মেনে নেয়। এর কতকগুলি কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ, বিরোধীদলের সামনাসামনি সরকার তরফে মন্ত্রিপরিষদে যে ঐক্যবদ্ধ রক্ষণ প্রচেষ্টা ও সংহতি থাকা দরকার প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্বে তা প্রকাশ্য রূপ গ্রহণ করে। দ্বিতীয়তঃ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রীই সংসদে এবং সংসদের বাইরে জনগণের গরিষ্ঠ সমর্থন-ধন্য রাজনৈতিক দলের নেতা; কাজেই তাঁকে মান্য করা ব্যক্তিগত রাজনৈতিক স্বার্থেই মন্ত্রিদের করতে হয়। কারণ, কোন ব্যক্তিকে মন্ত্রিসভায় রাখা বা না-রাখার ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর আছে। তৃতীয়তঃ, মন্ত্রিসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব, দপ্তরবণ্টন, দপ্তরগুলির ওপর সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির ফলেও প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব
Preeminence of the Premier

মন্ত্রিপরিষদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল গোপনীয়তা রক্ষা। কোন বিশেষ

---

5 "For all that passes in the Cabinet each member of it who does not resign is absolutely and irretrievably responsible and has no right afterwards to say that he agreed in one case to a compromise while in another he was pursuaded by his colleagues"—Lord Salisbury. সম্মিলিত জাতীয় সরকার (National coalition govt.)-এর ক্ষেত্রে অবশ্য এতটা বাধ্যবাধকতা নাই।

বিষয় সদস্যগণের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও প্রকাশ্যে বা জনগণের চোখে যাতে সেটা ধরা না পড়ে, সেইভাবে আপাতঃঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করতে গেলে প্রত্যেক সদস্যকেই গোপনীয়তা রক্ষা করতে হয়। এছাড়া রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, কূটনৈতিক প্রয়োজন তো আছেই। ১৯২০ সালে এই মর্মে Official Secrets Act পাশ হয়েছে। ১৯২২ সালে গোপন তথ্য ফাঁস করে দেওয়ার অভিযোগে সেক্রেটারী অব স্টেটকে পদত্যাগ করতে হয়।

গোপনীয়তা
Secrecy

সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠদলেরই অন্তর্ভুক্ত একদল লোকের দ্বারা দেশশাসন চলে বলে অনেকে মনে করেন মন্ত্রিপরিষদ সংসদেরই একটি সমিতি (committee) মাত্র। আক্ষরিক অর্থে একে অবশ্য কোনক্রমেই সমিতি আখ্যা দেওয়া যায় না; কারণ, সংসদ এই সংস্থাকে নিযুক্ত করে না। আর, সাধারণ সমিতিগুলিকে সংসদ থেকে আইনের প্রস্তাব পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়; পক্ষান্তরে, মন্ত্রিপরিষদ থেকেই সব আইনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। সর্বোপরি, অবলোপ (Dissolution)-এর দ্বারা মন্ত্রিপরিষদ নিজেই নিজের স্রষ্টাকে ধ্বংস করতে পারে। তবে লোয়েল (Lowell) যে অর্থে মন্ত্রিপরিষদকে 'চক্রের মধ্যে চক্র' ('wheel within wheels') বলেছেন সেই অর্থে একে সমিতি বলা যায়। সবার বাইরে, মূল রাজনৈতিক দল, তার মধ্যে সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, তার মধ্যে মন্ত্রিসভা এবং তারও মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ এইভাবে চক্রের মধ্যে চক্রের অবস্থিতি।

মন্ত্রিপরিষদ কি সংসদেরই একটি সমিতি ?
Cabinet, a committee of the Parliament ?

দেশের শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদের অস্তিত্ব সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। নানাভাবে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কেউ বলেছেন 'রাজনৈতিক সৌধের ভিত্তিপ্রস্তর', কেউ বলেছেন 'সমস্ত শাসনযন্ত্র ঘুরছে এই কবজার ওপর', ইত্যাদি।[6] মন্ত্রিপরিষদকে বেজহট আবার ব্যবস্থাপক ও কার্যপালিকা বিভাগের সংযোগসূত্র রূপে বর্ণনা করেছেন।[7] প্রকৃতপক্ষে রাজা বা রানী, কমন্সসভা ও লর্ডসভাকে মন্ত্রিপরিষদই একসূত্রে আবদ্ধ করেছে। এই

মন্ত্রিপরিষদের গুরুত্বপূর্ণ অস্তিত্ব
Pivotal position of the Cabinet

---

6 "Key-stone of the political arch" (Lowell)
"the pivot around which the whole political machinery revolves". (Marriott)

7 The hyphen that joins, the buckle that binds the Executive and the Legislative departments together"—Bagehot: "The English Constitution."

পরিষদের কার্যকরী ক্ষমতা এবং স্থিতিস্থাপকতা নিঃসন্দেহে আধুনিক শাসন-ব্যবস্থার একটি প্রশংসনীয় ফলশ্রুতি।

প্রধানমন্ত্রী (The Prime Minister) :

অশেষ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্রিটেনের রাষ্ট্রনায়ক প্রধানমন্ত্রীর পদটি কোন আইনগত স্বীকৃতির অপেক্ষা না রেখেই পূর্ণমর্যাদায় গড়ে উঠেছে। একমাত্র ১৯৩৭ সালের রাজমন্ত্রী আইন ছাড়া (Ministers of the Crown Act, 1937) আর কোন বিধিবদ্ধ আইনে এই পদটির উল্লেখ নাই। তবু প্রধানমন্ত্রীই দেশের প্রকৃত শাসক এবং মন্ত্রিপরিষদের প্রাণকেন্দ্র। যদিও মন্ত্রিপরিষদের সকল সভ্যেরই আইনতঃ সমান মর্যাদা, তবু প্রধানমন্ত্রীকে সমশ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য (*primus inter pares*) বলা হয়। স্যার হারকোর্টের বর্ণনায় প্রধানমন্ত্রী 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কের মধ্যে পূর্ণ চন্দ্র সদৃশ' (*inter stella luna minores*) প্রয়োজনের তাগিদেই অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর এই নেতৃত্ব। সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি, মন্ত্রিপরিষদে ব্যক্তিগত মতবিরোধের অবসান, আন্তর্বিভাগীয় বিরোধ নিরসন, এবং সুসংবদ্ধ কর্মধারার জন্য এরূপ একটি ঐক্যের প্রতীক একান্ত আবশ্যক। প্রধানমন্ত্রীর এই প্রাধান্য বিশেষভাবে চারটি ক্ষেত্রে লক্ষিত হয়: (১) মন্ত্রিপরিষদের সভাপতিত্ব, (২) সংসদের ওপর নেতৃত্ব, (৩) রাজা বা রানীর সহিত একমাত্র সংযোগের পন্থা, (৪) ক্ষমতাসীন রাজনৈতিকদলের নেতৃত্ব।

(১) গোষ্ঠীমাত্রেরই একজন পরিচালক থাকা দরকার। সরকারের কর্মদক্ষ বিভাগ মন্ত্রিপরিষদের নেতৃত্ব তাই প্রধানমন্ত্রীর ওপর অর্পিত। এই নেতৃত্ব নানা কারণে গড়ে উঠেছে। প্রথমতঃ, ইংল্যাণ্ডে রাজনীতিক্ষেত্রে একটি বিশেষ মানসিকতা হল যে কোন সভা-সমিতির সভাপতিপদের প্রতি সকলেই সম্ভ্রম প্রদর্শন করে। প্রধানমন্ত্রীও মন্ত্রিপরিষদে এই সম্ভ্রমের অধিকারী। দ্বিতীয়তঃ, রাজার সম্মতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সহ-যোগীদের নিয়োগ করেন এবং তাঁর পছন্দ-অপছন্দের ওপর প্রত্যেক মন্ত্রীর কার্যকাল নির্ভর করে। প্রধানমন্ত্রী তাই এ বিষয়ে যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতার অধিকারী। তবে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব যাতে মন্ত্রিপরিষদে হয় সেদিকেও তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হয়। তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন বিভাগের ওপর তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন এবং তাদের প্রশাসন কার্যের সংহতি ও সামঞ্জস্য সাধন

মন্ত্রিপরিষদের সভাপতিত্ব
Chairmanship of the Cabinet

রাজতন্ত্রের সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব হল, বিমূর্ত রাষ্ট্রের ব্যক্তিগত প্রতীক হিসাবে রাজা শাসনব্যবস্থার শীর্ষাভরণ এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতির কেন্দ্রবিন্দু।

শাসনব্যবস্থার শীর্ষাভরণ ও ঐক্যের প্রতীক : Ornamental head of the government and symbol of unity

দলাদলি ও রেষারেষির ফলে শাসন-শৃঙ্খলা ব্যাহত হবার উপক্রম হলে বা কোন সংকট থেকে সমগ্র জাতিকে উদ্ধার করতে হলে রাজা নিজের ব্যক্তিত্ব প্রয়োগ করে এই ঐক্য রক্ষা করেন। এই ক্ষেত্রে রাজার আজীবন কার্যকাল তাঁকে প্রতিটি সমস্যাকে স্বার্থ-নিরপেক্ষ ও বস্তু-নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করতে সাহায্য করে। আচার, সংবিধান, শাসনতন্ত্র, সরকার প্রভৃতি ভাববাচক শব্দে জনসাধারণের রাষ্ট্রানুগত্য খুব সামান্যই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। কিন্তু রাজার অস্তিত্ব শাসনব্যবস্থায় এক ধরনের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণীয়তা এনে দেয় করে যার ফলে সহজেই জনতার মধ্যে আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার সঞ্চার হয়। সরকার যা কিছু ভাল কাজ করেন জনগণ সে সবই রাজার হিতৈষণা বলে মেনে নেয়; আর সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়িত্ব বহন করতে হয় অস্থায়ী বা পরিবর্তনশীল মন্ত্রিসভাকে।

সরকারের কার্যকলাপ সমালোচনা করার জন্য সংসদে যে বিরোধীদল রয়েছে তারও মর্যাদা ও অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকার কারণই হল এই বিরোধীদল রাজাদিষ্ট। ক্ষণস্থায়ী শাসনক্ষমতাসীন সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ঔদ্ধত্যের

রাজাদিষ্ট বিরোধী দল : His Majesty's Opposition

বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিরোধীদল দেশের স্থায়ী ও সাধারণ স্বার্থকে বজায় রাখার চেষ্টা করে। যে রক্ষণশীলতা ব্রিটিশ জনমানসের একটি আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য, তারও প্রতীক এই রাজশক্তি। অতীতের যা কিছু ভাল বলে গৃহীত তার সংরক্ষণ এবং অবিবেচনাপ্রসূত ত্বরিৎ পরিবর্তনের নিবারণ রাজার মাধ্যমেই সম্ভব। ভাবান্তরে, জনগণের ঐতিহ্যপ্রিয়তা রাজতন্ত্রের অবসান ঘটতে দেয়নি।

রাজা শুধু গ্রেটব্রিটেনরই ঐক্যের প্রতীক নন, ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব

ব্রিটিশ কমনওয়েলথের বন্ধনসূত্র : Tie of Unity in the Commonwealth

নেশন্‌-এরও তিনি সাধারণ বন্ধনসূত্র। ১৯৪৯ সালে লণ্ডনে আহূত কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে এই ঐক্যবন্ধন বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়। বহুদূরে অবস্থিত ডমিনিয়ন, উপনিবেশ এবং সাম্প্রতিককালে স্বাধীনতা-প্রাপ্ত দেশগুলির মধ্যে অজস্র রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভেদ সত্ত্বেও রাজাকে কমনওয়েলথের শীর্ষস্থানীয় বলে সকলে একবাক্যে স্বীকার করেছেন।

ব্রিটেনে রাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ও তার স্থায়িত্বের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার। প্রথমতঃ, রাজার অস্তিত্বের ফলে ক্রমবর্ধমান গণতান্ত্রিক শাসনের পথে কোন বাধা জন্মায়নি। যদি জনগণের দ্বারা বা জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা সরকার পরিচালনার ব্যাপারে রাজা বাধা দিতেন তাহলে গত এক শতাব্দীর অধিককালব্যাপী এই প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখা একমাত্র পরম্পরানুগত শক্তির (traditional forces) দ্বারা সম্ভব হত না।

রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সহাবস্থান : Co-existence of Monarchy and Democracy

দ্বিতীয়তঃ, যে মন্ত্রিপরিষদ ব্যবস্থার উপর সমস্ত ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা নির্ভর করে আছে, কোন আনুষ্ঠানিক বা নামসর্বস্ব অধিনেতা (titular head) ছাড়া তার কার্যকলাপ সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা সম্ভব হত না। সমস্ত দলাদলির ঊর্ধ্বে, নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ কোন ব্যক্তি ছাড়া শাসনতান্ত্রিক বিরোধসমূহের সহজ সামঞ্জস্য বিধানের অন্য কোন উপায় নাই, অন্যান্য গণতন্ত্রী দেশেও রাষ্ট্রপতি বা অন্য কোন শীর্ষস্থানীয় নেতার ওপর এই দায়িত্ব অর্পিত। ব্রিটেনে রাজতন্ত্রকে বাদ দিলে এই ধরনের কোন পদ সৃষ্টি করাতে অনেক অসুবিধা। কেননা মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে ঐ ধরনের রাষ্ট্রনায়কের সম্পর্কটি রাজা ও মন্ত্রিসভার সম্পর্কের মত সহজ ও বিবর্তনভিত্তিক হত না। তাছাড়া দেশে-বিদেশে ঐক্য ও সংহতির প্রতীক হিসাবে রাজার যে ভূমিকা, অন্য কোনভাবে তার রূপায়ণ সম্ভব বলে মনে হয় না।

ইংল্যাণ্ডে রাজা মন্ত্রিসভার পরিপূরক : The king supplements the Cabinet in England

পরিশেষে, অশেষ মর্যাদাসম্পন্ন রাজশক্তি ব্রিটিশ সমাজে সাড়ম্বর নেতৃত্বের স্থান অধিকার করে আছে, আদব-কায়দা, রুচি, সমাজিকপ্রথা ইত্যাদি ব্যাপারে রাজপরিবার সারা-দেশকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করে। আবার সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠানে ও জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানে পৌরোহিত্যের ভার নিয়ে রাজা একদিকে জনসাধারণকে উৎসাহিত করেন; আবার অপরদিকে প্রধান-মন্ত্রিকে এই সমস্ত সময়সাপেক্ষ দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন। *

রাজার সামাজিক নেতৃত্ব : Social leadership of the Monarch

মন্ত্রিসভা ও মন্ত্রিপরিষদ

(The Ministry and the Cabinet)

আইন ও বাস্তবতার মধ্যে যে আপাতবিরোধ সারা ব্রিটিশ সংবিধানের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে ব্রিটেনের মন্ত্রিপরিষদ তার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। সরকারের সমস্ত কর্তৃত্ব মন্ত্রিপরিষদেই বিধৃত; কমন্সসভার নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রিপরিষদই করে থাকেন; প্রশাসনব্যবস্থাও মন্ত্রিপরিষদের নির্দেশেই পরিচালিত হয়। অথচ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দু'একটি ইংগিত ছাড়া লিখিত বা বিধিবদ্ধ সাংবিধানিক আইনের মধ্যে কোথাও এর উল্লেখ পাওয়া যাবে না। দীর্ঘদিনের বিবর্তনের ফলে এর জন্ম এবং আইনগত ভিত্তি না থাকা সত্ত্বেও এই মন্ত্রিপরিষদই ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র।

রাজকীয় ক্ষমতা হস্তান্তর ও মন্ত্রিপরিষদের উদ্ভব (Transfer of Royal powers and growth of the Cabinet):

গৌরবময় বিপ্লবের পর থেকে ইংল্যাণ্ডের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে দুটি লক্ষণীয় পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। এক, সংসদের ক্রমান্বয়ে ক্ষমতাবৃদ্ধি; দুই, পরামর্শ পরিষদ বা মন্ত্রিসভার ওপর রাজার ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা। আগে রাজাই সর্বেসর্বা ছিলেন। এখন এই দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শাসনকর্তৃত্ব বণ্টন হয়ে যাওয়াতে স্বাভাবিকভাবেই একটি নূতন ভারসাম্য সৃষ্টির প্রয়োজনে মন্ত্রিসভা ও সংসদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের বনিয়াদ গড়ে উঠল। প্রকৃতপক্ষে এই বনিয়াদের ওপরেই আজকের ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে।

সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে যে দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে যে 'ক্যাবাল' (Cabal) ছিল, তার থেকেই বর্তমান মন্ত্রিপরিষদের উদ্ভব। প্রিভিকৌন্সিলের মধ্য থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি নিয়ে এই ক্যাবাল গঠিত হয়েছিল। রাজা মৌখিকভাবে এইসব ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করবেন। নর্মান আমলের মহা-পরিষদ (Great council) থেকে যেমন প্রিভিকৌন্সিলের জন্ম, ক্যাবালও তেমনি প্রিভিকৌন্সিল থেকেই গড়ে উঠেছে। এইরকম ক্ষুদ্রতর পরামর্শ-পরিষদের দৃষ্টান্ত অবশ্য আগেও পাওয়া যায়, তবে ১৬৬০ সালের পর থেকেই এর মধ্যে মন্ত্রিপরিষদের সম্ভাবনা দেখা দেয়। পুনরুদ্ধার (Restoration) এবং গৌরবময় বিপ্লবের (Glorious revolution) পরিপ্রেক্ষিতে এর ক্রমপ্রসার।

দ্বিতীয় চার্লস-এর 'ক্যাবাল'
'Cabal' of Charles II

[illegible] চার্লসের ক্যাবালের মধ্যে সংসদের সভ্যও দু'একজন থাকতেন, তবে তাঁরা কোন্ দলীয় মতাবলম্বী রাজা সে সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন না। এ [illegible] গুরুত্বপূর্ণ রাজকীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় রাজা যে তাঁর খাসকামরায় ([illegible]) তাঁদের আলাদা ডেকে নিয়ে পরামর্শ করতেন এটা সাধারণে জানত [illegible]। তাই Cabinet কথাটি প্রথমযুগে কিছুটা নিন্দা[illegible] ছিল। [illegible] অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি যার ফলশ্রুতি সংসদের সার্বভৌমত্ব তাকে একটি কার্যকরী রূপ দেওয়ার প্রয়োজনে মন্ত্রিপরিষদের ভূমিকা অপরিহার্য হয়ে পড়ল।

তৃতীয় উইলিয়মের সময় গঠনগত দিক থেকে মন্ত্রিপরিষদের কিছু পরিমার্জনার চেষ্টা করা হয়। যদিও মন্ত্রিনির্বাচনের ব্যাপারে উইলিয়মের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল, তবু, হুইগ এবং টোরী উভয় দল থেকেই তিনি তাঁর মন্ত্রী মনোনয়ন করতেন। পরে দেখা গেল এতে অনেক অসুবিধা আছে এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। ফলে ১৬৯৩-৯৬ সালে একমাত্র হুইগ দল থেকেই তিনি মন্ত্রী মনোনয়ন করতে লাগলেন। ক্রমশ এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত রীতিতে পরিণতি লাভ করে। ফলে সভায় যে-দলের প্রাধান্য সেই দলই মন্ত্রিত্বের অধিকারী হয়। প্রথম প্রথম অবশ্য সংসদের তরফ থেকে এতে বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছিল। উত্তরাধিকারের আইনের একটি ধারা অনুযায়ী সরকারী কাজে বা লাভজনক কাজকর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির সংসদ-সদস্যপদ লাভ করার কোন অধিকার ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে রানী অ্যানের সময় এসব বিধি লোপ পেয়ে যায়। ক্রমেই এই প্রথা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে যে যখনই কোন নূতন উচ্চতর রাজনৈতিক পদ সৃষ্টি করা হবে তখনই আইনতঃ ঐ পদাধিকারীর সংসদের সভ্য হওয়ার অধিকার জন্মেছে বলে মনে করা হবে। বিশেষত মন্ত্রিগণকে সাধারণ রাজকর্মচারী বলে গণ্য করার ভিত্তি না থাকায়, এই প্রথাবলে তাঁরা সংসদ-সদস্য হওয়ার অধিকারী হলেন।

তৃতীয় উইলিয়মের সময়ে পরিবর্তন
Changes during the reign of William III

এর পর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জর্জের আমলে মন্ত্রিপরিষদ ক্রমশঃই স্বাভাবিক রূপ নিতে থাকে এবং উত্তরোত্তর ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। জার্মানীর হ্যানোভার দেশ থেকে আগত জর্জ রাজারা ইংরাজী ভাষা জানতেন না বলে এবং শাসনকার্যে তাঁদের ঔদাসীন্যের ফলে রাজকর্মের অনেক দায়িত্ব

বাধ্য হয়ে মন্ত্রিদের হাতে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। এই সময় ক্ষমতালোভী হুইগ দল এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে উদ্যোগী হল।

জর্জদের রাজত্বকাল
Reign of the Georges

যে কোন ভাবে কমন্সসভাকে বশে রাখা ছাড়াও, মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে দলনেতা ওয়ালপোল সভাপতিত্ব করতে শুরু করলেন। এইভাবে প্রধানমন্ত্রি পদের সূচনা হয়। তৃতীয় জর্জের ব্যক্তিগত শাসনের সময়েও রাজা মন্ত্রিপরিষদের অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকতে লাগলেন। বলতে গেলে এই ক'বছরের হুইগশাসনের সময়ই আধুনিক মন্ত্রি-পরিষদশাসিত শাসনব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি দানা বেঁধে ওঠে। সমস্ত মন্ত্রীই একটি দলের প্রতি অনুগত ছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর অধীনে তাঁরা কাজ করতেন; এমন কি সংসদের প্রতি দায়িত্বের নীতিও তাঁরা মেনে নেন। ১৭৪২ সালে হাউস অব কমন্স্-এ পরাজয়ের পর ওয়ালপোল পদত্যাগ করেন। তৃতীয় জর্জের সময় অবশ্য রাজ-উদ্যোগে এই সমস্ত প্রথা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল; রাজা নিজের খুশীমত লর্ড নর্থকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসিয়ে নিজে শাসনকার্যের সবদিকে দৃষ্টি দিতে শুরু করলেন। কিন্তু আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে ব্রিটেনের পরাজয়ের ফলে ঘটনার গতি পরিবর্তিত হল। এই সময় ছোট পিট প্রধান-

সংকটকাল ও মন্ত্রিসভা
The Cabinet and emergency

মন্ত্রী হলেন, তিনি রাজা ও জনসাধারণ উভয়েরই আস্থাভাজন ছিলেন। ক্রমে উনবিংশ শতাব্দীতে মোটামুটিভাবে মন্ত্রিপরিষদের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠল। স্বাভাবিক অবস্থায় দৈনন্দিন শাসনপদ্ধতি এভাবে স্থির হয়ে গেলেও, সংকটকালে মন্ত্রিসভার দায়িত্ব যে শতগুণ বৃদ্ধি পায় বিংশ শতকের দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক সংকটে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। এই সময় দলীয় বিরোধিতা তুচ্ছ হয়ে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য সর্বদলীয় সম্মিলিত মন্ত্রিপরিষদ (Coalition Cabinet) গঠন করার প্রয়োজন স্বীকৃত হল। লয়েড জর্জ, র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ও চার্চিলের সরকার এর উদাহরণ।

মন্ত্রিপরিষদের গঠনগত বৈশিষ্ট্য (Structural Characteristics of the Cabinet):

ঐতিহাসিক দিক থেকে দীর্ঘদিন ধরে বিবর্তিত হলেও মন্ত্রিপরিষদের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে তত্ত্বগত অনুসন্ধান অতি সাম্প্রতিক। ব্ল্যাকস্টোনের 'কমেন্টারী', বা আমেরিকার সংবিধান বা ১৭৯১ সালে ক্যানাডার শাসনসংক্রান্ত আইনেও এর কোন উল্লেখ দেখা যায় না। দ্য-লোমকৃত (De Lolme) ব্রিটিশ সংবিধানের

[illegible] লক্ষণীয়। [illegible]
[illegible] বেজহটের (Bagehot) প্রামাণ্য গ্রন্থে এর বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদের সংগঠন-স্বরূপ অনুধাবন করতে হলে প্রথমেই স্মরণ রাখা দরকার যে ব্রিটেনে মন্ত্রিসভা ও মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য রয়েছে। সংসদে যে সমস্ত সভ্য সরকারী দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং মন্ত্রিপরিষদের মতই যাঁদের কার্যকাল তাঁরা সবাই মিলে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। পক্ষান্তরে মন্ত্রিপরিষদ আরও ছোট একটি সংস্থা। মন্ত্রিসভার মধ্যে এটি একটি আভ্যন্তরীণ চক্রবিশেষ। সুতরাং মন্ত্রী-মাত্রেই মন্ত্রিপরিষদের সভ্য নন। একত্রে মন্ত্রিসভার অধিবেশন হয়না বললেই চলে; কিন্তু প্রায়ই মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক বসে। দপ্তর পরিচালনা ছাড়াও পরিষদভুক্ত মন্ত্রিরা সরকারী নীতিনির্ধারণ করেন; সাধারণ মন্ত্রিরা শুধু নিজ নিজ দপ্তর নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। ১৯৩৭ সালের 'মিনিষ্টার্স অব দি ক্রাউন এ্যাক্টে' এই প্রভেদটি সুস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী (যাঁর বেতন ১০,০০০ পাউণ্ড) ছাড়া ১৭ জন অন্য মন্ত্রিদের (যাঁদের বেতন ৫০০০ পাউণ্ড) নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। প্রধান মন্ত্রীই স্থির করেন কোন্ কোন্ মন্ত্রী পরিষদভুক্ত হবেন।

মন্ত্রিসভার সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদের পার্থক্য :
Defference between the Cabinet and the Ministry

এছাড়া স্যার সিডনী লো-র আলোচনায় একটি 'আভ্যন্তরীণ মন্ত্রিগোষ্ঠী'র কথাও বলা হয়েছে। এই মন্ত্রিগোষ্ঠীকে মন্ত্রিপরিষদও বলা যায়না, মন্ত্রিসভাও বলা যায় না।[1] এটি মন্ত্রিসভা নয় এই কারণে যে এর অন্তর্ভুক্ত সভ্যেরা শাসনকার্যের পরিচালনা ছাড়াও মূলনীতি নির্ধারণ করে থাকে। আবার একে সরাসরি মন্ত্রিপরিষদ বলা চলে না এই কারণে যে সংসদের সঙ্গে মন্ত্রিসভার মত ঘনিষ্ঠ যোগ এর নাই। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে অবলুপ্তির (Dissolution) ভীতিপ্রদর্শন করে সংসদের ওপর এই গোষ্ঠী কর্তৃত্ব করে থাকে। এসব খুঁটি-নাটি বাদ দিলে, মোটের ওপর একথা বলা যায় যে কার্য ও ক্ষমতার দিক থেকে পার্থক্য থাকলেও মন্ত্রিপরিষদ বৃহত্তর সংস্থা মন্ত্রিসভারই অন্তর্ভুক্ত।

আভ্যন্তরীণ মন্ত্রিগোষ্ঠী
"Inner Cabinet"

রাজা সংসদের গরিষ্ঠ দল থেকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করার পর তাঁর ওপরেই প্রায় সত্তরটির মত ছোট বড় পদ পূরণের দায়িত্ব পড়ে যেগুলি সম্মিলিতভাবে

---

[1] "...We have a Cabinet which is not a ministry and a ministry which is not a cabinet".—Sir Sidney Low : The Govt. of England.

[illegible] জন প্রকৃত মন্ত্রী পর্যায়ে পড়েন, [illegible] তাঁদের সকলে মন্ত্রিপরিষদভুক্ত নাও হতে পারেন। মন্ত্রিপরিষদভুক্ত হওয়া না-হওয়া রাজনৈতিক অবস্থার তারতম্যের ওপর নির্ভর করে। চেম্বারলিনের সময় ১৯৩৯ সালে ২৩ জন, মন্ত্রিপরিষদের সভ্য ছিলেন। আবার চার্চিলের সময় সমরকালীন মন্ত্রী-পরিষদে মাত্র ৮ জন সভ্য ছিলেন। মন্ত্রিপরিষদের সভ্যপদের স্থিরতা না থাকলেও প্রধান মন্ত্রী, রাজ-কোষাধ্যক্ষ (Chancellor of the Exchequer), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, বৈদেশিক মন্ত্রী, বিচারবিভাগীয় মন্ত্রী (Lord Chancellor), কমনওয়েলথ সেক্রেটারী, 'বোর্ড অফ্ ট্রেডের' সভাপতি, প্রতিরক্ষা ও শ্রমমন্ত্রী সাধারণতঃ এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হন। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, বয়স, প্রশাসনিক যোগ্যতা ইত্যাদি বিবেচনা করে বিভিন্ন মন্ত্রীর মধ্যে কার্য বণ্টন করে দেওয়া হয়। সময়বিশেষে কতকগুলি সাধারণ দপ্তরের গুরুত্ব আকস্মিকভাবে বর্ধিত হয়; সেক্ষেত্রে সাময়িকভাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে মন্ত্রিপরিষদে উন্নীত করারও ব্যবস্থা আছে। ১৯৪৫ সালের পর সরকারের জাতীয়করণ এবং সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাগুলির রূপায়ণের জন্য জ্বালানী ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রীর এইভাবে পদোন্নতি ঘটে। পরে এই সমস্ত কার্যভার সম্পন্ন হলে তাঁদের আবার সাধারণ মন্ত্রীর পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া কয়েকজন সাধারণ মন্ত্রী আছেন তাঁদের পরিষদভুক্ত করা না হলেও পরিষদীয় মন্ত্রীদের সমশ্রেণীভুক্ত (of Cabinet rank) বলে মনে করা হয় এবং পরিষদের বৈঠকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়।

মন্ত্রিপরিষদের গঠন
Composition of the Cabinet

এ ছাড়া কয়েকজন সংসদীয় সচিব থাকেন যাঁরা স্বরাষ্ট্র, বৈদেশিক, আর্থিক, স্বাস্থ্য ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে সংসদীয় দায়িত্বপালনে সাহায্য করে থাকেন। সাধারণতঃ অল্পবয়স্ক সংসদ-সদস্যদের রাজনীতির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ এই সব পদাধিকারের সুযোগে হয়ে থাকে। উপরন্তু মন্ত্রিপরিষদের সাধারণ কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করার জন্য ১৯১৬ সাল থেকে একটি ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েট চালু রয়েছে।

সংসদীয় সচিববৃন্দ
Parliamentary Secretaries

মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা ও কার্যধারা (Powers and functions of the Cabinet) :

১৯১৮ সালে 'শাসনযন্ত্র অনুসন্ধান কমিটির' রিপোর্ট (Report of the

Machinery of Government Committee, 1918) অনুসারে মন্ত্রিপরিষদের তিনশ্রেণীর কার্য রয়েছে। (ক) সংসদে উপস্থাপনের জন্য চূড়ান্ত নীতি নির্ধারণ, (খ) সংসদে গৃহীত নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রের কার্যপালিক বিভাগের সমুদয় কার্য নিয়ন্ত্রণ এবং (গ) রাষ্ট্রের বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগের কাজকর্মের সমন্বয় সাধন ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রাধিকার নিরূপণ।

সংসদে উপস্থাপনের জন্য চূড়ান্ত নীতিনির্ধারণের অর্থই হল আইনপ্রণয়নের ব্যবস্থা করা। ছয়শতাধিক কমন্সসভার সদস্যদের দিয়ে জটিল ও বিপুলবিস্তার আইনসমূহের খসড়া রচনা করা সম্ভব নয় বলেই এই ব্যবস্থার প্রয়োজন। মন্ত্রিপরিষদও এ বিষয়ে প্রশাসন বিভাগের দক্ষ কর্মিগণের পরামর্শের ওপর নির্ভর করেন। মোটের ওপর কোন নীতি আইনে পরিণত হবে কিনা সেটা মন্ত্রি-পরিষদই নির্ধারণ করেন। যে আইন মন্ত্রিপরিষদ উত্থাপন করে তা অন্ততঃ কমন্সসভায় পাশ হবেই ; আর মন্ত্রিপরিষদ যে আইনের বিরোধিতা করে সে আইন বাতিল হতে বাধ্য। সুতরাং সর্বাত্মক একটি আইন প্রণয়নেব কর্মসূচী মন্ত্রিপরিষদকে স্থির করতে হয়, যেভাবে সংসদে সেগুলি আলোচিত ও অনুমোদিত হবে। এমন কি কোন্ ভাষায় আইনের প্রস্তাবগুলি আনা হবে সে বিষয়েও মন্ত্রিপরিষদ লক্ষ্য রাখে। মন্ত্রিপরিষদকে তাই এক অর্থে একটি ক্ষুদ্র আইনসভা বলা যেতে পারে।

নীতিনির্ধারণ
Policy decision

মন্ত্রিপরিষদের আরও অনেক কর্তব্য আছে। পরিষদের সভ্যদের সংসদে উপস্থিত থাকতে হয়, অন্ততঃ যখন তাঁদের নিজ নিজ দপ্তরের কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা চলে। দপ্তরের কাজের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কমিটির অধিবেশনেও তাঁদের উপস্থিত থাকতে হয়। এর ওপর সরকারী নীতির সমর্থনে সংসদে আলোচনা ও বিতর্কের উত্তরের জন্যও তাঁদের প্রস্তুত থাকতে হয়। এর জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর (সাধারণতঃ সপ্তাহে দু'বার) মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক বসে। এই বৈঠক কতকগুলি পদ্ধতি (procedure) অনুসরণ করে পরিচালনা করা হয়। সাধারণতঃ মন্ত্রিপরিষদের অধিবেশনের বিবরণ গোপন রাখা হয় ; তবে পত্রীয়ন, নথিভুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েট সেগুলি সব সময় সরকারের পুনঃসমীক্ষার জন্য প্রস্তুত রাখে। প্রতি বৈঠকের পূর্বে আলোচ্য বিষয়ের তালিকা এবং বৈঠক অন্তে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের সংক্ষিপ্তসার প্রত্যেক মন্ত্রীর কাছে প্রেরণ করা হয়। যে সমস্ত বিষয়ে একাধিক দপ্তর জড়িত সে সব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি একত্র পরামর্শ এবং আলাপ আলোচনার শেষে

একটি সর্বসম্মত নীতি স্থির করে মন্ত্রিপরিষদের সম্মুখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করে থাকে। কাজ চালানোর সুবিধের জন্য সংসদের মত মন্ত্রিপরিষদেও স্থায়ী বা অস্থায়ী কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপসমিতি (Sub-Committee) গঠন করা হয়। আইনপ্রণয়ন, আর্থিক নীতি স্থিরীকরণ, বৈদেশিক সম্পর্কগত সমস্যার সমাধান, আইনগত খুঁটিনাটি পরীক্ষা ইত্যাদি জটিল কাজ সহজে ও কমসময়ে করার জন্য এই ধরনের ক্ষুদ্র সংস্থা বিশেষ উপযোগী।

মন্ত্রিপরিষদের দ্বিতীয় বৃহত্তম কাজ হল, সংসদে গৃহীত আইনগুলি কার্যকরী করা এবং এই কার্যকরী করার জন্য কোন ক্ষেত্রে যদি কোন স্পষ্ট আইনগত পদ্ধতি না থাকে, তখন মন্ত্রিপরিষদই আইনের সেই অসম্পূর্ণ অংশগুলিকে সম্পূর্ণ আকার দিয়ে থাকে। আধুনিক কার্যপালিকাবিভাগের এটি একটি অবশ্যম্ভাবী দায়িত্বে দাঁড়িয়ে গেছে। দিনের পর দিন আইনপ্রণয়ন এত জটিল এবং বিপুল আকার ধারণ করছে যে সংসদের পক্ষে সাধারণ সূত্রের আকারে সেগুলি অনুমোদন করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সেই সব আইন প্রয়োগ করার সময় যে যে বিধান, নির্দেশ বা উপবিধি (rules, orders, bye-laws etc.) প্রয়োজন সেগুলি মন্ত্রিপরিষদই প্রশাসন বিভাগের সহায়তায় স্থির করে দেয়। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সাধারণ মন্ত্রীর পক্ষে এইসব বিধিনির্দেশ প্রণয়ন করা সম্ভব কিনা? মন্ত্রিপরিষদে একজনের অবস্থানের অর্থ সবসময় তাঁর প্রশাসনিক খুঁটিনাটি সংক্রান্ত দক্ষতা নাও হতে পারে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা বা অভিজ্ঞতার বলে অনেকেই মন্ত্রিপদ অধিকার করেন। সুতরাং কুশলী প্রশাসনিক কর্মীদের সহায়তা ছাড়া এসব আইনকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া বা কার্যকরী করার সম্ভাবনা নাই। এজন্য প্রায়ই অভিযোগ করা হয় যে মন্ত্রিদের আসলে কোন ক্ষমতা নাই। প্রশাসন কর্মচারীরা তাঁদের যেমন নির্দেশ দেন সেভাবে তাঁরা কাজ করেন। এর দ্বারা নাকি গণতন্ত্র আমলাতন্ত্রে পর্যবসিত হচ্ছে বলে মনে করা হয়। এ অভিযোগ অবশ্য যথেষ্ট অতিরঞ্জিত। প্রকৃতপক্ষে, মন্ত্রিগণ জনগণের স্বার্থের প্রতিভূ—প্রশাসনিক দক্ষতা নয়, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং সাধারণ নীতিনির্ধারণের ক্ষমতা থাকাই তাঁদের আসল যোগ্যতা। সুতরাং প্রশাসন বিভাগের ওপর নির্ভর করার ফলে তাঁদের মূল দায়িত্ব কোন অংশেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। তাছাড়া, পরামর্শ বা উপদেশের জন্য প্রশাসনবিভাগ ছাড়াও বিভিন্ন উপসমিতি, সরকারী-বেসরকারী উপদেষ্টা পরিষদও রয়েছে। সবার

শাসন পরিচালনা
Administrative functions.

উপরে সংসদ এবং জনমতের পথনির্দেশ মন্ত্রিপরিষদকে নিরন্তর সহায়তা করে থাকে।

সাধারণভাবে দপ্তর পরিচালনা ছাড়াও মন্ত্রিগণের প্রশাসনিক দায়িত্বের আরও একটি গুরুত্ব হল ব্যক্তিগতভাবে বা রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে মন্ত্রিগণ সংসদসভ্য ;, ফলে জনসাধারণের কাছে প্রশাসন কর্মচারীদের অপেক্ষা অনেক বেশী সহজগম্য। প্রত্যেক মন্ত্রীই যেহেতু তাঁর আগামী নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যতের কথা ভেবে কাজ করেন, সেইহেতু প্রত্যেক মন্ত্রীকে সংসদের কাছে দায়ী থাকা এবং বিরোধীদলের প্রশ্ন ও সমালোচনার জবাব দেওয়ার অর্থই হল, সামগ্রিকভাবে দপ্তরগুলিকে দায়িত্বশীল করে তোলা। সুতরাং বিভিন্ন দপ্তরের প্রশাসনিক কর্মীরা এমন কিছু করেন না, যার জন্য তাঁদের কর্তৃস্থানীয় মন্ত্রীকে সংসদীয় বিতর্কের সময় অসুবিধায় পড়তে হয়। মন্ত্রিরাও এ বিষয়ে সজাগ থাকেন।

বর্তমান শাসনব্যবস্থার এত বিভিন্ন রকমের দায়িত্ব যে, কেবল একটি বিভাগের অধীনে সমস্ত কিছু পরিচালনা করা সম্ভব নয়। অথচ একাধিক বিভাগের কাজকর্মে অসামঞ্জস্য দেখা দিতে পারে বা আমলাতন্ত্রের প্রভাবে একবিভাগের দীর্ঘসূত্রতায় অন্য বিভাগের কাজকর্ম বানচাল হয়ে যেতে পারে। এককথায় সুষ্ঠু শাসন-পরিচালনার জন্য যে-ঐক্যবদ্ধ সুসমঞ্জস প্রচেষ্টা থাকা দরকার তার অভাব হতে পারে। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য মন্ত্রিপরিষদকে সংযোগসূত্র হিসাবে কাজ করতে হয়। একটি সাধারণ নীতির প্রতীক হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগীয় কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকে। মন্ত্রিপরিষদের পক্ষেও অবশ্য পরিপূর্ণ সমন্বয়-সাধন সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ, বিভিন্ন মন্ত্রী অসংখ্য কাজে ব্যস্ত থাকেন। তদুপরি কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে মন্ত্রিপরিষদকেও অতি বৃহৎ বলে মনে হয়। সেজন্য মন্ত্রিপরিষদকে ভেঙে কতকগুলি উপসমিতি গঠন করা হয়েছে যার ওপর এই সমস্ত কার্যভার অর্পিত।

আন্তর্বিভাগীয় সংহতি সাধন
Inter-departmental Co-ordination

মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতার কথা বলতে গেলে মনে রাখতে হবে যে এই সংস্থাটির যেমন কোন আইনগত ভিত্তি নেই অথচ শাসনযন্ত্রের এটি অপরিহার্য অঙ্গ, তেমনি বিধিবদ্ধ কোন ক্ষমতা পরিষদকে দেওয়া না হলেও প্রথা ও রীতির জোরে, শাসনসংক্রান্ত প্রায় সব ক্ষমতাই মন্ত্রিপরিষদের হাতে এসে

রাজশক্তির নিয়ন্ত্রক
Regulator of Royal authority

পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ইংল্যাণ্ডে রাজার তত্ত্বগত যে সমস্ত ক্ষমতা রয়েছে সেগুলি মন্ত্রিসভাই কার্যত প্রয়োগ করেন। এমন কি রাজার যেগুলি বিশেষাধিকার সেগুলিও মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমেই রাজা ব্যবহার করে থাকেন। এইভাবেই রাজতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের প্রতিভূ দায়িত্বশীল মন্ত্রিপরিষদের সহাবস্থানের ফলে ইংল্যাণ্ডে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে।

ব্রিটিশ মন্ত্রিপরিষদের মূলসূত্র ও বৈশিষ্ট্য (Basic principles and features of the British Cabinet system):

ব্রিটিশ মন্ত্রিপরিষদকে আইনপ্রণয়ন ও শাসনব্যবস্থা উভয়ের উপরই চরমকর্তৃত্বের সম্মেলন হয়েছে এমন একটি দায়িত্বশীল যৌথগোষ্ঠীরূপে বর্ণনা করা চলে। নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতির (Checks & balances) পরিবর্তে সহযোগিতা ও সংহতির আদর্শই এর মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদের বৈশিষ্ট্যগুলি অধ্যাপক হারমান ফাইনার[২] চারটি মূলসূত্রে সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। সূত্রগুলি হল :

(১) মন্ত্রিপরিষদের সভ্যগণ সংসদেরও সভ্য হবেন ; (২) তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতিনিধি হবেন ; (৩) কমন্সসভার যতদিন আস্থা থাকবে ততদিন মন্ত্রিপরিষদ স্থায়ী হবে ; এবং (৪) কমন্সসভার কাছে মন্ত্রিপরিষদ দায়ী থাকবে।

(১) প্রথম সূত্রটির তাৎপর্য হল, মন্ত্রিপরিষদের সভ্যবৃন্দ পূর্বাহ্নেই সংসদের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন অথবা মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পরে কমন্সসভায় নির্বাচনের ব্যবস্থা করে নেবেন অথবা লর্ডস সভায় আসন লাভ করবেন। ১৯১৯ সালের মন্ত্রিগণের পুনর্নির্বাচন আইন ও ১৯২৬ সালে তার সংশোধনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশ আছে। এই নীতিটির মূল উদ্দেশ্য হল এমন একটি সরকার সৃষ্টি করা যা আইনবিভাগ ও কার্যপালিকাবিভাগের সহযোগিতায় অসামান্য দক্ষতা লাভ করবে। সংসদের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ সহযোগের ফলে মন্ত্রিপরিষদ সমস্ত কাজকর্মেই সংসদের কথা স্মরণ রাখে, যে সংসদ সমস্ত জনগণের সংঘবদ্ধ প্রতিফলন। আধুনিক শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনে কার্যপালিকাবিভাগের ক্রমবর্ধমান নেতৃত্ব অপরিহার্য হলেও, সংসদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে তার কুফলগুলি হ্রাস পায়। এই ব্যবস্থার

সংসদ সদস্যপদ
Membership of the Parliament

[২] Herman Finer : "Theory and Practice of Modern Government," Pp. 576-99.

একটি মাত্র ত্রুটি হল যে নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশগ্রহণে অনিচ্ছুক অথচ প্রতিভাসম্পন্ন দক্ষ ব্যক্তিগণকে মন্ত্রিপরিষদে আনা চলে না।

(২) দ্বিতীয় নীতিটির অনুসরণে প্রত্যেক মন্ত্রীই সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠদলের প্রতিনিধি। এর ফলে মন্ত্রিনির্বাচনে রাজার ইচ্ছামত নিয়োগের ক্ষমতা নাই; জনগণের ইচ্ছাই মন্ত্রিপরিষদ গঠনের পূর্ব ইঙ্গিত দিয়ে রাখে। সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রীপদে নিযুক্ত করে তাঁর পরামর্শ অনুসারেই রাজা অন্যান্য মন্ত্রিদের নিযুক্ত করেন। গণতন্ত্রে এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতিটির বিরাট তাৎপর্য। গণতন্ত্র যদি 'আলোচনার দ্বারা শাসন' হয়, তাহলে স্বভাবতই এখানে মতপার্থক্য দেখা দেবে। কিন্তু সুষ্ঠু শাসনের জন্য এই মতপার্থক্যকে হ্রাস করে একটি সাধারণ পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে, যেটা একমাত্র কোন একটি দলের প্রতি আনুগত্যের দ্বারাই সম্ভব। যে দলের ওপর মন্ত্রিসভা নির্ভর করে আছে সেটি যদি একটি একক সংস্থা না হয় তাহলে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলার আশংকা দেখা দেয়। যদিও সম্মিলিত মন্ত্রি পরিষদও (Coalition ministry) দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে, তবু একমাত্র আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসাবেই তার প্রয়োজন। এছাড়া সংসদ ছাড়াও একটি বিশেষ দলের সঙ্গে যুক্ত থাকায় সাধারণভাবে নির্বাচক মণ্ডলীর সঙ্গেও একটা পরোক্ষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সর্বোপরি, সংখ্যাগরিষ্ঠদলের সঙ্গে যুক্ত থাকায় সরকার সবসময়ই আইনপ্রণয়নের ব্যাপারে সংসদের সমর্থন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি :
The majority principle

(৩) সাধারণ শাসনকর্তৃত্ব ও বিশেষ বিশেষ নীতির ক্ষেত্রে যতদিন সংসদের সমর্থন থাকে ততদিনই মন্ত্রিপরিষদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারে। কখনও যদি প্রতিকূল সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা কোন একটিতে মন্ত্রিপরিষদের পরাজয় ঘটে, তাহলে মন্ত্রিপরিষদ পদত্যাগ করতে বাধ্য থাকে। ১৮৩৪ সালে রবার্ট পীলের মন্ত্রিপরিষদের পরাজয় এইরকম একাধিক ঘটনার একটি উদাহরণ। সংসদের প্রতি এই দায়িত্ব আইনবলে অথবা শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রভাবে রক্ষিত হয়। আইনের দিক থেকে, সরকার যদি পদত্যাগ না করে তাহলে বাজেট অনুমোদন বা বাৎসরিক সামরিক আইনের পুনরনুমোদন করতে অস্বীকার করে সংসদ মন্ত্রিপরিষদকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে। এই আইনের ব্যবস্থা অবশ্য চরমক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়। সাধারণভাবে দৈনন্দিন কার্যক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলি এক্ষ

সংসদের প্রতি দায়িত্ব
Responsibility to the Parliament

সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে আপনা থেকেই সংসদের নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী হয়। কোন সরকারী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোটদান, কোন বিশেষ দপ্তরের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক সমালোচনা, নিন্দাসূচক বা অসমর্থনজ্ঞাপক প্রস্তাব পাশ ইত্যাদি এইসব প্রথাসিদ্ধ নিয়ন্ত্রণের পর্যায়ে পড়ে।

তবে বিগত কয়েক দশকের কতকগুলি নূতন পরিবর্তনের ফলে সংসদের এই নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা সম্পর্কে অনেকে সন্দিহান। প্রথমতঃ, একটি ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী ও বিরোধী দুটি দলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ব্রিটিশ মন্ত্রিপরিষদ চলছে। নির্বাচকমণ্ডলী একবার সরকারী ক্ষমতা কোন দলের ওপর অর্পণ করলে, সেই দল সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে নিজের নীতি ও কার্যক্রম অবাধে চালিয়ে যেতে পারে। আবার প্রতিকূল অবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ সংসদ ভেঙে দেওয়ার ভীতিপ্রদর্শনও করতে পারে। ১৯১৬ সালে এইরকম-ভাবে সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। তদুপরি আইনপ্রণয়নের ক্রমবর্ধমান জটিলতা শাসনক্ষেত্রে কার্যপালিকা বিভাগের নেতৃত্বকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলছে। সুতরাং নিয়ন্ত্রণ বলে যদি কিছু থাকে সেটা এখন উভয়তঃই প্রযোজ্য সংসদ মন্ত্রিপরিষদকে এবং মন্ত্রিপরিষদ সংসদকে সমানভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে

(৪) এরপর মন্ত্রিপরিষদের ঐক্যের কথা আসে যৌথ দায়িত্বের নীতিতে যার প্রকাশ। লর্ড মর্লে বলেছিলেন, "মন্ত্রিপরিষদের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যই হল ঐক্যবদ্ধ এবং অবিভাজ্য দায়িত্ব"।[4] আইনতঃ রাজাকে মন্ত্রিগণ যে পরামর্শ দেন তার জন্য মন্ত্রিগণই দায়ী, কারণ 'রাজা কোন অন্যায় করতে পারেন না।' এর চেয়ে গুরুতর প্রশ্ন হল মন্ত্রিদের রাজনৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে। মন্ত্রিগণ ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ দপ্তরের জন্য এবং যৌথভাবে সমগ্র শাসনব্যবস্থার জন্য দায়ী থাকেন। কোন একজন মাত্র মন্ত্রীর সংসদে পরাজয়ের ফলে সমগ্র মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করতে পারে। এর অর্থই হল যে সরকারের একটা সাধারণ দায়িত্ব আছে যা মন্ত্রিগণ সবাই মিলে একসঙ্গে পালন করেন। অবশ্য মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্বের অর্থ এই নয় যে সমস্ত সিদ্ধান্তই সকলে একযোগে গ্রহণ করেন। তবে কোন মন্ত্রী একবার কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে হয় সামগ্রিক ভাবে মন্ত্রিসভা তাঁকে সমর্থন করবে, নয়তো

যৌথ দায়িত্বের নীতি : Principle of collective Responsibility

4 "The first mark of the Cabinet is united and indivisible responsibility" Lord morey.

[illegible] সঙ্গে একমত হতে নাও পারেন। কিন্তু যেই মুহূর্তে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হল, তখন থেকে প্রকাশ্যে তিনি তার বিরোধিতা করতে পারবেন না। যে মন্ত্রী কোন নীতি সম্পর্কে তবুও সন্দেহ পোষণ করবেন তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। লর্ড সলসবেরী এ বিষয়ে একটি প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করেছিলেন, "মন্ত্রিপরিষদে যা কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, পদত্যাগ না করলে তার জন্তে প্রত্যেক মন্ত্রীর নির্বিশেষ এবং অপূরণীয় দায়িত্ব রয়েছে বলেই, পরে একথা বলা চলে না যে একটি ক্ষেত্রে তিনি সামঞ্জস্য করে নিতে রাজী হলেও অন্যান্য বিষয়ে মন্ত্রীরা তাঁকে রাজী হতে উপরোধ করেছে।"[5] সংক্ষেপে, মতৈক্যই হল মন্ত্রিপরিষদ-শাসনের মূল কথা। মন্ত্রিপরিষদ একটি যৌথসংস্থা, যার সভ্যদের উত্থান-পতন একসূত্রে বাঁধা।

উপরোক্ত সাংগঠানিক তাৎপর্য ছাড়াও ব্রিটেনের মন্ত্রিপরিষদের আরও দু'একটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। যেমন, মন্ত্রিপরিষদে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব অবিসংবাদিত ভাবে স্বীকৃত। যদিও পরিষদের সব মন্ত্রীই আইনতঃ সমান মর্যাদাসম্পন্ন, তবু প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্য স্বাভাবিকভাবেই সকলে মেনে নেয়। এর কতকগুলি কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ, বিরোধীদলের সামনাসামনি সরকার তরফে মন্ত্রিপরিষদে যে ঐক্যবদ্ধ রক্ষণ প্রচেষ্টা ও সংহতি থাকা দরকার প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্বে তা প্রকাশ্য রূপ গ্রহণ করে। দ্বিতীয়তঃ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রীই সংসদে এবং সংসদের বাইরে জনগণের গরিষ্ঠ সমর্থন-ধন্য রাজনৈতিক দলের নেতা; কাজেই তাঁকে মান্য করা ব্যক্তিগত রাজনৈতিক স্বার্থেই মন্ত্রিদের করতে হয়। কারণ, কোন ব্যক্তিকে মন্ত্রিসভায় রাখা বা না-রাখার ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর আছে। তৃতীয়তঃ, মন্ত্রিসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব, দপ্তরবণ্টন, দপ্তরগুলির ওপর সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির ফলেও প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব
Preeminence of the Premier

মন্ত্রিপরিষদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল গোপনীয়তা রক্ষা। কোন বিশেষ

---

5 "For all that passes in the Cabinet each member of it who does not resign is absolutely and irretrievably responsible and has no right afterwards to say that he agreed in one case to a compromise while in another he was pursuaded by his colleagues"—Lord Salisbury. সম্মিলিত জাতীয় সরকার (National coalition govt.)-এর [illegible] এতটা বাধ্যবাধকতা নাই।

[illegible] থাকলেও ঐকমত্য বা জনসাধারণের [illegible]লটা ধরা না পড়ে, সেইভাবে আপাতঃঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করতে গেলে প্রত্যেক সদস্যকেই গোপনীয়তা রক্ষা করতে হয়। এছাড়া রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, কূটনৈতিক প্রয়োজন তো আছেই। ১৯২০ সালে এই মর্মে Official Scerets Act পাশ হয়েছে। ১৯২২ সালে গোপন তথ্য ফাঁস করে দেওয়ার অভিযোগে সেক্রেটারী অব স্টেটকে পদত্যাগ করতে হয়।

গোপনীয়তা
Secrecy

সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠদলেরই অন্তর্ভুক্ত একদল লোকের দ্বারা দেশশাসন চলে বলে অনেকে মনে করেন মন্ত্রিপরিষদ সংসদেরই একটি সমিতি (committee) মাত্র। আক্ষরিক অর্থে একে অবশ্য কোনক্রমেই সমিতি আখ্যা দেওয়া যায় না ; কারণ, সংসদ এই সংস্থাকে নিযুক্ত করে না। আর, সাধারণ সমিতিগুলিকে সংসদ থেকে আইনের প্রস্তাব পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় ; পক্ষান্তরে, মন্ত্রিপরিষদ থেকেই সব আইনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। সর্বোপরি, অবলোপ (Dissolution)-এর দ্বারা মন্ত্রিপরিষদ নিজেই নিজের স্রষ্টাকে ধ্বংস করতে পারে। তবে লোয়েল (Lowell) যে অর্থে মন্ত্রিপরিষদকে 'চক্রের মধ্যে চক্র' ('wheel within wheels') বলেছেন সেই অর্থে একে সমিতি বলা যায়। সবার বাইরে, মূল রাজনৈতিক দল, তার মধ্যে সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, তার মধ্যে মন্ত্রিসভা এবং তারও মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ এইভাবে চক্রের মধ্যে চক্রের অবস্থিতি।

মন্ত্রিপরিষদ কি সংসদেরই একটি সমিতি ?
Cabinet, a committee of the Parliament ?

দেশের শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদের অস্তিত্ব সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। নানাভাবে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কেউ বলেছেন 'রাজনৈতিক সৌধের ভিত্তিপ্রস্তর', কেউ বলেছেন 'সমস্ত শাসনযন্ত্র ঘুরছে এই কবজার ওপর', ইত্যাদি।[6] মন্ত্রিপরিষদকে বেজহট আবার ব্যবস্থাপক ও কার্যপালিকা বিভাগের সংযোগসূত্র রূপে বর্ণনা করেছেন।[7] প্রকৃতপক্ষে রাজা বা রানী, কমন্সসভা ও লর্ডসভাকে মন্ত্রিপরিষদই একসূত্রে আবদ্ধ করেছে। এই

মন্ত্রিপরিষদের গুরুত্বপূর্ণ অস্তিত্ব
Pivotal position of the Cabinet

---

6 "Key-stone of the political arch" (Lowell),
"the pivot around which the whole political machinery revolves". (Marriott)

7 "The hyphen that joins, the buckle that binds the Executive and the Legislative departments together"—Bagehot : "The English Constitution."

[illegible] কার্যকরী ক্ষমতা এবং স্থিতিস্থাপকতা নিঃসন্দেহে আধুনিক শাসন-[illegible] একটি প্রশংসনীয় কলশ্রুতি।

[illegible] The Prime Minister) :

[illegible] ক্ষমতা ও কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্রিটেনের রাষ্ট্রনায়ক প্রধানমন্ত্রীর পদ [illegible] আইনগত স্বীকৃতির অপেক্ষা না রেখেই পূর্ণমর্যাদায় গড়ে উঠেছে। একমাত্র ১৯৩৭ সালের রাজমন্ত্রী আইন ছাড়া (Ministers of the Crown Act, 1937) আর কোন বিধিবদ্ধ আইনে এই পদটির উল্লেখ নাই। তবু প্রধানমন্ত্রীই দেশের প্রকৃত শাসক এবং মন্ত্রিপরিষদের প্রাণকেন্দ্র। যদিও মন্ত্রিপরিষদের সকল সভ্যেরই আইনতঃ সমান মর্যাদা, তবু প্রধানমন্ত্রীকে সমশ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য (*primus inter pares*) বলা হয়। স্যার হারকোর্টের বর্ণনায় প্রধানমন্ত্রী 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কের মধ্যে পূর্ণ চন্দ্র সদৃশ' (*inter stella luna minores*) প্রয়োজনের তাগিদেই অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর এই নেতৃত্ব। সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি, মন্ত্রিপরিষদে ব্যক্তিগত মতবিরোধের অবসান, আন্তর্বিভাগীয় বিরোধ নিরসন, এবং সুসংবদ্ধ কর্মধারার জন্য এরূপ একটি ঐক্যের প্রতীক একান্ত আবশ্যক। প্রধানমন্ত্রীর এই প্রাধান্য বিশেষভাবে চারটি ক্ষেত্রে লক্ষিত হয়: (১) মন্ত্রিপরিষদের সভাপতিত্ব, (২) সংসদের ওপর নেতৃত্ব, (৩) রাজা বা রানীর সহিত একমাত্র সংযোগের পন্থা, (৪) ক্ষমতাসীন রাজনৈতিকদলের নেতৃত্ব।

মন্ত্রিপরিষদের সভাপতিত্ব
Chairmanship of the Cabinet

(১) গোষ্ঠীমাত্রেরই একজন পরিচালক থাকা দরকার। সরকারের কর্মদক্ষ বিভাগ মন্ত্রিপরিষদের নেতৃত্ব তাই প্রধানমন্ত্রীর ওপর অর্পিত। এই নেতৃত্ব নানা কারণে গড়ে উঠেছে। প্রথমতঃ, ইংল্যাণ্ডে রাজনীতিক্ষেত্রে একটি বিশেষ মানসিকতা হল যে কোন সভা-সমিতির সভাপতিপদের প্রতি সকলেই সম্ভ্রম প্রদর্শন করে। প্রধানমন্ত্রীও মন্ত্রিপরিষদে এই সম্ভ্রমের অধিকারী। দ্বিতীয়তঃ, রাজার সম্মতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সহযোগীদের নিয়োগ করেন এবং তাঁর পছন্দ-অপছন্দের ওপর প্রত্যেক মন্ত্রীর কার্যকাল নির্ভর করে। প্রধানমন্ত্রী তাই এ বিষয়ে যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতার অধিকারী। তবে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব যাতে মন্ত্রিপরিষদে হয় সেদিকেও তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হয়। তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন বিভাগের ওপর তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন এবং তাদের প্রশাসন কার্যের সংহতি ও সামঞ্জস্য সাধন

নির্বাচনের জন্য সারা দেশকে কতকগুলি নির্বাচনী এলাকায় ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক এলাকা থেকে এক একজন সদস্য নির্বাচিত হন। নির্বাচন-দ্বন্দ্বিতায় যে প্রার্থী সর্বাধিক ভোট পান তিনিই নির্বাচিত হন। গরিষ্ঠ সমর্থনের ভিত্তিতে নির্বাচন-সাফল্য নির্ধারণের এই নীতি সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত নয়। তাই সার্বিক ভোটাধিকার সত্ত্বেও কমন্সসভায় সমগ্র জনসাধারণের পরিপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। একাধিক দল থাকায় ভোটদাতাদের সামগ্রিকভাবে যে দলের প্রতি সমর্থন আছে অনেক সময় সেই দল কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে না। বিজয়ী দল কমসংখ্যক ভোট পেয়েও অধিকসংখ্যক আসন লাভ করতে সমর্থ হয়। ১৯২৪ সালের নির্বাচনে রক্ষণশীলদল সমস্ত ভোটসংখ্যার ৪৭% ভোট পেয়ে মোট ৪১৫ টি আসন দখল করে অথচ জনসমর্থনের অনুপাতে এইদলের ২৮০ টির অধিক আসন লাভ করার কোন যৌক্তিকতা নাই। প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতির ফলে দেখা যায় দেশের প্রায় ৭০% লোক নির্বাচনকে কোনক্রমেই প্রভাবিত করতে পারে না এবং তাদের এমন একটি দলের শাসন মেনে চলতে হয় যার নীতির সঙ্গে তাদের সম্পূর্ণ মতবিরোধ। এই সমস্ত ত্রুটি দূর করার জন্য অনেকে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে হস্তান্তরযোগ্য একক ভোটের দ্বারা নির্বাচন পরিচালনার সমর্থন করেন। কেউ কেউ গরিষ্ঠ ভোটের (Majority vote) বদলে সাকুল্য ভোট (cumulative vote) গণনার প্রস্তাব করে থাকেন। কিন্তু, বিকল্প ব্যবস্থাগুলির জটিলতার জন্য এবং বহুদল সৃষ্টির আশঙ্কা হেতু এই সমস্ত সুপারিশ কার্যকরী করা হয়নি। এ ছাড়া ধনবৈষম্য ও নাগরিক অধিকারের কার্যকারিতার অভাবের ফলে সকল ব্যক্তির পক্ষে ব্যয়সাপেক্ষ নির্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়ারও অনেক বাধা রয়েছে। সরকারী কর্মচারী ছাড়াও, শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী এবং শিক্ষকদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ একেবারেই নাই। এই সমস্ত কারণে ইংল্যাণ্ডের প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার সার্বিকতা প্রশ্নাতীত নয়।

প্রতিনিধিত্ব রীতি
Mode of Representation

১৯১১ সালের আগে পর্যন্ত Septennial Act অনুসারে ব্রিটেনের কমন্সসভার মেয়াদ ছিল ৭ বৎসর। পরে এই স্থায়িত্ব কাল কমিয়ে ৫ বৎসর করা হয়। তবে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই প্রধান মন্ত্রী রাজাকে দিয়ে সংসদ ভেঙে দিতে পারেন। সুতরাং অবলোপের দ্বারা কমন্সসভার মেয়াদ হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া সংসদ নিজেই আইন করে কমন্সসভার স্থায়িত্বকাল

[illegible]

আহূত বা বন্ধ বা স্থগিত রাখা হয়। কোন বিধিবদ্ধ আইন [illegible] শাসনতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী প্রতি বৎসরে অন্ততঃ একবার সংসদের অধিবেশন আহ্বান করতেই হয়; কারণ, রাজস্ব, সমরবিভাগ প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে প্রতিবৎসরই আইনের পুনরনুমোদন প্রয়োজন। এক অধিবেশন বন্ধ হওয়ার পর রাজা বা রানীর মৃত্যু হলেও সংসদ বিনা আহ্বানেই পুনরায় মিলিত হতে পারে।

স্থায়িত্ব
Duration

যৌথভাবে কমন্সসভা এবং ব্যক্তিগতভাবে তার সভ্যবৃন্দের কতকগুলি সুযোগ সুবিধা রয়েছে। যেমন, সংসদের অধিবেশন আহ্বান ও বন্ধ হওয়ার ৪০ দিন আগে বা পরে দেওয়ানী দায়ে কোন সভ্যকে আটক করা যায় না। সংসদ সভ্যদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার বাক্‌-স্বাধীনতা। সংসদীয় কার্য পরিচালনার সময় সদস্যগণ যে সমস্ত মতামত প্রকাশ করেন তার জন্য তাঁদের অভিযুক্ত করা চলে না। বিতর্ক বা প্রশ্নোত্তর কালে কোন গোপন তথ্য প্রকাশের জন্যও সরকারী গোপনীয়তা রক্ষা আইন (Official Secrets Act) প্রযোজ্য নয়। আবার সভার নিজস্ব স্বার্থে গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য সভার কার্যবিধি সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রকাশ বা সভায় আগন্তুকদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ করা যেতে পারে। আভ্যন্তরীণ কার্যবিধি পরিচালনার ব্যাপারেও সম্পূর্ণ ক্ষমতা কমন্সসভাকেই দেওয়া হয়েছে। সভায় শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সভা প্রয়োজনমত বিধানসৃষ্টি করতে পারে এবং শৃঙ্খলাভঙ্গকারী বা সভাকে অবমাননাকারী সভ্যদের শাস্তি দিতে পারে। কোন সভ্যের আইনগত অযোগ্যতা আদালতের বিচারে প্রমাণিত হলে, এ বিষয়ে চূড়ান্ত কার্যকরী ব্যবস্থা কমন্সসভাই গ্রহণ করে।

কমন্সসভার সুযোগসুবিধা
Privileges of the Commons

সংসদের প্রতিনিধিত্বমূলক কক্ষ হিসাবে কমন্সসভার প্রধান দায়িত্ব হল:—(১) দেশের সুশাসনের জন্য আইন প্রণয়ন। সাধারণ আইনের ক্ষেত্রে যদিও লর্ডস সভার সঙ্গে কমন্সসভা সমান ক্ষমতার অধিকারী, তবু অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রস্তাব কমন্সসভাতেই উত্থাপিত হয়ে থাকে। আবার প্রত্যেক সাধারণ বিলের আইনে পরিণত হতে হলে উভয় কক্ষের সম্মতি প্রয়োজন হলেও কমন্সসভায় যদি কোন বিল পরপর তিনটি অধিবেশনে একইভাবে পাশ হয় তাহলে লর্ডস সভার

কমন্সসভার কার্য ও ক্ষমতা
Powers and functions of the Commons

[illegible] পরিণত হয়। [illegible] ছাড়া [illegible] [illegible]
কমন্সসভায় পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে। অর্থবিল মাত্রই ১৯১১ সালের পার্লামেন্ট
এ্যাক্ট অনুযায়ী কমন্সসভাতেই আনীত হয় এবং লর্ডস সভায় রীতি হিসাবে
প্রেরিত হলেও ঐ কক্ষের অনুমোদনের ওপর নির্ভর করে না। (২) কমন্স-
সভার দ্বিতীয় দায়িত্ব হল দেশের শাসন ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণমূলক নজর রাখা,
যাতে করে তা জনগণের সদিচ্ছা অর্জন করতে পারে। কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ
দলের নেতাকেই রাজা প্রধানমন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর
পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রীরা নিযুক্ত হন। সাধারণতঃ অধিকাংশ মন্ত্রী কমন্স-
সভার সভ্য হওয়ায়, এই সভার পক্ষে মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সহজ।
বিশেষত 'মন্ত্রিসভার সভ্যগণ ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে সংসদের নিকট
দায়ী'—এই প্রথা অনুযায়ী কমন্সসভায় যতদিন মন্ত্রিসভা আস্থাভাজন থাকিবে
ততদিনই তার অস্তিত্ব। কমন্সসভায় মন্ত্রিদের কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হলে
বা কোন মন্ত্রী বা মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাশ হলে বা বাজেট
অসমর্থিত হলে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করতে বাধ্য থাকে। এই সব চরমক্ষমতা
ছাড়াও কমন্সসভায় দৈনন্দিন প্রশ্নোত্তর, মুলতুবী প্রস্তাব আনয়ন ও বিতর্কের
মধ্যে দিয়েও মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করার অনেক সুযোগ রয়েছে। (৩) সর্বোপরি
অর্থসংস্থানের ওপর কমন্সসভার নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব থাকায় দেশের সরকার এই
সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য থাকে। বার্ষিক বাজেট, অর্থাদায়,
কর স্থাপন বা বিলোপ বা হ্রাস, সরকারী ঋণগ্রহণ সংক্রান্ত যে কোন অর্থবিল
কমন্সসভায় পাশ না হলে কার্যকরী হয় না। সুতরাং গণতান্ত্রিক নিয়মানুগ
শাসনব্যবস্থার প্রধান ধারক ও বাহক হিসাবে কমন্সসভার গুরুত্ব অসীম।
সমগ্র জাতির প্রতিনিধিস্থানীয় এই প্রতিষ্ঠানে জনমতের যে প্রতিফলন হয় সেই
অনুসারেই দেশের শাসনকার্য চলে।[6]

সংসদীয় সার্বভৌমত্বের দেশ ইংল্যাণ্ডে যে কমন্সসভার সার্বিক কর্তৃত্ব
থাকবে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। তবে আধুনিক রাষ্ট্রের ব্যাপক ও
বিভিন্ন কর্মধারার পরিপ্রেক্ষিতে কার্যপালিকা বিভাগের ওপর যে নূতন
নেতৃত্বভার এসে পড়েছে, কোন কোন সমালোচক তাতে শঙ্কিত হয়ে
ক্যাবিনেট স্বৈরাচারের সম্ভাবনার কথা বলেছেন এবং কমন্সসভার প্রভাব যে

---

6 "The virtue, spirit and essence of the House of Commons consists in its being the express image of the nation."

ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে সে বিষয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মতামত প্রকাশ করেছেন।[1] যে সমস্ত পথে ক্যাবিনেটের স্বৈরাচার প্রশ্রয় পাচ্ছে সংক্ষেপে সেগুলি হল :

কমন্সসভার প্রভাব হ্রাস
Decline of the Influence of the Commons

(১) প্রধানমন্ত্রীর সংসদ ভেঙে দেওয়া বা ভেঙে দেওয়ার ভীতিপ্রদর্শনের ক্ষমতা, (২) আধুনিক আইনের জটিলতাহেতু সমুদয় খসড়া প্রস্তাব সরকারী তরফ থেকে উত্থাপন, (৩) অর্থবিল সম্পর্কে সরকারী তথ্যের মধ্যেই সমালোচনার অবকাশের সীমাবদ্ধতা, (৪) আমলা-তন্ত্রের ক্রমপ্রসারমান প্রভাব, (৫) দলীয় শৃঙ্খলার ভিত্তি দৃঢ়তর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন সম্পর্কে সরকারের স্থিরনিশ্চয়তা। (৬) সাধারণ সভ্যদের সমস্যাপূর্ণ বিষয়ের ওপর বিতর্কে অংশগ্রহণের মত বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী ও সমালোচনার দক্ষতার অভাব এবং (৭) কমন্সসভার ওপর অত্যধিক কাজের চাপের ফলে সরকারী তরফে অর্পিত আইনপ্রণয়নের (Delegated legislation) প্রাদুর্ভাব। সব জড়িয়ে কমন্সসভা বর্তমানে সরকারী কার্যধারা অনুমোদনের একটি শীলমোহরে পরিণত হয়েছে বলে সমালোচকেরা মত প্রকাশ করে থাকেন।

উপরোক্ত অভিযোগগুলি তথ্য হিসাবে সত্য হলেও সূক্ষ্মবিচারে কোন আশঙ্কার সৃষ্টি করে বলে মনে হয় না। একথা সত্য যে এক সময়ে কমন্সসভার যে প্রাধান্য ছিল, যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপ পাল্টেছে। কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা, দলতন্ত্রের অগ্রগতি ইত্যাদির ফলে স্বাভাবিকভাবেই কার্যপালিকা বিভাগের ওপর নেতৃত্বভার এসে পড়েছে। কিন্তু তার ফলে, সংসদের প্রতি কার্যপালিকা বিভাগের দায়িত্বশীলতাও যে হ্রাস পেয়েছে সে কথা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। কমন্সসভায় বিরোধীদলের অস্তিত্ব, নির্বাচননির্ভর দলতন্ত্রে সরকারের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা এবং সর্বোপরি জনমতের চাপ সর্বদাই সরকারকে কমন্সসভার ওপর নির্ভর করতে বাধ্য করছে।

স্পীকার (The Speaker) :

হাউস অব কমন্স প্রতিষ্ঠা হওয়ার সময় থেকেই স্পীকারের ওপর তার সভাপতিত্বভার অর্পিত হয়েছে। স্পীকার শব্দটির অর্থ বক্তা হলেও স্পীকার কদাচিৎ বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে কমন্সসভার তরফে রাজসমীপে

---

[1] র‍্যামজে ম্যুয়র এ বিষয়ে বলেছেন : "Parliament exists mainly for the purpose of maintaining or of somewhat ineffectually criticising all good but omnipotent Cabinet..." এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

[illegible] বলে তাঁকে এই নাম দেওয়া হয়েছে। [illegible] সভার প্রথমযুগে সভার সিদ্ধান্ত আবেদন ও অভিযোগসমূহ স্পীকারই রাজার নিকট পেশ করতেন। দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অনুযায়ী সভার সভ্যগণের মধ্য থেকেই স্পীকার নির্বাচিত হন। আসলে মন্ত্রিপরিষদই স্পীকার পদপ্রার্থী মনোনীত করে এবং কমন্সসভার দুজন বেসরকারী সভ্য এই মনোনয়ন সমর্থন করেন।

নির্বাচন
Election

দলীয় প্রাধান্যের ভিত্তিতে নির্বাচিত হলেও নির্বাচনের পর স্পীকার কোন দলের সঙ্গে যুক্ত থাকেন না। নিরপেক্ষ ও নিস্পৃহভাবে তিনি কমন্সসভা পরিচালনা করেন এবং সভার কার্যবিধি সম্বন্ধে নির্দেশ দেন। এই ধরনের পক্ষপাতশূন্য দায়িত্বপালনের জন্য স্পীকারের পদমর্যাদা গ্রেট ব্রিটেনে এত অসামান্য যে পরবর্তী নির্বাচনে স্পীকার অবশ্যই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুনর্নির্বাচিত হন। মোটের ওপর কোন ব্যক্তি যতদিন স্পীকার থাকতে ইচ্ছুক, ততদিনই তিনি ওই পদে বহাল্ থাকেন। স্পীকার পদে নিযুক্ত হবার জন্য বিশেষ কোন যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। সাধারণতঃ রাজনৈতিক দলসমূহের কম বিখ্যাত ব্যক্তিগণই এই পদে অধিষ্ঠিত হন। স্পীকারকে প্রতিবৎসর ৫,০০০ পাউণ্ড বেতন দেওয়া হয়। এছাড়া ওয়েষ্টমিনিষ্টার প্রেসে তাঁর বাসভবন রয়েছে। অবসর গ্রহণের পর স্পীকার পেন্সন পেয়ে থাকেন এবং তাঁকে লর্ড উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

পদমর্যাদা অনুযায়ী স্পীকারের ক্ষমতাও যথেষ্ট। জাতির ঐতিহ্য এবং মনস্তত্ত্বের সঙ্গে ক্ষমতাগুলি এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয় যে তাদের ব্যাপকতা নির্দেশ করা কঠিন। সাধারণভাবে কতকগুলি ক্ষমতার উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি কমন্সসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং সেই কারণে সভার শৃঙ্খলারক্ষার সমস্ত দায়িত্ব তাঁর। সভায় কোন কোন সভ্য কি অনুক্রমে বক্তৃতা করবে সেটা তিনিই নির্ধারণ করেন। বৈধতার প্রশ্ন উঠলে স্পীকারই সে বিষয়ে বিধান (ruling) দিয়ে থাকেন। যদিও স্পীকার পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত নজীর অনুসরণ করে এই সব বিধান দেন, তবু এক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব বিবেচনা প্রয়োগের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এবং তাঁর বিধান সর্বদাই চরম বলে গৃহীত হয়। সভার শৃঙ্খলাভঙ্গকারী সভ্যদের সম্পর্কে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণেরও অধিকার স্পীকারের আছে। সাধারণতঃ বিল পাশের ব্যাপারে ভোটাভুটিতে স্পীকার কোন অংশ গ্রহণ করেন না। তবে উভয় পক্ষেই সমান

ক্ষমতা ও কার্যাবলী
Powers & Functions

ভোট পড়লে তিনি ইচ্ছা করলে ব্যক্তিগত একটি ভোট দিতে পারেন। এ বিষয়েও একটি রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। যখন কোন প্রস্তাব পাশ হওয়া না হওয়া একটি ইতিবাচক বা একটি নেতিবাচক ভোটের ওপর নির্ভর করে, তখন স্পীকার ইতিবাচক ভোটই দিয়ে থাকেন। আবার মুলতুবী প্রস্তাবে সমান সমান ভোট পড়লে স্পীকার সাধারণতঃ তার বিরোধিতা করে থাকেন। এছাড়া ১৯১১ সালের পার্লামেন্ট এ্যাক্ট অনুযায়ী স্পীকারের আর একটি বিশেষ ক্ষমতা হল কোন বিল অর্থবিল কিনা তা স্থির করে ঐ মর্মে সার্টিফিকেট দেওয়া। আবার লর্ডস সভায় বিরোধিতা সত্ত্বেও কোন বিল কমন্সসভার উপর্যুপরি তিনটি অধিবেশনে পাশ হয়ে গেলে, কালাতিক্রম হেতু ঐ বিলের কি কি পরিবর্তন সাধন করা উচিত সে বিষয়ে স্পীকার সুপারিশ করতে পারেন। এছাড়া, নিরপেক্ষ বিচারকের মত স্পীকার সভায় সাধারণ সভ্যদের অধিকার ও সুযোগসুবিধাগুলির সংরক্ষণ কবেন। তাঁর চোখে সরকারী বেসরকারী সব সভ্যেরই এই ব্যাপারে সমান দাবী। সুতরাং কমন্সসভার কার্যপদ্ধতি বা সভা কোন পথে চলবে সেটা স্পীকারের মনোভঙ্গীর ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। কমন্সসভাকে আদর্শ জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সভায় পরিণত করা স্পীকারের দায়িত্ব। এই অনন্ত ক্ষমতার যথাযথ প্রয়োগ ও এই সব দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা অবশ্য স্পীকাব পদে নিযুক্ত ব্যক্তির দক্ষতা, বুদ্ধিবিবেচনা ও অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে।

আইন প্রণয়ন ও কমিটি ব্যবস্থা (Process of Legislation and the Committee System) :

ইংল্যাণ্ডে আইন প্রণয়নের পদ্ধতিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। মোটামুটিভাবে আইনের প্রস্তাবগুলিকে সাধারণ স্বার্থ সংক্রান্ত বিল এবং বিশেষ স্বার্থ সংক্রান্ত বিল (Public & Private Bills)—এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। সাধারণ স্বার্থ সংক্রান্ত বিলগুলিতে সামগ্রিকভাবে জাতির বা জাতির একটা বিরাট অংশের স্বার্থ ও সমস্যা জড়িত থাকে। পক্ষান্তরে বিশেষ স্বার্থ সংক্রান্ত বিলগুলি কোন অঞ্চল বা প্রতিষ্ঠান বা পৌর সংগঠন বা তৎসংক্রান্ত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর বিষয়ে বিধান দিয়ে থাকে। উভয় প্রকার বিলের আইনে পরিণতির পদ্ধতি কিছুটা বিভিন্ন। সাধারণ স্বার্থ সংক্রান্ত বিলগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত হয় বলে ঐগুলিকে সরকারী বিল বলা যেতে পারে। বেসরকারী সদস্য কর্তৃক এইরকম বিল উত্থাপিত হলে তাকে 'বেসরকারী সাধারণ স্বার্থ সংক্রান্ত বিল' (Private Member Public Bill) বলা হয়।

সরকারী বিলগুলির আবার দুটি শ্রেণী : সাধারণ বিল ও অর্থবিল। সাধারণ সরকারী বিলগুলি সংসদের যে কোন কক্ষে প্রস্তাবিত হতে পারে; তবে যে কক্ষেই উত্থাপিত হোক না কেন, বিলটি আইনে পরিণত হতে হলে উভয় কক্ষেরই সম্মতি প্রয়োজন, প্রত্যেক কক্ষেই বিলটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয়ে থাকে এবং এই আলোচনার পাঁচটি স্তর রয়েছে :—

সরকারী বিলসমূহ
Government Bills

প্রথমতঃ, উপস্থাপন এবং প্রথম পাঠ (Introduction & First Reading)—বিলটির প্রস্তাবক বিল আনয়নের একটি বিজ্ঞপ্তি সেই দিনের আলোচ্য বিষয়ের তালিকায় প্রকাশ করেন এবং কোন একটি কক্ষে বিলটি পেশ করেন। অনেক সময় আবার একটি বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করে বিলটির প্রস্তাবক সভায় বিলটি আনয়নের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন; তারপর বিল আনয়নের সমর্থনে তাঁর এবং বিল আনয়নের বিরুদ্ধে বিপক্ষ দলের বক্তৃতা শেষে স্পীকার এবিষয়ে ভোট গ্রহণ করেন। যেভাবেই হোকনা কেন, বিলটি উত্থাপনের পর তার প্রথম পাঠ শুরু হয়। এই সময় কোন বিতর্ক হয় না; কেবল দ্বিতীয় পাঠের জন্য একটি দিন স্থির হয় এবং বিলটি ছাপতে দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়তঃ, বিলটির দ্বিতীয় পাঠের (Second Reading) সময় কেবলমাত্র বিলের মূল নীতিগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং ভোট গ্রহণ করা হয়। বিলের বিশেষ বিশেষ ধারা নিয়ে কোন বিতর্ক এখন করা হয় না। এই পর্যায়ে বিরোধী দল বিলটির দ্বিতীয় পাঠ ছয়মাস পিছিয়ে দেওয়া হোক এই মর্মে অথবা বিলের উদ্দেশ্য-বিরোধী অপর একটি বিল আনয়নের চেষ্টা করতে পারে। দ্বিতীয় পাঠ শেষে বিলটি ভোটে দেওয়া হয়। ভোটে পরাজিত হলে সরকার-পক্ষকে পদত্যাগ করতে হয়।

তৃতীয়তঃ, বিলের দ্বিতীয় পাঠ উত্তীর্ণ হলে কমিটি পর্যায়ে বিলটি প্রেরণ করা হয়। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই কমিটি ব্যবস্থার গুরুত্ব অসামান্য। বর্তমান কালে সরকারী কাজকর্ম এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে সংসদের কোন কক্ষে ঐ সব বিষয়ে সমুদয় আইনের প্রস্তাব বিষদভাবে আলোচনা ও পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব নয়। কারণ সংসদের অধিবেশন সারা বৎসর চলে না। তাছাড়া, ছয় শতাধিক সভ্য নিয়ে গঠিত এক একটি কক্ষে যথোপযুক্ত আলোচনারও সুযোগ খুবই কম। কিন্তু অল্প কয়েকজন বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত ছোট ছোট কমিটি বৈঠকে আইনগুলি পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলে, তার দোষগুণ সম্পর্কে ভালভাবে আলোচনা হতে পারে। এর ফলে আইন প্রণয়নের কাজটিও দ্রুত নিষ্পন্ন হয় এবং

[illegible] করে অধিক সংখ্যক বিল সংসদে [illegible] থাকে। এছাড়া সংসদের সভ্যগণের সমালোচনামূলক বক্তৃতা প্রকাশিত করা হয়ে থাকে বলে সরকারী তরফেও সেই সব সমালোচনা মেনে নিয়ে আইনের সংশোধন করার পক্ষে কিছুটা অসুবিধা আছে, গোপন কমিটি বৈঠকে যে অসুবিধা দেখা দেয় না। তখন সরকার ও বিরোধী উভয় পক্ষের সহযোগিতায় সুষ্ঠুভাবে বিল প্রণয়ন করা সম্ভব হয়। এই সমস্ত কারণেই কমিটি ব্যবস্থান প্রবর্তন হয়েছে।

কমিটি পর্যায়
The Committee Stage

সংগঠনেব দিক থেকে কমিটিগুলি পাচ শ্রেণীতে বিভক্ত: (১) স্থায়ী কমিটি Standing Committee), (২) নির্বাচিত কমিটি (Select Committee), ৩) অধিবেশনকালীন কমিটি (Sessional Committee), (৪) বিশেষ স্বার্থ রক্ষব বিল কমিটি (Private Bill Committee) এবং (৫) সমগ্র সভাব কমিটি Committee of the Whole House)। প্রত্যেক অধিবেশনের শুরুতে মনোনয়ন কমিটি কর্তৃক **স্থায়ী কমিটি** গঠিত হয, বর্তমানে স্থায়ী কমিটির সংখ্যা পাঁচ। প্রত্যেক কমিটিতে ৩০ থেকে ৫০ জন সভ্য থাকেন। এছাড়া আলোচ্য বিষযে বহিরাগত বিশেষজ্ঞদের কমিটিতে গ্রহণ কবাবও ক্ষমতা কমিটির রযেছে। স্থায়ী কমিটিগুলির সভাপতি মনোনযন কমিটি কর্তৃক তালিকাভুক্ত সভ্যদের মধ্য থেকে স্পীকার কর্তৃক মনোনীত হন। দ্বিতীয পাঠের পর অধিকাংশ বিল বিভিন্ন স্থাযী কমিটিতে প্রেরিত হয়। একই কমিটিতে বিভিন্ন বিষয়সম্পর্কিত বিলের বিচার বিবেচনা হযে থাকে। কেবলমাত্র স্কটল্যাণ্ড সম্পর্কিত বিলের জন্ম পৃথক স্থায়ী কমিটি আছে। **নির্বাচিত কমিটিগুলিতে** কমন্সসভা বা লর্ডস সভা কর্তৃক প্রেরিত বিশেষ বিশেষ বিষয় নিযে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়। কমিটির রিপোর্ট পেশের পর তার অবলোপ ঘটে। সাধারণতঃ ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত এই কমিটি মনোনযন কমিটি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। **অধিবেশনকালীন** কমিটিগুলি একটি নির্দিষ্ট অধিবেশন চলাকালীন কমন্সসভা কর্তৃক নিযুক্ত হয। মনোনয়ন, সরকারী হিসাব-নিকাশ, স্থায়ী নির্দেশ, সংসদীয় অধিকার ইত্যাদি এক একটি বিষয়ে এক একটি কমিটি কাজ করে। **বিশেষ স্বার্থ সংক্রান্ত** কমিটিগুলির প্রত্যেকটি পাঁচজন সদস্য নিয়ে গঠিত। এখানে ঐ বিশেষ স্বার্থসংক্রান্ত আইনের এক একটি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচ্য বিলের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট সভ্যগণকে কমিটিতে স্থান দেওয়া হয় না। বিতর্কমূলক বিলসমূহের ক্ষেত্রে এই কমিটি বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর সাক্ষ্য ও বক্তব্য গ্রহণ করে এবং বিচক্ষণ আইনজ্ঞদের পরামর্শে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

[illegible] সভ্য নিয়ে গঠিত—এই [illegible] সমগ্র কক্ষের কমিটি কথাটি অদ্ভুত মনে হলেও এর ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে। পূর্বে রাজানুগত স্পীকারকে পরিহার করার জন্ম এবং বিশেষজ্ঞের অভাব হেতু সমস্ত সভাই নিজেকে কমিটিতে পরিণত করত। স্থায়ী কমিটি চালু হওয়ার পর থেকে সমগ্র সভার কমিটির গুরুত্ব অনেক কমে গিয়েছে। বর্তমানে অর্থবিল, সাময়িক নির্দেশ (provisional orders) সংক্রান্ত বিল এবং কমন্সসভার বিবেচনায় নির্ধারিত কোন বিল—এই তিন শ্রেণীর বিলের আলোচনা এই কমিটিতে করা হয়ে থাকে। সমগ্র কমন্সসভার সদস্যদের নিয়ে এই কমিটি গঠিত; শুধু স্পীকারের বদলে অন্য একজন ব্যক্তি সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। এই কমিটিতে প্রত্যেকে অবাধে আলোচনা ও বক্তৃতা করতে পারেন। যখন যে বিষয়ে আলোচনা হয় কমিটি তখন সেই নামে অভিহিত হয়। যেমন, Committee of Ways & Means, Committee of supply ইত্যাদি।

কমিটি পর্যায় অতিক্রান্ত হবার পর আসে রিপোর্ট পর্যায় (Report Stage)। যদি সমগ্র কক্ষের কমিটি থেকে বিনা সংশোধনে কোন বিল পুনরায় প্রেরিত হয়, তাহলে রিপোর্টের প্রয়োজন হয় না। সাধারণতঃ কমিটিগুলিতে যেসব পরিবর্তন প্রয়োজন বলে মনে করা হয়, সেইগুলির একটি বিবৃতি সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি সংসদে পেশ করেন। এই সব সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে তখন তর্ক বিতর্ক চলে। এর পর আসে তৃতীয় পাঠ (Third Reading)। এই পর্যায়ে কেবলমাত্র বিলের ভাষাগত পরিবর্তনের জন্যই প্রস্তাব আনা যেতে পারে। নচেৎ বস্তুগতভাবে বিলটি যেমন আছে সেই ভাবেই বিলটি হয় গ্রহণ নয় পরিবর্তন করতে হবে।

একটি কক্ষে এইভাবে পাঁচটি পর্যায় অতিক্রম করার পর বিলটি অপর কক্ষে প্রেরিত হয়। সেখানেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। পরিশেষে রাজার সম্মতির জন্য বিলটি প্রেরণ করা হয়। শাসনতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী রাজা সাধারণতঃ বিলে ভিটো প্রয়োগ করেন না।

অর্থ বিলগুলির জন্ম বিশেষ রকমের পদ্ধতি রয়েছে। ১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট এ্যাক্টের সংজ্ঞা অনুযায়ী যে সমগ্র সরকারী বিল স্পীকার কর্তৃক অর্থবিল বলে স্বীকৃত হবে এবং যে সব বিলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জড়িত থাকবে সেইগুলিকেই অর্থবিল বলে গণ্য করা হবে—কর স্থাপন, অবলোপ হ্রাস, পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ; সংরক্ষিত তহবিলের ওপর অর্থাদায় বা এই সব অর্থাদায়ের

[illegible] ব্যয়বরাদ্দ; সরকারী অর্থ গ্রহণ, সংরক্ষণ ও হিসাব-পরীক্ষণ; ঋণ-গ্রহণ বা পরিশোধ; এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ। ইংলণ্ডের প্রতিষ্ঠিত শাসনতান্ত্রিক রীতি অনুসারে সমস্ত অর্থবিল কমন্সসভাতেই প্রথম উত্থাপিত হয়। তবে মন্ত্রিপরিষদের তরফে রাজাদেশ ছাড়া নিজস্ব উদ্যোগে কমন্সসভা কোন অর্থসংক্রান্ত প্রস্তাব নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। অর্থবিলের ওপর কমন্স সভারই সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব। সৌজন্যবশতঃ লর্ডস সভায় প্রেরিত হলেও, লর্ডসসভার বিরোধিতা সত্ত্বেও কমন্সসভায় যেভাবে পাশ হবে সেইভাবেই অর্থবিলগুলি আইনে পরিণত হয়।

অর্থবিল
Money Bills

সরকার পক্ষ ছাড়া বেসরকারী সভ্যগণও আইনের প্রস্তাব আনতে পারেন। প্রত্যেক অধিবেশনের পূর্বে বেসরকারী সভ্যগণের আনীত প্রস্তাবগুলির একটি তালিকা করা হয় এবং লটারীর মাধ্যমে ঐ সব প্রস্তাবের অগ্রগণ্যতা (Priority) নির্ধারণ করা হয়। তবে সংসদে সরকারী বিলের প্রাচুর্য হেতু এত কাজের চাপ থাকে যে খুব কমসংখ্যক বেসরকারী বিলের ওপরই আলোচনা সম্ভব হয়। সময়ের অভাবে অধিকাংশ বেসরকারী বিল উত্থাপনের সুযোগই ঘটে না। তা সত্ত্বেও যদি কোন সভ্য বিলের প্রস্তাব আনার সৌভাগ্য লাভ করেন, এবং সে বিল যদি জনকল্যাণমূলক হয় এবং সংসদসদস্যরা যে বিলের বিশেষ বিরোধিতা না করে তাহলে এই ধরনের বিল আইনে পরিণত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে আইনপ্রণয়নের পদ্ধতিটি সরকারী বিলেরই অনুরূপ।

বেসরকারী সভ্যের সাধারণ স্বার্থ সংক্রান্ত প্রস্তাব
Private Member Public Bills

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থাসম্পন্ন ইংল্যাণ্ডে আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের একাধিক সমস্যা থাকায় প্রতি অধিবেশনেই সংসদকে বহু বিশেষ স্বার্থসংক্রান্ত বিল নিয়ে আলোচনা করতে হয়। এই বিলগুলি আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন স্বার্থগোষ্ঠীর তরফে আবেদনের আকারে আনীত হয় এবং বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত হয়। সকলের অবগতির জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগে বিলটির কপি পাঠাতে হয় এবং বিজ্ঞপ্তির আকারে বিভিন্ন গেজেট, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করতে হয়। এরপর সংসদের কোন একটি কক্ষে বিল উত্থাপন হলে প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠ শুরু হয়। দ্বিতীয় পাঠের পর কোন বিরোধিতা না হলে বিলটি অবিরোধমূলক কমিটিতে এবং বিরোধিতা

বিশেষ স্বার্থ সংক্রান্ত বিল
Private Bills

হয়ে [illegible] কমিটিতে প্রেরিত হয়। সেখানে বিলটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষিত হয়, সংশ্লিষ্ট স্বার্থগোষ্ঠীর বক্তব্য ও সাক্ষ্য শ্রবণ করা হয়, সরকারী বিভাগগুলির মন্তব্য অবধারণ করা হয় এবং সব কিছু আইনজ্ঞদের দিয়ে যাচাই করে নেওয়া হয়। এরপর বিলটি গ্রহণ করা উচিত বা অনুচিত সে বিষয়ে কমিটি একটি বিবৃতি প্রস্তুত করে সভায় পেশ করলে সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতে বিলটি আইনে পরিণত হয় বা পরিত্যক্ত হয়। এবিষয়ে কমিটির সিদ্ধান্তই সংসদে বিনা বিরোধে গৃহীত হয়ে থাকে।

অর্থসংস্থানের ওপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ (Parliamentary Control over Finance) :

সরকারী অর্থসংস্থানের ওপর সংসদের নিয়ন্ত্রণের অর্থই হল কমন্সসভার অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব। কারণ অর্থবিলের ব্যাপারে লর্ডস সভার নিজস্ব মতামত প্রকাশ বা উদ্যোগ গ্রহণের কোন সুযোগ নাই। সমস্ত অর্থবিল কমন্সসভাতেই প্রস্তাবিত হয় এবং লর্ডস সভার সম্মতি থাক বা না থাক, অর্থবিলগুলি কমন্স সভায় যেভাবে গৃহীত হয় সেইভাবেই আইনে পরিণত হয়। সরকারী অর্থ সংস্থানের ওপর কমন্সসভা চারটি উপায়ে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে: (১) করনীতি নিরূপণ, (২) অর্থাদায় অনুমোদন, (৩) আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষণ এবং (৪) সরকারী তহবিলের ব্যয়পদ্ধতির সমালোচনা।

বার্ষিক বাজেট
Annual Budget

প্রতিবৎসরের গোড়ার দিকে সরকারী তরফে একটি আয়-ব্যয়ের হিসাব বা Budget কমন্সসভায় পেশ করা হয়। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের হিসাব সংক্রান্ত বিবৃতির ওপর নির্ভর করে মন্ত্রিপরিষদ এই বাজেট প্রস্তুত করে। কমন্সসভায় পেশ করার পর, সমগ্র সভার ব্যয়বরাদ্দ কমিটি (Committee of the whole House in Supply) হিসাবে বাজেটের ব্যয়সূচী সম্পর্কে এবং উপায় নির্ধারণী কমিটি হিসাবে (Committee of the whole House in Ways and Means) বাজেটের রাজস্ব আদায় সম্পর্কে আলোচনা করে, এছাড়া ২৮ জন সভ্য নিয়ে গঠিত একটি হিসাব কমিটি (Estimates Committee) বাজেটের হিসাব পরীক্ষা করে দেখেন এবং ব্যয়সঙ্কোচ সম্পর্কে সুপারিশ করেন। কমিটিগুলির রিপোর্টের ভিত্তিতে কমন্সসভায় বিতর্ক অন্তে অর্থাদায় আইন (Appropriation Act) ও রাজস্ব আইন (Finance Act) পাশ করা হয়। প্রথমটির দ্বারা ব্যয়বরাদ্দ এবং দ্বিতীয়টির দ্বারা রাজস্ব আদায় অনুমোদিত হয়।

সরকারী তহবিল থেকে খরচের জন্য অর্থাদায় আইন পাশ করা ছাড়া কোন ব্যয়বরাদ্দ হতে পারে না। তবে জাতীয় ঋণের সুদ প্রদান, রাজ-পরিবারের ভাতা, এবং বিচারকদের বেতন সংসদীয় ভোটাভুটি থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। এইগুলি সংরক্ষিত তহবিল থেকে খরচ করা হয়। কমন্সসভা সাধারণতঃ নিজ উদ্যোগে কোন ব্যয়বরাদ্দের জন্য অর্থাদায় আইন পাশ করে না। মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে রাজাদেশেই এইসব আইন করা হয়। Erskine May তাই বলেছেন, "রাজা অর্থ দাবী করেন, কমন্সসভা সেই দাবী মঞ্জুর করে এবং লর্ডস সভায় তা অনুমোদিত হয়।"[৪] এই নিয়মের অর্থ হল সমস্ত অর্থবিল সরকার পক্ষ থেকেই উত্থাপিত হয়। মন্ত্রিসভার বহির্ভূত সদস্যগণের এ বিষয়ে সমালোচনা করা বা ব্যয় হ্রাস করার প্রস্তাব আনা ছাড়া অন্য কোন ক্ষমতা নাই।

অর্থাদায়
Appropriation

কমন্সসভা সরকারী হিসাব পরীক্ষণের ব্যাপারেও বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল ব্যয়বরাদ্দ বিষয়ে যে সমস্ত মন্তব্য করেন কমন্সসভায় তা বিশদভাবে আলোচিত হয়। এছাড়া হিসাব কমিটিতে (Public Accounts Committee) সামগ্রিকভাবে আর্থিক হিসাবনিকাশের বৈধতা পরীক্ষা করে দেখা হয়। বিতর্ক ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সরকারী ব্যয়নির্বাহ পদ্ধতির সমালোচনা সভার অন্যতম কর্তব্য।

হিসাব পরীক্ষণ
Scrutiny of Accounts

ব্রিটিশ অর্থব্যবস্থার একটি বিরাট গুণ হল এর অবিচ্ছিন্ন ঐকিকতা। সমস্ত কর প্রস্তাব এবং ব্যয়বরাদ্দের দাবী একমাত্র সরকারী তরফ থেকেই উত্থাপিত হওয়ার পদ্ধতি চালু থাকায় আঞ্চলিক বা সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-প্রণোদিত কোন অর্থাদায় হওয়ার সুযোগ নাই। আবার কমন্সসভাই সমগ্রভাবে দুটি বিভিন্ন ক্ষমতায় রাজস্ব আদায় ও ব্যয়বরাদ্দের আলোচনা করে থাকে বলে উভয়ের মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা হয়। মন্ত্রিগণও কমন্সসভায় অর্থবিলের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। এই সমস্ত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও

ব্রিটিশ অর্থ ব্যবস্থার গুণাগুণ
Pros and cons of the British financial procedure

---

৪ "The Crown demands money, the Commons grant it and the Lords assent to the grant; but the commons do not vote money unless it is required by the Crown." E. May.

একথা স্বীকার করতেই হবে যে সরকারের ওপর কমন্সসভার আর্থিক নিয়ন্ত্রণের পরিসর ও কার্যকারিতা ক্রমশঃই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। সমগ্র কক্ষের কমিটির সংখ্যাধিক্য হেতু আয়-ব্যয়ের প্রস্তাবগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। বাজেটের বহুবিস্তারিত অনুচ্ছেদগুলি এত জটিল যে সাধারণ সভ্যের পক্ষে সহজে বোধগম্য হওয়া খুবই কঠিন। এ ছাড়া, দলীয় সংগঠনের দৃঢ়তা এবং মন্ত্রিপরিষদের কমন্সসভা ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা কমন্সসভার কর্তৃত্বকে বহুল পরিমানে খর্ব করেছে।

বিরোধীদলের ভূমিকা (Role of the Opposition) ঃ

সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিকতা রক্ষার অন্যতম ভিত্তি হল বিরোধী-দলের অস্তিত্ব। একদলীয় শাসনব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানগতভাবে সংসদের অস্তিত্ব থাকলেও সরকারের ওপর গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের কোন সুযোগ থাকে না। সংসদের প্রধান কাজই হল সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করা ও তার কাজকর্মের সমালোচনা করা। দলনির্ভর প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনে এইভাবেই গণতান্ত্রিক সুস্থ পরিবেশ গড়ে ওঠে। গ্রেটব্রিটেনে এই কারণে বিরোধীদলের প্রভূত মর্যাদা। বিরোধীদলের অভিধাই হল 'রাজার বিরোধীদল' (His Majesty's Opposition)। সরকারী দলের প্রধানমন্ত্রীর মত বিরোধীদলের নেতাকেও বেতন দেওয়া হয়। কারণ সরকারপক্ষ থেকে বিরোধীদলের মর্যাদা কোন অংশে কম নয়, বরং পারস্পরিক স্বীকৃতির ভিত্তিতেই উভয়ের অস্তিত্ব। যতদিন জনগণের আস্থা থাকে ততদিন বিরোধীদল সংখ্যাগরিষ্ঠদলকে খোলাখুলিভাবে ও ন্যায়সঙ্গতভাবে শাসন করে যেতে দেয়; পক্ষান্তরে ক্ষমতাসীন দল বিরোধীদল কর্তৃক তার কাজকর্মের সমালোচনা করার অধিকার স্বীকার করে নেয়।

বিরোধীদলের মর্যাদা
Status of the Opposition

কমন্সসভায় বিরোধীদলের অস্তিত্বের একাধিক উপযোগিতা রয়েছে। প্রথমতঃ ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় এইভাবেই সরকারী পর্যায়ে দুর্নীতি, অক্ষমতা ও ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিরোধীদলের অস্তিত্বই সরকারকে অন্যায়, অবিচার এবং দায়িত্বহীনতা থেকে নিবারিত করে। ক্রমবর্ধমান আমলাতন্ত্রের প্রভাবে মন্ত্রিপরিষদ যাতে নামসর্বস্ব শাসক-গোষ্ঠীতে পরিণত না হয় সে বিষয়েও বিরোধীদল লক্ষ্য রাখে।

সরকারের সংশোধন ব্যবস্থা
Corrective of the Government

দ্বিতীয়তঃ, বিরোধীদলের নির্বাচনী তাৎপর্যও অসামান্য। যদিও কমন্স-সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে মন্ত্রিপরিষদ নিজের জয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত থাকে, তবু আগামী নির্বাচনের পটভূমিকায় বিরোধীদলের কার্যকলাপ মন্ত্রিপরিষদকে সদা সশঙ্ক রাখে। কমন্স-সভায় বিরোধীদলের সমালোচনা ও বিতর্কের উদ্দেশ্য এই নয় যে সরকারের সমর্থক সভ্যদের প্রভাবিত করে সরকারের পতন ঘটানো; বরং অব্যবস্থিতচিত্ত সভ্যদের স্বপক্ষে আনয়ন এবং জনচিত্তে সরকারের সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা সৃষ্টিই বিরোধীদলের প্রধান উদ্দেশ্য। এজন্য কমন্সসভাকে বিরোধীদলের বক্তব্য প্রচারের প্রধান মঞ্চ বলা যেতে পারে। এইভাবে গ্রেটব্রিটেনে সদাসর্বদাই একটা নির্বাচনী অভিযান চলছে। বিশেষতঃ, একটি সংসদের কার্যকাল শেষ হওয়ার পর পুনর্নির্বাচনের জন্য তিনমাসের অন্তর্বর্তীকাল অত্যন্ত অল্প সময় বলে সর্বদাই প্রত্যেক বিষয়ে বিরোধীদল সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরার চেষ্টা করে। এজন্য বলা হয় যে, সরকারপক্ষকে বিরোধীদল সব সময় ছায়ার মত অনুসরণ করে কিভাবে কোন্ দুর্বল মুহূর্তে তার পতন ঘটানো যায় সেই উদ্দেশ্যে।[9]

নির্বাচনী তাৎপর্য
Electoral significance

ক্ষমতাদখলের প্রস্তুতি ছাড়াও, বিরোধীদলের সমালোচকদের ভূমিকায় ক্ষমতাসীন সরকারকে সর্বদা অস্বস্তির মধ্যে থাকতে হয়। কমন্সসভায় বিতর্কের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা সরকারকে সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে বাধ্য করে। প্রায়ই বিরোধীদলের সমালোচনা হেতু আইনের প্রস্তাবসমূহের সংশোধন করতে হয়েছে (যেমন, Incitement to Defection Bill, 1934)। বিশেষ করে প্রশ্নোত্তরের সময় বিরোধীদল বিশেষভাবে চেষ্টা করে সরকারের কার্যকলাপের দুর্বল স্থানগুলি আবিষ্কার করার। প্রতিদিনের এই আক্রমণের ফলে মন্ত্রিপরিষদ আপনা থেকেই ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের চেষ্টা করে। Corry তাই বলেছেন, সরকারকে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিদিনই ক্ষমতার লড়াই-এর প্রয়োজন হয় না; বিরোধীদল যে রয়েছে, এই চেতনাই সরকারকে সঠিক পথে চালিত করে।[10]

সমালোচকের ভূমিকা
Critical Role

9 "The opposition follows the Cabinet like a shadow ready to replace it at any weak juncture".

10 "...it is not the repeated trial of strength between the horse and the fence that keeps the horse in pasture but that the fence is there and the horse knows it."

সরকার ও বিরোধীদলের সম্পর্কের আর একটি দিকও রয়েছে ; সেটি সহযোগিতার দিক। সাংবিধানিক মূল রীতিনীতি সম্বন্ধে সাধারণ মতৈক্য ছাড়াও সরকার পক্ষকে অনেক সময় বিরোধীদলের পরামর্শ গ্রহণ করতে হয়। বিশেষ বৈদেশিক ব্যাপারে জাতি যাতে পরস্পরবিরোধী মত পোষণ না করে সে জন্য গোপন চুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে সরকার ও বিরোধীদলের মধ্যে একটা বোঝাপড়া থাকে, নচেৎ পরবর্তী নির্বাচনে বিরোধীদল ক্ষমতালাভ করলে ঐ সব চুক্তি বানচাল হয়ে যেতে পারে। আভ্যন্তরীণ বিষয়েও সঙ্কটকালে বিরোধীদলের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়। গত ত্রিশ দশকের আর্থিক সঙ্কট ও দুটি বিশ্বযুদ্ধের সময় সম্মিলিত মন্ত্রিসভার কার্যকলাপ (Coalition ministry) এর উদাহরণ। এছাড়া কমন্সসভায় প্রস্তাবিত বিল লর্ডস সভায় পাশ না হলে সরকার ও বিরোধীদলের মিলিত প্রচেষ্টায় বিলটি পরপর তিনটি অধিবেশনে পাশ করিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। সুতরাং বিরোধিতা ও সহযোগিতা উভয় ক্ষেত্রেই সংসদীয় বিরোধীদলের গুরুত্ব অপরিসীম।

সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা
Co-operation with the Government

বিবিধ আলোচনা

ক. প্রশাসন ব্যবস্থা (Civil Service)

সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার জন্য বর্তমান যুগে জনগণের রাজনৈতিক প্রতিনিধি স্থানীয় মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে আরও একটি সংগঠন অপরিহার্যভাবে সংলগ্ন হয়ে পড়েছে : সেটি হল আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা। মন্ত্রিগণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত। নির্বাচনে জয়লাভ করে তাঁরা শাসনকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজনৈতিক দূরদর্শিতা থাকলেও তাঁদের প্রশাসন দক্ষতা কদাচিৎ দেখা যায়। তদুপরি, নির্বাচন-নির্ভর দলীয় শাসনে তাঁদের স্থায়িত্ব বা কার্যকালের মেয়াদও সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। এই জন্য বিশেষভাবে শিক্ষণপ্রাপ্ত সুদক্ষ এবং স্থায়ী একদল কর্মচারীর হাতে দেশের কার্যকরী শাসনভার ন্যস্ত থাকে। মন্ত্রিগণ শাসনকার্যে প্রযোজ্য মূলনীতিগুলির রূপরেখা স্থির করে দেন ; প্রশাসন বিভাগ সেগুলিকে বিশদ করে নিয়ে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। বিভিন্ন প্রশাসন বিভাগগুলির ঊর্ধ্বে আছেন

মন্ত্রিপরিষদ ও প্রশাসন বিভাগ
Civil Service and the Ministry

কর্তৃত্বপদ থাকে এক একজন মন্ত্রীর। কিন্তু মন্ত্রিদের মেয়াদ অস্থায়ী হওয়ায় কোন্ দল মন্ত্রিত্বে থাকবে সে বিষয়ে স্থিরতা থাকে না। প্রশাসন বিভাগের কর্মচারীদের তাই রাজনৈতিক দলমত নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হয়। যে দলই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করুক না কেন প্রশাসন কর্তৃপক্ষ তার প্রতি সমান আনুগত্য প্রদর্শন করে। এইভাবে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত একদল কর্মচারী স্থায়ীভাবে শাসনের প্রয়োগপদ্ধতি পরিচালনা করে যে অসামান্য অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা লাভ করে, রাজনৈতিক নেতা হিসাবে নানাকাজে ব্যাপৃত থাকায় মন্ত্রিদের সে নৈপুণ্য থাকে না। অথচ রাজনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকায় মন্ত্রিগণ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পরিচিত থাকেন। তাছাড়া কাজ করার ফলে প্রশাসনিক কর্মীদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর যে সঙ্কীর্ণতা জন্মায় মন্ত্রীরা তার থেকে মুক্ত থাকেন। সর্বোপরি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে সংসদের নিকট পরিপূর্ণ দায়িত্ব থাকায়, মন্ত্রিগণই প্রশাসন বিভাগের উর্ধ্বে থেকে শাসন পরিচালনার সাধারণ সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেন। এই কাজে উপযুক্ত তথ্যাদি সরবরাহ ক'রে ও পরামর্শ দিয়ে প্রশাসন বিভাগ তাঁদের সহায়তা করে এবং আপন দক্ষতা অনুসারে সেই সব সিদ্ধান্তকে কার্যে পরিণত করে। এইভাবে গণতন্ত্রে দায়িত্ব ও দক্ষতার মিলন ঘটে।[1]

শাসন ব্যবস্থায় প্রশাসনবিভাগের এই ভূমিকা থেকে ব্রিটিশ প্রশাসন-বিভাগের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সহজেই অনুমান করা যায়; যেমন, স্থায়ী কার্য-কাল, রাজনীতি-নিরপেক্ষতা, আনুগত্যের স্থিতিস্থাপকতা ইত্যাদি। প্রশাসনিক কর্মচারীগণ প্রধানতঃ এই কাজগুলি করে থাকেন: (১) শাসন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিভিন্ন তথ্য ও দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতাপ্রসূত পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করা, (২) সংসদে গৃহীত আইনসমূহকে কার্যকরী করা, (৩) বৈশেষিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রয়োজনে আইনের রূপরেখা অবলম্বন করে আইনকে বিশদ করা ও আইনের ফাঁক পূরণ করা এবং (৪) সমগ্র শাসন ব্যবস্থায় একটা নৈর্ব্যক্তিক পক্ষপাতশূন্যতার আবহাওয়ার সৃষ্টি করা যাতে করে ব্যক্তিগত ইচ্ছার বদলে নিয়মকানুন অনুযায়ী সমস্ত কাজ চলতে পারে।

ইংল্যাণ্ডে প্রশাসন বিভাগ
Civil Service in England

---

1 অধ্যাপক Munro তাই বলেছেন, "Both are essential: one of them makes a government popular; the other makes it efficient. And the test of a good government is its successful combination of democracy with efficiency."

পূর্বে ইংল্যাণ্ডের প্রশাসন ব্যবস্থাটি সুসংগঠিত ছিলনা। সরকারে পৃষ্ঠপোষকতা দেশের অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা বিভিন্ন রাজদায়িত্বে নিযুক্ত হত। এর ফলে শ্রেণীগত বৈষম্য ছাড়াও নানাধরণের অযোগ্যতা, ত্রুটিবিচ্যুতি ও দুর্নীতি দেখা দেয়। ফলে ১৮৫৫ সালে একটি Order-in-Council এর বলে তিনজন সদস্য নিয়ে একটি জন-কৃত্যক সমিতি (Public Service Commission) গঠন করা হয়। এই সমীতির অবেক্ষাধীনে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশাসন বিভাগের কর্মীদের নিয়োগ করা হয়। সরকার ও সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয় বিভিন্ন হুইটালি কাউন্সিলের মাধ্যমে। সরকারী কর্মচারীদের কার্যকাল, পদোন্নতি, স্থানান্তর অবৈধ আচরণের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন সম্বন্ধেও কাউন্সিল কর্তৃক স্থিরীকৃত নিয়ম-নির্দেশ অনুসারেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সাধারণতঃ অসাদাচরণ ও দক্ষতার অভাব ছাড়া কর্মচারীদের পদচ্যুত করা হয় না।

যদিও ইংল্যাণ্ডে গণতন্ত্রের সঙ্গে আমলাতন্ত্রের একটি সংমিশ্রণ হয়েছে, তা সত্ত্বেও বর্তমানে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবণতা আমলাতন্ত্রেরই প্রাধান্য সূচনা করে। আধুনিক সরকারের কাজকর্মের ব্যাপকতা ও জটিলতার দরুণ স্বাভাবিকভাবেই দক্ষ ব্যক্তিদের কর্তৃত্ব প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রথমতঃ, বিভিন্ন সরকারী বিভাগের (বৈদেশিকসম্পর্ক, স্বরাষ্ট্র, রাজকোষ, ঔপনিবেশিক সম্পর্ক ইত্যাদি) এবং অন্যান্য জনকল্যান মূলক সরকারী প্রতিষ্ঠানের (যেমন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যমন্ত্রক, সামাজিকনিরাপত্তা ব্যবস্থা, ব্যবসায় উদ্যোগ ইত্যাদি) অসংখ্য সমস্যা কোন মন্ত্রীর পক্ষেই অন্যের সাহায্য ছাড়া একা সমাধান করা সম্ভব নয়।

ইংল্যাণ্ডে আমলাতন্ত্রের আশঙ্কা
Apprehension of bureaucratic government in England

এই সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারে দক্ষ প্রশাসনিক কর্মীদের দায়িত্ব দেওয়া ছাড়া উপায় নাই ; অথচ বিভিন্ন খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাঁরা যে ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন সেইগুলি ক্রমশঃ নজীর হিসাবে সাধারণ নীতিতে রূপান্তরিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, অর্পিত আইনপ্রণয়ের ক্ষমতা (power of delegated legislation) প্রশাসন বিভাগের একটি প্রধান কাজ। সংসদে গৃহীত আইনের রূপরেখাগুলিকে স্পষ্ট, বিশদ ও সম্পূর্ণ করা, মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া এবং সেগুলিকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করার দায়িত্ব প্রশাসন বিভাগের। এছাড়াও, আইন-প্রস্তাবের খসড়া রচনার প্রাথমিক ক্ষেত্রেই প্রশাসনিক কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে থাকেন। যদিও সমগ্র আইনগত ব্যবস্থার জন্য বিভাগীয় মন্ত্রীই সর্বতোভাবে সংসদের কাছে

দায়ী থাকেন, তবু একথা স্বীকার করতেই হবে যে ঐ সব আইনের প্রস্তাব রচনা ও শব্দান্বিত করে প্রশাসন বিভাগ। তৃতীয়তঃ সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়াও, সংসদে প্রশ্নোত্তর কালে মন্ত্রীগণ জবাবদিহি করার সময় সংশ্লিষ্ট বিভাগের সচিবদের উপরই নির্ভর করেন। এ বিষয়ে শুধু তথ্যাদি সরবরাহ নয়, মন্ত্রিদের বক্তৃতার বয়ানও প্রশাসন কর্মীরা রচনা করে দেন। এই দিক থেকে মন্ত্রীদের অনেকে প্রশাসন বিভাগের মুখপাত্র বলে মনে করেন।

শাসনব্যবস্থার প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের এই ক্রমাম্বয়ী অনুপ্রবেশের ফলে সংবিধান বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করেন যে ইংল্যাণ্ডে মন্ত্রিসভার দায়িত্বের আড়ালে আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য বিস্তারলাভ করছে।[1] কিন্তু এই আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক না হলেও এ নিয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নাই। কারণ, মন্ত্রিদের প্রশাসনিক দক্ষতার অভাব এবং আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরতাকে গণতন্ত্র-বিরোধী বলে মনে করলে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার মূল সত্যটি সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করা হবে। সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রিদের বিভাগীয় সমুদয় খুঁটিনাটি সম্পর্কে পারদর্শী হওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। মন্ত্রিপদের রাজনৈতিক প্রকৃতি, অসীম ব্যস্ততা, অস্থায়ী মেয়াদ ও দলীয় আনুগত্যের জন্যেই এটা সম্ভব নয়। তাছাড়া, প্রশাসনবিভাগ ছাড়াও দক্ষ পরামর্শের জন্য মন্ত্রিরা অন্যান্য উৎসেরও সন্ধান করতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক ও পরিসংখ্যান উপদেষ্টা, আইনজ্ঞ, এ্যাডহক কমিটি ও বিভিন্ন কমিশন রয়েছে। সর্বোপরি জনমতই মন্ত্রিগণের কর্মধারার প্রধান পথ-নির্দেশক হিসেবে কাজ করে।

অধিকন্তু, কার্যতঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ে মন্ত্রিসভার পক্ষে শাসন কৃত্যকের পরামর্শ গ্রহণেরও কোন প্রয়োজন নাই, যদিও তথ্যাদির জন্য তার উপর কিছুটা নির্ভর করতে হয়। আসলে শাসন-পরিচালনার সমস্ত সাধারণ নীতিই মন্ত্রিপরিষদের গোপন বৈঠকে স্থিরীকৃত হয়ে যায় এবং এই বৈঠকে আমলাতন্ত্র-প্রদর্শিত নিয়মের খুঁটিনাটির বদলে রাজনৈতিক স্বার্থচিন্তাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। তাই মন্ত্রিরা যখন কোন প্রস্তাবের সমর্থনে সংসদে বক্তৃতা দেন বা সংসদ সভ্যদের প্রশ্নের জবাব দেন, তখন তাঁদের ইচ্ছামত মত প্রকাশ করার কোন বাধা নাই। অবশ্য সবকিছু নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধির

---

1 "In England bureaucracy thrives under the cloak of ministerial responsibility"—R. Muir. অধ্যাপক Laski ও এ বিষয়ে একমত: "Parliment is a tool in the hands of the ministers and the ministers a tool in the hands of the permanent officials".

ওপর। চার্চিল বা এ্যাণ্টনী ইডেনের মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মন্ত্রিগণ অনায়াসেই আমলাতন্ত্রকে কড়া নির্দেশের দ্বারা পরিচালনা করতে পারেন। সুতরাং ব্রিটেনে যে আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য বেড়েই চলছে এ অভিযোগ কিছুটা অতিরঞ্জিত।

(খ) ব্রিটেনের বিচারব্যবস্থা (The British Judicial System):

দেশে আইনের প্রাধান্য, শাসনের নিরপেক্ষতা এবং ব্যক্তির স্বাধিকার সংরক্ষণের জন্য অন্যান্য দেশের মত ইংল্যাণ্ডেও একটি সুসংগঠিত বিচারব্যবস্থা রয়েছে। সাধারণভাবে অন্যান্যদেশের ন্যায়াধিকরণের সঙ্গে তুলনীয় হলেও, ইংল্যাণ্ডের বিচার ব্যবস্থার কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য : Independence of the Judiciary

প্রথমতঃ, ইংল্যাণ্ডে বিচার-সংগঠনকে অন্যান্য শাসন-বিভাগের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা হয়েছে। ১৭০১ সালের এ্যাক্ট অফ সেট্‌লমেণ্টে বলা হয়েছে যে যতদিন না অসদাচরণের অভিযোগ আসছে ততদিন বিচারপতিরা কাজ করবেন, কার্যপালিকা বিভাগের ইচ্ছার উপর তাঁদের মেয়াদ নির্ভর করে না। এ ছাড়া বিচারকদের বেতন ও ভাতাসমূহ সংরক্ষিত তহবিল-যা সংসদীয় ভোটাভুটির বাইরে—তার থেকে দেওয়া হয়। এই সমস্ত সাংবিধানিক সংরক্ষণের সঙ্গে ব্রিটিশ জাতির আইনানুগ ঐতিহ্য মিশে বিচার-বিভাগকে একটি অভিনব মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করেছে।

আইনসমীক্ষার অনুপস্থিতি Absence of Judicial Review

দ্বিতীয়তঃ, ব্রিটিশ বিচার সংগঠনের বিভিন্ন ক্ষমতার মধ্যে আইনসমীক্ষার অনুপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আইনসমূহের বৈধতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার বিচারবিভাগের আছে। ইংল্যাণ্ডে সংসদীয় সার্বভৌমত্বের ধারণাটি এত সুপ্রতিষ্ঠিত যে সেখানে সংসদের আইনেরই চরম কর্তৃত্ব। তাই বিচারবিভাগের আইন সমীক্ষার কোন অধিকার নাই। সংসদ ইচ্ছামত আইনপ্রণয়ন করতে পারে।

প্রশাসনবিভাগীয় বিচারালয় নাই No Administrative Courts.

তৃতীয়তঃ, প্রশাসনবিভাগীয় কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমূহের জন্য ইংল্যাণ্ডে আলাদা ভাবে কোন প্রশাসন-বিভাগীয় বিচার-পরিষদ নাই। ফ্রান্সে এই উদ্দেশ্যে সাধারণ বিচারালয় ছাড়াও প্রশাসনবিভাগীয় বিচারালয় রয়েছে। ইংল্যাণ্ডে রাজকর্মচারীদের সংশ্লিষ্ট সমস্ত অভিযোগের সাধারণ বিচারালয়েই বিচার হয়ে থাকে। পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকলের পক্ষেই এই নিয়ম [illegible]

চতুর্থতঃ, অলিখিত সংবিধানের দেশ গ্রেটব্রিটেনে নাগরিকদের মূলগত অধিকারগুলি অন্যান্য দেশের মত সুস্পষ্টভাবে বিধিবদ্ধ নয়। তৎসত্ত্বেও নাগরিকদের অধিকারসমূহ সংরক্ষণের ব্যাপারে বিচারালয় অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে। বিচারকবৃন্দ জন-অধিকার রক্ষার জন্য সরকারের বিরুদ্ধেও রায় দিতে দ্বিধাবোধ করেন নি। অবশ্য কোন কোন সময় সংসদীয় আইনবলেই গণঅধিকার সঙ্কুচিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে নিরুপায় হলেও সাধারণ অবস্থায় বিচারবিভাগ আপন কর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে।

ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণ
Safeguards for individual liberties

পঞ্চমতঃ, আইন সংক্রান্ত খুঁটিনাটি ছাড়াও সাধারণ বাস্তববোধ অনেক-ক্ষেত্রেই জটিল সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে। এই উদ্দেশ্যেই ব্রিটেনে জুরী প্রথার প্রবর্তন হয়েছে। সমাজের গণ্যমান্য শিক্ষিত সম্প্রদায় থেকে মনোনীত জুরীদের মতামত অনেকসময় বিচারকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেছে এবং তারফলে আইনের ফাঁকে প্রকৃতদোষীর অব্যাহতি লাভ বা আইনের জটিলতায় নির্দোষের শাস্তিলাভের সম্ভাবনা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া ইংল্যাণ্ডে সলিসিটর ও ব্যারিষ্টর এই দুই শ্রেণীর আইন-ব্যবসায়ী থাকায় বিচারকার্য নিপুণ ও দ্রুত সম্পন্ন হতে পারে। সলিসিটরগণ মক্কেলের তরফে মামলা নথাভুক্ত করেন এবং ব্যারিষ্টরগণ বিচারালয়ে তার ভিত্তিতে যুক্তির অবতারণা করেন।

জুরী ব্যবস্থা
Jury System

ষষ্ঠতঃ, সমগ্র বিচারব্যবস্থার পূর্বধারণা (Presupposition) হল আইনের অনুশাসন। ডাইসীর ভাষ্য অনুযায়ী এর তিনটি অর্থ—(১) সংসদীয় ও প্রথাগত আইন ইংল্যাণ্ডে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ; (২) আইনের চোখে পদমর্যাদানির্বিশেষে সকলেই সমান ; (৩) সাধারণের অধিকার সাধারণ আইনদ্বারাই সংরক্ষিত। একথা অবশ্য সত্য যে আইনের অনুশাসনের কতকগুলি ব্যতিক্রমও রয়েছে—যেমন, রাজা ও রাজকর্মচারীদের বিশেষ নিরাপত্তাধিকার (Immunities), জনশৃঙ্খলা আইনের (Public Order Act of 1936) বলে সভাসমিতির উপর নিষেধাজ্ঞার সম্ভাবনা, রাজাদেশে নিয়োগচুক্তি (Contract of Service) বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা, ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে সংসদীয় সার্বভৌমিকতার ভিত্তি জনসমর্থনের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকায় এবং বিচার-

আইনের অনুশাসন
Rule of Law

বিভাগের অতন্দ্র দৃষ্টি থাকাতেই ইংল্যাণ্ডে নাগরিক অধিকারগুলি অক্ষুণ্ণ আছে।

ইংল্যাণ্ডে বিচারবিভাগের দুটি শাখা—ফৌজদারী ও দেওয়ানী। রাষ্ট্র-বিরোধী বা সমাজবিরোধী কার্যকলাপের জন্য শাস্তি প্রদানের অধিকার ফৌজদারী আদালতের। এই ধরণের সমস্ত অভিযোগে রাজা বা রাণীর নামে (অর্থাৎ রাষ্ট্রের তরফে) সংশ্লিষ্ট আসামীর বিরুদ্ধে আনীত হয়। পক্ষান্তরে দেওয়ানী আদালতে ব্যক্তিগত অধিকার দাবীদাওয়া বা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদের প্রতিবিধান করা হয়ে থাকে।

বিচাবসংগঠন
Organisation of the Judiciary

ফৌজদারী বিচারব্যবস্থার সর্বনিম্ন পর্যায় হল ছোট দায়রা আদালত বা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত। এর উর্দ্ধে রয়েছে ত্রৈমাসিক আদালত (Quarter Sessions)। নিম্নতম আদালত থেকে এখানে আপীল করা হয়। এ ছাড়া কতকগুলি কম গুরুত্বপূর্ণ অপরাধের সরাসরি বিচারও এই আদালত করে থাকে। কিন্তু প্রাণদণ্ড বা আজীবন কারাদণ্ড দেওয়া চলে এমন অভিযোগের বিচার এখানে হয় না। গুরুতর অপরাধ মাত্রই Assizes বা সাময়িক ভ্রাম্যমাণ আদালতে প্রেরণ করা হয়। দেশের বিভিন্নস্থানে বৎসরের বিভিন্ন সময় এই আদালতের অধিবেশন বসে। উদাহরণস্বরূপ ওল্ড বেইলীর ফৌজদারী আদালতে লণ্ডন, মিড্‌লসেক্স ও হোম কাউন্টি একাংশের জন্য এইধরণের কাজ করে থাকে। এই আদলত থেকেও অপীলসমূহ উর্ধ্বতন আপীল আদালতে প্রেরণ করা যায়। সেখানে রাজা বা রাণীর বিচার পর্বতের (The King's or Queen's Bench division) বিচারকবৃন্দ এবং দেশের প্রধান বিচারপতি (Lord Chief Justice) বিচারকের আসন গ্রহণ করে থাকেন। সর্বশেষে আটর্ণী জেনারেলের অনুমতি প্রাপ্ত হলে সর্বোচ্চ আপীলের জন্য লর্ডসভার দ্বারস্থ হওয়া চলে।

অনুরূপভাবে, দেওয়ানী বিচারের জন্য সর্বনিম্ন আদালত হল কাউন্টি আদালত (Conuty Courts)। অপেক্ষাকৃত কমপরিমাণ অর্থের দাবিদাওয়া সংক্রান্ত বিবাদের বিচার এখানে হয়ে থাকে। এই ধরণের আরও কতকগুলি স্থানীয় আদালত আছে (Borough Courts); যেমন, লণ্ডন সহরের কাউন্টি আদালতের নাম মেয়র ও লণ্ডন সহরের আদালত (The Mayor's & City of London Court)। এই আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের বাইরে বড় বড় দেওয়ানী মামলার বিচারে উর্ধ্বতন বিচারালয়ে (High Court of Justice)

করা হয়ে থাকে। এই উর্ধ্বতন বিচারালয়ের আবার তিনটি অঙ্গ: রাজা বা রাণীর বিচার অর্থাৎ (The King's or the Queen's Bench Division) চ্যান্সারী বিভাগ (The Chancery Division) এবং 'প্রবেট,' বিবাহ বিচ্ছেদ ও নৌবাহিনীর বিভাগ (The Probate, Divorce & Admiralty Division) এই তিনটি বিভাগ থেকে সমুদয় আপীল আবার লর্ড চেন্সেলরের সভাপতিত্বে পাঁচজন বিচারক নিয়ে গঠিত আপিল আদালতে পেশ করা হয়। ফৌজদারী ব্যাপারের মত দেওয়ানী বিবাদেও সর্বশেষ আপীল আদালত হল লর্ড সভা। লর্ড সভার বিচার বিভাগীয় লর্ডরাই এই আদালতে উপস্থিত থাকেন।

এছাড়া, ইংল্যাণ্ডে প্রিভি কৌন্সিলের বিচার কমিটি নামে আরও একটি বিচার সংস্থা আছে (Judicial Committee of the Privy Council)। এই কমিটিতে অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, সিংহল প্রভৃতি কতকগুলি ডমিনিয়ন এবং অন্যান্য উপনিবেশ সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ আইনগত প্রশ্নের মীমাংসা করা হয়।

গ. ইংল্যাণ্ডের দলীয় ব্যবস্থা (Party system in England):

প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে দলীয় ব্যবস্থা একটি অপরিহার্য অঙ্গ। বর্তমান যুগের বিরাট রাষ্ট্রসমূহে জনগণের প্রত্যক্ষ শাসন সম্ভব নয় বলে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রেরিত জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে কিন্তু সুষ্ঠু নির্বাচনের ভিত্তিমূল ব্যক্তিকেন্দ্রিক না হয়ে বিশেষ বিশেষ নীতি-কেন্দ্রিক হওয়া উচিত। রাজনৈতিকদলগুলির নির্বাচনী প্রচার পুস্তিকায় বিভিন্ন আদর্শ ও নীতির উল্লেখ থাকে। জনগণের বিচারে যে দলের নীতি ও আদর্শ সর্বাপেক্ষা গ্রহণীয় বলে মনে হয় সেই দলকেই শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। এছাড়া, রাজনৈতিক দলগুলির দেশব্যাপী বিরাট সংগঠন থাকায় সরকারের বিরোধী বিভিন্ন ভাবধারা ও মতামতের মধ্যে কোনটি গ্রহণ যোগ্য এবং কোনটি বর্জনীয় সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে দলের প্রচার কার্য বিশেষভাবে সহায়তা করে। আবার ক্ষমতাসীন সংসদীয় প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সংসদের বাইরে দলীয় সংগঠনের পার্থক্য থাকায় সরকারের ওপর দলের মাধ্যমে জনমতের চাপ পড়ে। ফলে সংসদীয় সংখ্যা গরিষ্ঠতার দরুণ সরকারপক্ষ স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারে না। সর্বোপরি গণতন্ত্র হল পারস্পরিক সমালোচনা ভিত্তিতে সমন্বয়ের মাধ্যমে

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা
Role of Political parties in a Democracy

শাসন (Democracy is a government by discussion); সুতরাং দলীয় ব্যবহার অস্তিত্ব নির্বাচক মণ্ডলী থেকে শুরু করে সরকারী স্তর পর্যন্ত আলোচনা ও বিতর্কের সুযোগ সৃষ্টি করে। দেশে সরকারী ও বিরোধী উভয় দলের পারস্পরিক আলোচনা ও সমালোচনায় জনকল্যাণমূলক শাসনের বনিয়াদ রচনা হয়ে থাকে।

ইংল্যাণ্ডে দলপ্রথার বিবর্তন
Evolution of the Party System in England

ষ্টুয়ার্ট যুগে রাজা ও সংসদের বিরোধের মধ্যদিয়েই ইংল্যাণ্ডে দলপ্রথার সূত্রপাত হয়েছিল বলা চলে। রাজার সমর্থকদের বলা হত 'Cavaliers' এবং রাজাবিরোধীদের বলা হত 'Round heads'। রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সময় তদীয় ভ্রাতা জেমস যাতে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী না হন সেজন্য এক আন্দোলন শুরু হয় এবং এই মর্মে ১৬৭৯ সালে 'পরিহার প্রস্তাব' বা Exclusion Bill প্রস্তাবিত হয়। এই বিলের সমর্থকবৃন্দ একটি নূতন সংসদ আহ্বাণ করার জন্য রাজা'র কাছে ক্রমাগত আবেদন নিবেদন করায় তাঁদের নাম হল 'আবেদন করী'র দল (Petitioners)। পক্ষান্তরে এই বিলের বিরুদ্ধে যাঁরা রাজার সমর্থক ছিলেন তাদের বলা হত 'অবজ্ঞাকারী' (Abhorrers)। পরে তৃতীয় উলিয়মের সময় এই দুই দল যথাক্রমে Whig ও Tory নামে খ্যাত হয়। ১৮৩২ সালের সংস্কার আইন (Reform act of 1832) পাশ হবার পর দল দুটি নাম পাল্টে রক্ষণশীল (Conservative) এবং উদার নৈতিক (Liberal) নামে পরিচিত হল। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আবার উদারনৈতিক দলের কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠ রক্ষণশীলদলের সঙ্গে যোগ দিলে উদারনৈতিক দল ভোট দিয়ে শ্রমিক দলের সৃষ্টি হল (Labour Party)। প্রথমদিকে দুর্বল থাকলে দুই দশকের মধ্যেই এই নূতন দল শক্তি সংগ্রহ করে এবং ১৯২৪ সালের প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করে।

বিবর্তনের ধারা অনুসারে ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক দল প্রসার যে মূল বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে সেটা হল এদেশের দ্বিদলীয় ব্যবস্থা। মূলতঃ শ্রমিক ও রক্ষণশীল এই দুই দলের মধ্যে প্রতিনিয়ত তীব্র প্রতিদ্বন্দিতা দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি সুন্দর ভারসাম্য রচনা করেছে। দুটি দল থাকায় বিরোধী দল কর্তৃক বিকল্প সরকার গঠনের সম্ভাবনা এত বেশী যে ক্ষমতাসীন সরকারী দল অত্যন্ত সতর্কতা ও সংযমের সংঙ্গে শাসন পরিচালনা করতে বাধ্য হয়। নির্বাচকমণ্ডলীর পক্ষেও দুই দল থাকার সুবিধে এই যে

দ্বিদল ব্যবস্থার সুবিধা
Advantage of Bi-party system

উভয়ের আসল নীতি ও কার্যক্রম বিচার করে ভোট দেওয়ার মধ্যে কোন জটিলতার সৃষ্টি হয় না।

ইংল্যাণ্ডে প্রাচীনতার দিক থেকে অগ্রগণ্য রক্ষণশীল দলের নামটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এই দলের সদস্যগণ সাধারণতঃ অভিজাত, ভূম্যধিকারী, ধর্মযাজক, বড় বড় ব্যবসায়ী, সমরনীতিবিদ প্রভৃতি উচ্চস্তরের সম্প্রদায়ভুক্ত। দেশের কায়েমী স্বার্থগুলির সঙ্গে এই দলের সহানুভূতি সন্দেহাতীত ভাবে প্রতিষ্ঠিত। সময়ে সময়ে শ্রমিক ও কৃষিজীবীগণও এই দলকে সমর্থন করে থাকে বলে দাবী করা হলেও, দাবীটি সর্বাংশে সত্য নয়। এই দলের আদর্শ বা নীতির মূল কথা হল ব্যক্তিগত মালিকানা, প্রতিষ্ঠিত ধর্মসম্প্রদায়, রাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ এবং ভূম্যধিকার ও পুঁজিবাদের সংরক্ষণ। বর্তমানে অবশ্য বিশ্ব রাজনীতি ও জনমতের চাপে পড়ে এবং প্রধানতঃ অর্থনৈতিক স্বার্থসংরক্ষণের জন্য 'নয়াসাম্রাজ্যবাদের' প্রভাবে এই দল উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারে পূর্বতন দৃঢ় মনোভাব অনেকটা শিথিল করতে বাধ্য হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই দলের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও যৌথ প্রতিরক্ষণ ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন থাকলেও অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসাবে সামরিক জোট গঠনে কোন আপত্তি নাই। মোটের উপর যা কিছু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব এবং অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সামরিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখবে তার প্রতিই এইদলের সম্পূর্ণ নির্ভরতা আছে। দলের কমবয়সী সদস্যবৃন্দ এই সমস্ত আইনের প্রণয়ন এবং একযোগে শ্রমিক দলের বিরোধিতা কম্যুনিষ্ট দলের উচ্ছেদের জন্য বিশেষ ভাবে উৎসাহী। এইসব সদস্যের চেষ্টায় ১৯৪৭ সালে Industrial Charter, ১৯৪৯ সালে 'The Right Road for Britain' প্রভৃতি পুস্তিকায় একটি সুনিয়ন্ত্রিত কার্যক্রমের প্রতি সমর্থন জানানো হয়েছে।

রক্ষণশীল দল
Conservative Party

আইনের দিক থেকে দলের সর্বনিম্ন সংস্থা হল স্থানীয় রক্ষণশীল সমিতি (Local Conservative Association)। এই স্থানীয় সংস্থার সভ্যগণ এক একটি কার্যকরী কমিটি নির্বাচন করে এবং সেই কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারেই সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী মনোনয়ন ও নির্বাচন প্রস্তুতি করা হয়। সাধারণতঃ স্থানীয় সভ্যদের চাঁদাতেই এর কাজকর্ম চললেও নির্বাচনের সময় দলের কেন্দ্রীয় মহাকরণ থেকে আর্থিক সাহায্য আসে। দলের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হল এর বার্ষিক অধিবেশন (Annual Conference)। বিভিন্ন স্থানীয় সমিতির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই বার্ষিক অধিবেশনে দলের

বাৎসরিক কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয় এবং দলের বিভিন্ন নেতা [illegible] ব্যক্তিদের উপর অর্পণ করা হয়। তবে দলের সংসদীয় নেতৃত্বের নির্বাচন এই অধিবেশনে হয় না। সংসদীয় দলই তার নেতা নির্বাচন করে নেয়। মোটের ওপর সংসদীয় দলের ওপব সমগ্র দলেব খুব বেশী নিযন্ত্রণ নাই।

ইংল্যাণ্ডের রাজনীতিতে শ্রমিক দলেব আবির্ভাব অপেক্ষাকৃত নূতন। দেশের শ্রমিক সংস্থাগুলির সমন্বয়ে গঠিত এই দল রক্ষণশীলদলেব প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী, এই দলের জাতীয় কার্যকরী সমিতিব (National Executive Committee) ২৫ জন সভ্যের মধ্যে ১২ জন ট্রেড ইউনিযনগুলির প্রতিনিধি ৭ জন দলের স্থানীয় সংস্থার প্রতিনিধি। একজন সমবায় সমিতিগুলির প্রতিনিধি এবং বাকী ৫ জন মহিলা সদস্য। এছাড়া দলের নির্বাচিত নেতা পদাধিকার বলে কার্যকরী সমিতির সভ্য। এই দলেরও প্রতি বৎসর একটি করে অধিবেশন হয। ঐ অধিবেশনে দলের কার্যক্রম স্থিরীকৃত হয় এবং কার্যকরী সমিতির সভ্যবৃন্দ নির্বাচিত হয়। শ্রমিক দলের ভিত্তি সুদূর প্রসারী। শিল্প শ্রমিক ছাড়াও কৃষি জীবী সম্প্রদাযেব ওপবও এর প্রভাব যথেষ্ট। এছাড়া নিম্নবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষক, ইঞ্জিনীযার, চিকিৎসক, পাদরী, সাংবাদিক দোকানদার ও ছোটখাট ব্যবসাযীবাও এই দলেব সমর্থক।

শ্রমিকদল
The Labour Party

শ্রমিক দলের উদ্দেশ্য হল দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্যজনিত অবিচারের নিবসন। এই জন্য শিল্পগুলিকে ব্যক্তিগত মালিকানা ও মুনাফাব হাত থেকে মুক্ত করে সমস্ত দেশের কল্যাণে নিয়োগেব প্রযোজনে এই দল বিশ্বাসী। মূল শিক্ষাগুলিকে জাতীযকরণ কবা এইদলেব অন্যতম কার্যক্রম। তবে এই সমস্ত পরিবর্তন বৈপ্লবিক পথে সংসাধিত না কবে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আইন-প্রণযন এবং ট্রেড ইউনিযনের আন্দোলনেব মাধ্যমে কার্যকরী করাই শ্রমিকদলের উদ্দেশ্য। কাবণ নবমপন্থী সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হইলেও শ্রমিক দল সর্বোপরি গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাবান। সামাজিক পরিবর্তনের প্রযোজনে বিশ্বাসী হলেও এদিক থেকে শ্রমিকদলের সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিষ্টদলের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ১৯৪৫ সালেব শ্রমিক সবকাব তাই কযলা, লৌহ, পরিবহন প্রভৃতি কতকগুলি শিল্প রাষ্ট্রাযত্ত করলেও অধিকাংশ মূলশিল্পেই হস্তক্ষেপ করেনি এবং মালিকদের যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দিযেছে। বর্তমানে দলের তাত্ত্বিক প্রবক্তা মরিসন প্রমুখ চিন্তাবিদগণ মোটামুটিভাবে ধীরগতি পরিবর্তনের ওপর আস্থা রাখেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রক্ষণশীল দলের সঙ্গে শ্রমিক দলের

বিশেষ মতবিরোধ নাই। কমনওয়েলথ ও জাতীয় অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সামরিক নিরাপত্তা উভয়েরই প্রধান লক্ষ্য।

শ্রমিকদল এবং রক্ষণশীলদলের মাঝামাঝি পর্যায়ে উদারনৈতিক দলের অবস্থান। পূর্বে পামার ষ্টোন, গ্ল্যাডষ্টোন, লয়েড জর্জ প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এই দলের গৌরবময় অধ্যায় জড়িত থাকলেও বর্তমানে এই দলের প্রভাব দ্রুত ক্ষীয়মান। প্রধান দুটি দলের সমর্থকদের বাদ দিয়ে যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় নাগরিক অব্যবস্থিতচিত্ততা হেতু কোন দলকেই পুরোপুরি সমর্থন করতে পারে না তারাই এই দলের স্বপক্ষে ভোট দিয়ে থাকে। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এই দল কোনক্রমে সংসদে মর্যদা রক্ষা করেছিল। তখন এইদলের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ছিল বারো। দশবছর পরে ১৯৫৫ সালের নির্বাচনে এই সংখ্যা কমে গিয়ে মাত্র দুইয়ে দাঁড়িয়েছে এবং দলের অধিকাংশ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। উদারনৈতিক দল কোন বিশেষ শ্রেণী স্বার্থেরও প্রতিনিধি নয় এবং কোন নির্দিষ্ট আদর্শ বা কর্মপন্থাও এর নাই। মোটের উপর রক্ষনশীল দল থেকে এই দল কিছুটা প্রগতিপন্থী বলা যায়। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই দল ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা সমাজতন্ত্র কোন কিছুই সমর্থন করে না। উভয়ের সমন্বয়ে মোটামুটি একটা মধ্যপন্থা রচনা করে চলাই এই দলের উদ্দেশ্য। এক সময়ে ভোটাধিকার প্রসার, অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতি নানা অবদান থাকলেও বর্তমানে এই দলের আর প্রয়োজনীয়তা নাই একথা বলা চলে।

উদারনৈতিক দল
The Liberal Party

দেশের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম এবং জনসমর্থনবঞ্চিত দল হল কম্যুনিষ্ট পার্টি। এই দল গত আট বৎসরের মধ্যে সংসদে একটিও প্রতিনিধি প্রেরণ করতে সমর্থ হয়নি, তবে দেশের গণআন্দোলনের ক্ষেত্রে এই দলের প্রভাব অনস্বীকার্য। দলীয় সংগঠনের দিক থেকে এবং প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে এই দলের বনিয়াদ বর্তমানে আর দুর্বল বলা চলে না। মার্কসীয় পদ্ধতিতে দেশের অর্থনৈতিক ও সমাজব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন করে সঠিক রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই এইদলের উদ্দেশ্য।

কম্যুনিষ্ট দল
The Communist Party

ঘ. স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা (Local Government):

রাষ্ট্রগঠনের দিক থেকে গ্রেটব্রিটেনে এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার পর্যায়ে পড়ে। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যই হল একটি মাত্র কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের

হাতে সমস্ত শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত থাকা। শাসন পরিচালনার সুবিধার জন্য অবশ্য দেশকে কতকগুলি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। কিন্তু এই সব অঞ্চল যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত অঙ্গরাজ্যসমূহের মত কোন স্বতন্ত্র কর্তৃত্বের অধিকারী নয়। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান কর্তৃক কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য ক্ষেত্রাধিকার স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট থাকে যার ফলে প্রত্যেক সরকারই নিজ নিজ এলাকায় স্বতন্ত্রভাবে শাসন করতে পারে। পক্ষান্তরে এককেন্দ্রিক কাঠামোয় আঞ্চলিক শাসন সংস্থাগুলির সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারাই প্রদত্ত এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্যেই সংরক্ষিত। সুতরাং ইংল্যাণ্ডের স্থানীয় শাসনে নিজস্ব কোন কর্তৃত্বাধিকারের সন্ধান পাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ডের স্থানীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার ফলে গণতান্ত্রিক ক্ষমতা বণ্টন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার বিকাশ অত্যন্ত সহজ হয়ে উঠেছে। [2] এই দিক থেকে স্থানীয় শাসনব্যবস্থা আলোচনার দাবী রাখে।

এককেন্দ্রিক কাঠামোয় স্থানীয় শাসন
Local govt. in a Unitary Set-up

ব্রিটেনে প্রচলিত স্থানীয় শাসনের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রাচীনত্ব। সুদূর অতীতে এই ব্যবস্থার প্রথম সূত্রপাত হয় এ্যাংলো-স্যাক্সন যুগে। এই যুগে, বিশেষ করে রাজা এ্যালফ্রেডের সময়ে, আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা ও সমাধান হত। সেই সময় থেকে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় শাসনব্যবস্থা বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। অধুনা উনবিংশ শতকের শেষভাগে জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত—সমিতি বা Council এর সাহায্যে স্থানীয় সমস্যাদির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আইনের স্বীকৃতি লাভ করেছে। মূলতঃ জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম, শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, আঞ্চলিক যোগাযোগ ও পরিবহন ইত্যাদির দায়িত্বভার ক্রমান্বয়ে এইসব স্থানীয় সংস্থার ওপর অর্পিত হয়েছে। সুতরাং যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় শাসনব্যবস্থার এই সামঞ্জস্য রক্ষাও একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। এছাড়া স্থানীয় ব্যাপারে সংস্থাগুলির কাজকর্মের স্বাতন্ত্র মোটামুটিভাবে অব্যাহত থাকলেও, এবং কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণতঃ এইসমস্ত কাজে হস্তক্ষেপ না করলেও, বিভিন্ন আঞ্চলিকশাসনব্যবস্থার মধ্যে যাতে একটা সামঞ্জস্য বা সাদৃশ্য থাকে সেজন্য সরকারী পর্যায়ে মাঝে মাঝে নিয়মকানুন প্রণয়ণ করা হয়ে থাকে।

ব্রিটিশ স্থানীয় শাসনের বৈশিষ্ট্য
Features of English Local Government

[2] "The liberties of England may be ascribed above all things to her free local institutions. Since the days of their Saxon ancestors her sons have learned at their own gates the duties and responsibilities of citizens" – Blackstone : "Commentary".

সংসদীয় আইনে যেভাবে নীতি ও কর্তৃত্বের এক্তিয়ারে নির্ধারণ করে দেওয়া হয় স্থানীয় সংস্থাগুলি সেই সীমারেখা অতিক্রম করতে পারে না। সরকারী বিভিন্ন বিভাগের হাতেও যথা, পরিবহন, স্বরাষ্ট্র, গৃহনির্মাণ ও শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি—স্থানীয় সংস্থাগুলির সুষ্ঠু পরিচালনা, আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য, দুর্নীতি-নিরোধ, পরিকল্পনা অনুমোদন ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে।

স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার সাংগঠনিক প্রকার ভেদ
Institutional varieties of Local Government

স্থানীয় শাসনের জন্য সারা দেশকে কতকগুলি County Borough এবং Administrative County, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। বড় বড় সহরগুলি কাউন্টি-বরো শ্রেণীভুক্ত এবং ঐ সব বরোর কাউন্সিলেই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনভার অর্পিত। Administrative County গুলির জন্য Municipal Borough, Urban District এবং Rural District এই তিনরকম আঞ্চলিক শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক আঞ্চলিক শ্রেণীর নিজস্ব স্বায়ত্তশাসন কাউন্সিল আছে। Rural District গুলি আবার কতকগুলি Parish এ বিভক্ত। Parish গুলির জন্য Parish Council বা Parish Meeting সংগঠিত হয়। County Borough গুলির মধ্যে লণ্ডনই সববৃহৎ। এখানে একযোগে London County Council, Corporation of the City of London এবং Metropolitan Borough Council কাজ করে থাকে। প্রত্যেক কাউন্সিলের সদস্যগণ স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। সদস্যসংখ্যা বিভিন্ন কাউন্সিলে বিভিন্ন। এছাড়া কয়েকজন অল্ডারম্যানও কাউন্সিল কর্তৃক নিযুক্ত হন। এদের সংখ্যা মোট সদস্যদের একতৃতীয়াংশ। কর্মদক্ষতার জন্য ক্ষমতা বিশেষীকরণের নীতির অনুসরনে এখানে বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে কাজকর্ম পরিচালনা করা হয়, কমিটিতে বহিরাগত অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরও মাঝে মাঝে গ্রহণ করা হয়। কাউন্সিলগুলি যে সমস্ত কাজকর্ম করে থাকে সংক্ষেপে সেগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (১) পরিবেশ-উন্নয়ন, (২) সংরক্ষণমূলক এবং (৩) ব্যক্তির সেবা। নগরোদ্যান, রাস্তাঘাট, আলো ও জল সরবরাহ, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রসার ও উন্নয়ন পরিবেশ উন্নয়নের উদাহরণ। প্রহরী, অসামরিক প্রতিরক্ষা, অগ্নিনির্বাপণ ইত্যাদি সংরক্ষণমূলক কাজের পর্যায়ে পড়ে। পাঠাগার, প্রসূতি ও শিশুকল্যাণকেন্দ্র, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যক্তির সেবা করা হয়। সরকারী সাহায্য, স্থানীয় কর, ঋণ, সম্পত্তি, ব্যবসা ও অন্যান্য আয়ের সূত্র থেকে উক্ত কাজকর্মের ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

প্রথম অধ্যায়

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান

(Constitution of the U S. S.)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার নীতি (Principles of federal government) :

বর্তমানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন।[1] কাজেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা আলোচনা করতে গেলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

যুক্তরাষ্ট্রের সংজ্ঞা
Definition of federation

কতকগুলি রাজ্য তাদের নিজ নিজ স্বার্থের প্রতি সচেতন থেকে সকলের সাধারণ স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যে যে সঙ্ঘে মিলিত হয় তাকে যুক্তরাষ্ট্র বলে। যুক্তরাষ্ট্র বলতে কেবল কতকগুলি রাজ্যের সম্মেলনই বোঝায় না। যুক্তরাষ্ট্র বলতে এমন একটি শাসনব্যবস্থা বোঝায়, যেখানে সংবিধানে নির্ধারিত কোন উপায়ে দুই প্রকার সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়েছে। এই দুই প্রকার সরকারকে বলা হয় কেন্দ্রীয় (central বা federal) সরকার ও রাজ্য (state) বা আঞ্চলিক (regional) সরকার। এই দুই প্রকার সরকার তাদের নিজ নিজ এলাকায় সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং রাজ্যসরকারগুলি ও কেন্দ্রীয় সরকার সমশ্রেণী ভুক্ত (Co-ordinate) যুক্তরাষ্ট্রে উক্ত দুই প্রকার সরকারের মধ্যে ক্ষমতা-বিভাজন নির্ভর করে তাদের কাজের প্রকৃতির উপর। কেন্দ্রীয় সরকারে কাজগুলি সমগ্র দেশের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত; অপরপক্ষে রাজ্য সরকারের কাজগুলি একান্তভাবেই তাদের আঞ্চলিক স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা-বিভাজনের দুটি নীতি আছে। প্রথম নীতি অনুসারে সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাগুলি লিপিবদ্ধ থাকে—

---

1 "The modern idea of what federal government is has been determined by the United States of America."—Wheare.

অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি রাজ্যসরকারগুলি ভোগ করে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এই নীতিটির প্রয়োগ দেখা যায়। দ্বিতীয় নীতিটি (যার প্রয়োগ বিশেষভাবে দেখা যায় কানাডার শাসনতন্ত্রে) হল এই যে, সংবিধানে রাজ্যসরকারগুলির ক্ষমতা লিপিবদ্ধ থাকে এবং বাকী ক্ষমতাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে এগুলি উল্লেখ করা একান্ত আবশ্যক। প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি পাশাপাশি বর্তমান থাকে এদের ক্ষমতার উৎস হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান। তত্ত্বগতভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে এরা পরস্পর নিরপেক্ষ—যদিও বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারগুলির নির্ভরশীলতা এবং রাজ্য সরকারগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি উভয়েরই বৃদ্ধি ঘটেছে। দ্বিতীয়তঃ, সংবিধানে নির্দিষ্ট কোন নীতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বিভাজন (division of power) হয়। তৃতীয়ত, যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার উভয়েরই ক্ষমতার উৎস, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রাধান্য (Supremacy of the Constitution) স্বীকৃত হয়। সংবিধানের প্রাধান্য—কথাটির তাৎপর্য্য হল এই যে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার কারো পক্ষেই সংবিধানের ধারাগুলিকে অবহেলা করে ক্ষমতা প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। চতুর্থত, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত ও অনমনীয় হওয়া দরকার। সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে সংবিধান লিখিত হওয়া প্রয়োজন—কেন না লিখিত ধারা-উপধারা সম্বন্ধে তর্কাতর্কি ও মতভেদের অবকাশ খুব বেশী না হবারই কথা। সংবিধানের অনমনীয়তা (rigidity) প্রয়োজন এই কারণে যে, সংবিধানের কোন সংশোধন (amendment) করতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকার যেন ইচ্ছামত কাজ করতে পারে এবং এবং উভয় প্রকার সরকারেরই সম্মতি পাওয়া যায়। পঞ্চমত, যুক্তরাষ্ট্রে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারালয়ের উপস্থিতি প্রয়োজন—প্রধানত দুটি কারণে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারের মধ্যে বা রাজ্য-সরকারগুলির নিজেদের মধ্যে সংবিধানের নির্দিষ্ট ধারাগুলির ব্যাখ্যা নিয়ে কোন মতানৈক্য দেখা গেলে বিচারালয় সেই ধারাগুলি সম্বন্ধে নিজের ব্যাখ্যা দেয় এবং সেই ব্যাখ্যা সর্বত্র গৃহীত হয়। তাছাড়া কেন্দ্রীয় শাসন-বিভাগ ও আইন-বিভাগের নির্দেশের সঙ্গে সংবিধানের কোন অসঙ্গতি দেখলে বিচারালয়

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of a federation

ঐ নির্দেশগুলিকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করতে পারে। ষষ্ঠত, যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে কেবল ক্ষমতা-বণ্টন নয়, রাজস্ব-বণ্টণও হয়ে থাকে। শেষত, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাজ্যগুলিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে হয় এবং কোন রাজ্যই যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করতে পারে না।

মার্কিন শাসনব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি কতদূর স্বীকৃতি লাভ করেছে, তা ক্রমশ বিচার্য্য।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য (Salient feautres of the U S. Constn.) :

বিশ্লেষণ করলে মার্কিণ সংবিধানের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়।

প্রথমত, মার্কিণ সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয়, লিখিত এবং প্রজাতান্ত্রিক। সংবিধান অনুসারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারে বিভক্ত হয়েছে (বর্তমানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত রাজ্যের সংখ্যা ৫০)। সংবিধানে কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দিষ্ট করা হয়েছে—ফলে অবশিষ্ট (residuary) ক্ষমতাগুলি অর্পিত হয়েছে রাজ্যসরকারগুলির হাতে। সংবিধানটি লিখিত এবং আপাতত এর বাইশটি সংশোধন (amendment) হয়েছে। তাছাড়া সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যসরকারগুলিতে প্রজাতান্ত্রিক সরকার থাকা দরকার এবং এই সরকারগুলি তাদের কর্তৃত্ব লাভ করবে জন-সাধারণের কাছ থেকে।

(১) যুক্তরাষ্ট্রীয় লিখিত ও প্রজাতান্ত্রিক
Federal written and republican

দ্বিতীয়ত, মার্কিন সংবিধানে সংবিধানের প্রাধান্য ও অনমনীয়তা লক্ষণীয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস হল সংবিধান—আইনসভা নয়। সংবিধানের দ্বারা কেবল যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজন হয়েছে তা নয়—কেন্দ্রীয় সরকারের তিনটি বিভাগ ও তাদের ক্ষমতাও নির্ধারিত হয়েছে। সংবিধানে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, সংবিধানটি দেশের সর্বোচ্চ আইন (the supreme law of the land) বলে বিবেচিত হবে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, ইংলণ্ডে যেমন আইনসভার প্রাধান্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তেমনি সংবিধানের প্রাধান্য। সংবিধানটি অনমনীয়ও বটে—অর্থাৎ সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতির সাহায্যে সংবিধান সংশোধন করা

(২) সংবিধানের প্রাধান্য ও অনমনীয়তা
Supremacy and rigidity of Constitution

যায় না। দুটি উপায়ে মার্কিন সংবিধান সংশোধন করা যায় এবং দুটিই অপেক্ষাকৃত দুরূহ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মার্কিন সংবিধানে এ-যাবৎ বাইশটি সংশোধন হয়েছে—প্রথম দশটি সংশোধন হয়েছে ১৭৯১ সালে আর বাইশ নম্বর সংশোধনটি হয়েছে ১৯৫২ সালে। প্রথম দশটি সংশোধন নাগরিকদের মৌলিক অধিকার (fundamental right) সম্বন্ধীয় বলে অনেক লেখকই এই সংশোধনগুলিকে সংশোধন বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। তাঁদের মত মেনে নিতে গেলে মার্কিন সংবিধানে বারোটির বেশী সংশোধন হয় নি।

(৩) সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা
Role of the Supreme Court

তৃতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় সুপ্রীম কোর্ট (Supreme Court) সংবিধানের প্রাধান্যের রক্ষক আন্তঃরাজ্য বিবাদ বা রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে বিবাদের মীমাংসা করা ও সংবিধানের ব্যাখ্যা করা সুপ্রীম কোর্টের প্রধান কাজ। আইনবিভাগের নির্দেশ সংবিধান বিরোধী কি না, তা বিচার করাও সুপ্রীম কোর্টের কর্তব্য। এই ক্ষমতাটির নাম হল, বিচারবিভাগের আইনসমীক্ষা (Judicial Review) শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগ নিরপেক্ষ বলে সুপ্রীম কোর্ট এই ক্ষমতা ভোগ করে। এই আইন সমীক্ষার দরুণ সুপ্রীম কোর্ট যথেষ্ট প্রাধান্য ও গুরুত্ব অর্জন করেছে এবং একই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় আইনসভা ইংলণ্ডের আইন সভার মত সার্বভৌম সংস্থা হতে পারে নি। তাছাড়া মার্কিন শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি (separation of powers) প্রযুক্ত হবার ফলে কেন্দ্রীয় বিচারবিভাগ স্বাধীনতা ও প্রাধান্য লাভ করেছে।

(৪) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ ও পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য
Separation of powers and mutual checks and blances

চতুর্থত, মার্কিন সংবিধানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ ও পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভার-সাম্যের নীতির (mutual checks and balance) চূড়ান্ত প্রয়োগ দেখা যায়। এই দুটি নীতিরই বক্তব্য হল, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা বিভাগ ও নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বিপন্মুক্ত রাখা। মার্কিন সংবিধানে স্পষ্টই দেখা যায়, তিনটি বিভাগকে (শাসনবিভাগ, আইন-বিভাগ, বিচার বিভাগ) পরস্পরের প্রভাবমুক্ত রাখা হয়েছে। শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আইনবিভাগের কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই। আবার আইনবিভাগ শাসন বিভাগের প্রভাবাধীন নয়। অনুরূপভাবে, বিচার বিভাগও শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের ক্ষমতা ও প্রভাবের বহির্ভূত। কিন্তু সরকারের তিনটি বিভাগের কার্যধারার মধ্যে একটা

স্বাভাবিক পরস্পর নির্ভরশীলতা আছে বলে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভবও নয়, সমর্থনীয়ও নয়। তাই মার্কিন সংবিধানে দেখা যায়, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সঙ্গে পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতিও গৃহীত হয়েছে। শেষোক্ত নীতিটির তাৎপর্য হল, প্রতিটি বিভাগই কোন না কোন ভাবে অপর দুটি বিভাগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এর ফলে কেবল যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির নিরঙ্কুশ প্রয়োগের সম্ভাবনা রোধ হয় তা নয়—এর ফলে সরকারের তিনটি বিভাগের কোনটিই স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা চলে, রাষ্ট্রপতিকৃত নিয়োগ আইনসভার অনুমোদন ছাড়া বলবৎ হয় না, তেমনি, আইনসভায় অনুমোদিত বিল (Bill) রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ না করলে আইনে পরিণত হয় না। অনুরূপভাবে দেখা যায় যে, বিচারবিভাগ, আইন বিভাগ ও শাসনবিভাগের উপর নির্ভরশীল।

পঞ্চমত, মার্কিন সংবিধানে রাজ্যগুলির সাম্য (equality of the states) স্বীকৃত হয়েছে। কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চতর কক্ষে বা সেনেটে (Senate) প্রতিটি রাজ্য থেকে দুজন করে প্রতিনিধি প্রেরিত হন।

(৫) রাজ্যগুলির সাম্য (Equality of the states)

ষষ্ঠত, ১৯১৩ সালের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চতর কক্ষের (বা সেনেটের) প্রতিনিধিরা রাজ্য আইনসভাগুলির পরিবর্তে রাজ্যের জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হচ্ছেন। মার্কিন সংবিধানের সপ্তদশ সংশোধন প্রবর্তিত হবার পর থেকে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে পরস্পর নিরপেক্ষতা (যা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ সূচিত হয়েছে।

(৬) সেনেটের প্রতিনিধিদের নির্বাচন (Election of the Senators)

সপ্তমত, মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি রাষ্ট্রপতিপ্রধান প্রজাতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তিত হয়েছে।

(৭) রাষ্ট্রপতি-প্রধান প্রজাতন্ত্র (Presidential Republic)

অষ্টমত, সংবিধান অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকেরা দ্বৈত নাগরিকতা (dual citizenship) ভোগ করে। অর্থাৎ তারা কেন্দ্রীয় সরকারের নাগরিক এবং কোন এক রাজ্যের নাগরিক। সংবিধানের প্রথম দশটি সংশোধনে নাগরিকদের কতকগুলি মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে।

(৮) দ্বৈত নাগরিকতা (Dual citizenship)

সংবিধানের বিবর্তন (Evolution of the Constitution)

১৭৮৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রবর্তিত হয়েছিল এবং কিঞ্চিদধিক একশ সত্তর বছর পরে ঐ এক সংবিধানই চালু আছে। এর অর্থ এই নয় যে, এতদিনে সংবিধানের কোন পরিবর্তন ঘটে নি, যদিও আপাতদৃষ্টিতে সংবিধানের খুব বেশী পরিবর্তন হয় নি বলে মনে হয়—বাইশটি সংশোধন আলোচনা করলে। এই একশ সত্তর বছর ধরে মার্কিন সংবিধানের অনেক বিবর্তন ঘটেছে। তা না হলে যে-সংবিধানটি একটি কৃষিপ্রধান দেশে প্রবর্তিত হয়েছিল তা একটি শিল্পপ্রধান দেশের উপযুক্ত হতে পারত না। তবে একথা ঠিক যে, মার্কিন সংবিধানের বিবর্তন কেবল সংবিধানের সংশোধনের মধ্যেই পাওয়া যাবে না। সংবিধানের সংশোধন ছাড়াও মার্কিন সংবিধানের বিবর্তন ঘটেছে বিচার বিভাগীয় ব্যাখ্যা, বিভিন্ন আইন ও রাজনৈতিক প্রথার মাধ্যমে।

সংবিধানের সংশোধন কেন্দ্রীয় আইনসভা (কংগ্রেস) বা রাজ্য আইনসভাগুলি—এদের যে কোন একজনেব উদ্যোগে উত্থাপিত হতে পারে। অবশ্য মার্কিন সংবিধানের বাইশটি সংশোধনই কেন্দ্রীয় আইনসভা উত্থাপিত করেছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মার্কিন সংবিধানের ধারাগুলি সংশোধন করা কষ্টসাধ্য। কিঞ্চিদধিক একশ সত্তর বছরে বাইশটি সংশোধনই তার নিদর্শন। তাছাড়া, সংবিধানের সংশোধনে নাগরিকদের কোন ভূমিকা নেই। ষোড়শ সংশোধন (কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আয়কর প্রবর্তন ও আদায় সম্বন্ধীয়) ছাড়া আর কোন সংশোধন প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে নি। সংশোধনগুলি সাধারণত নিষেধাত্মক। ব্রাইস (Bryce) বলেছেন, সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তা যুগপৎ প্রত্যক্ষ ও কার্যকরী। সংশোধনের মাধ্যমে পরিবর্তন অত্যন্ত কষ্টকর, কিন্তু পরিবর্তন একবার সাধিত হলে তার পরিবর্তনও কষ্টকর।

বিচারবিভাগীয় ব্যাখ্যার (judicial interpretation) মাধ্যমেও মার্কিন সংবিধানের বিবর্তন ঘটেছে। সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের বিভিন্ন ধারা ও বাক্যাংশের ব্যাখ্যা করে সংবিধানের বিবর্তনে সাহায্য করেছে। কখনও কখনও সংবিধান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের অর্থবিস্তার ঘটিয়েছে, এ দৃষ্টান্তও বিরল নয়। সংবিধানের বিবর্তনে সুপ্রীম কোর্টের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল নিহিত ক্ষমতার নীতি (theory of implied powers)। নিহিত ক্ষমতা বলতে কেন্দ্রীয় সরকারের সেই ক্ষমতাগুলি বোঝায় যেগুলি সংবিধানে উল্লিখিত না হওয়া সত্বেও এত সুস্পষ্ট যে সেগুলি স্বীকার

না করে উপায় নেই। এই নিহিত ক্ষমতাগুলিকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা চলে—কর বসানো ও টাকা ধার করার ক্ষমতা, ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এবং যুদ্ধ ও যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় ক্ষমতা। সংবিধানের বিবর্তনে সুপ্রীম কোর্টের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নানা অভিধার দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। কোন লেখকের মতে সুপ্রীম কোর্ট হ'ল নিরবচ্ছিন্ন শাসনতান্ত্রিক সম্মেলন (continuous constitutional convention) এবং একে আইনসভার তৃতীয় কক্ষও বলা হয়ে থাকে। সুপ্রীম কোর্টের এই ভূমিকার পিছনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় অবদান হল ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি মার্শালের, যাঁকে 'মার্কিন সংবিধানের দ্বিতীয় প্রণেতা' বলা হয়ে থাকে।

বিচারবিভাগীয় ব্যাখ্যা
(Judicial interpretation)

মাকিন সংবিধানের বিবর্তনের মূলে আইনসভার-প্রণীত আইনের (statue) ভূমিকাও স্বীকার্য। সংবিধানপ্রণেতারা কেন্দ্রীয় সরকারের সংগঠন ও কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে কিছু লিপিবদ্ধ করেন নি। পরে এই সমস্ত ব্যাপারে আইন-প্রণয়ন আবশ্যক হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে সংবিধানে শাসনবিভাগীয় বিভাগের (administrative departments) সংগঠন সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি এবং পরে এ-সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করতে হয়েছে। এহেন দৃষ্টান্ত মাকিন সংবিধানের ইতিহাসে বিরল নয়।

আইনের মাধ্যমে সম্প্রসারণ
(Statutory elaborations)

সর্বশেষে সংবিধানের বিবর্তনের কারণ হিসাবে রাজনৈতিক প্রথার উল্লেখ করতে হয়। প্রধানত সংবিধানের অসম্পূর্ণতার দরুণ রাজনৈতিক প্রথা এত গুরুত্ব অর্জন করেছে। ব্রাইসের মতে এই অসম্পূর্ণতা কিছু ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত আবার কিছু ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত। সরকারের কাজকর্মে রাজনৈতিক প্রথা অনেক সময় আইনের সমতুল্য গুরুত্ব লাভ করেছে। এবং এই গুরুত্বের প্রধান কারণ হল এই যে, অনেক সময়ে রাজনৈতিক প্রথা সংবিধানের অন্তর্নিহিত অর্থের (spirit) বিরোধিতা করেছে। উদাহরণস্বরূপ মার্কিন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতির উল্লেখ করা চলে। বর্তমান মার্কিন রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন; কিন্তু সংবিধান প্রণেতারা রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচন চাননি। কেন্দ্রীয় আইনসভার নিম্নকক্ষ প্রতিনিধিসভার (House of Representatives) সভাপতির (Speaker) ক্ষমতা রাজনৈতিক প্রথার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মার্কিন রাষ্ট্রপতির যে মন্ত্রিপরিষদ (Cabinet) আছে তারও উদ্ভব রাজনৈতিক প্রথা

রাজনৈতিক প্রথা
Usage or custom

থেকে। সর্বোপরি, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের যে ভূমিকা, তা সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক প্রথার সৃষ্টি। মার্কিন রাষ্ট্রপতি যে কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হবেন, সংবিধান প্রণেতারা তা চাইতেন না। অথচ বর্তমানে রাজনৈতিক দলভুক্ত না হলে কোন নাগরিকের পক্ষে রাষ্ট্রপতি হওয়া সম্ভব নয়। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। মার্কিন সংবিধানে রাজনৈতিক প্রথার গুরুত্ব ইংল্যাণ্ডের মত অত বেশী না হলেও খুব কম নয়।

সংবিধানের সংশোধন, বিচারবিভাগীয় ব্যাখ্যা, বিভিন্ন আইন ও রাজনৈতিক প্রথা—এই চারটি কারণে মার্কিন সংবিধান বিবর্তন লাভ করেছে ও যুগোপযোগিতার সম্মান লাভ করেছে। মার্কিন সংবিধান সম্বন্ধে ব্রাইসের মন্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক। "After all deductions, it (the American Constitution) ranks above every other written constitution for the intrinsic excellence of its scheme, its adaptations to the circumstances of the people, the simplicity, brevity and precision of its language, its judicious mixture of definiteness in principles with elasticity in details."

মৌলিক অধিকার (Bill of Rights) :

মার্কিণ সংবিধানের প্রথম দশটি সংশোধনের মারফৎ নাগরিকদের কতকগুলি মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাই এই দশটি সংশোধনকে একত্রে অধিকার পত্র (Bill of Rigihts) বলা হয়।

প্রথম সংশোধনে জনসাধারণের বাক্ স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ সম্মেলনের অধিকার ও অভাব অভিযোগের প্রতিকারার্থে সরকারের কাছে আবেদন জানাবার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এ ছাড়া অপর সংশোধনগুলিতে জনসাধারণকে যে সমস্ত অধিকার দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে নিরপেক্ষ জুরীর বিচার, ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তা, ফৌজদারী মামলায় দ্রুত বিচার, ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির নানা সুযোগ-সুবিধা লাভ উল্লেখযোগ্য। অষ্টম সংশোধনে বলা হয়েছে, জামিন, জরিমানা ও শাস্তি—কোনটাই যেন অত্যধিক না হয়। অধিকার পত্রটির বহির্ভূত হলেও এ প্রসঙ্গে চতুর্দশ সংশোধনের উল্লেখ করা প্রয়োজন। উক্ত সংশোধনে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে রাজ্যসরকারগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকার কেড়ে নিতে পারবে না এবং নাগরিকদের স্বার্থে আইনের সমান সংরক্ষণ (equal protec-

tion of the laws) অস্বীকার করতে পারবে না। আইনের সমান সংরক্ষণ নীতিটির অর্থ হল, নাগরিকদের জন্যে অধিকার ও সুবিধা নির্দিষ্ট থাকলে সরকার ঐ অধিকার ও সুবিধাগুলির ব্যাপারে কোন নাগরিকের প্রতি পক্ষপাত বা বৈষম্য দেখাতে পাবে না। অন্য কথায় বলতে গেলে, আইনের সমান সংরক্ষণ নীতিটি শ্রেণীভিত্তিক আইনপ্রণয়নেব (class legislation) বিরোধী।[2]

মার্কিন সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলি বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই অধিকারগুলি নঞর্থক; অর্থাৎ সংবিধানে বলা হয়নি যে নাগরিকদের এই অধিকারগুলি থাকবে—বরং বলা হয়েছে, কংগ্রেস বা রাজ্য-সবকার এই অধিকারগুলিতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, আপাত-দৃষ্টিতে অধিকারগুলিকে নিরঙ্কুশ বা সর্তনিরপেক্ষ (unconditional) বলে মনে হয়। এ-প্রসঙ্গে বাক্‌স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রেব স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদির উল্লেখ করা চলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অধিকারগুলি সর্তাধীন এবং সুপ্রীম কোর্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই অধিকারগুলিব সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং এই মৌলিক অধিকাবগুলিকে সর্তনিরপেক্ষ বলে বিচার করা ঠিক হবে না। তৃতীয়ত, মৌলিক অধিকারেব মধ্যে অর্থনৈতিক অধিকাবের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

কার্যপালিকা বিভাগ

(The Executive)

মার্কিন রাষ্ট্রপতি (The American President):

মার্কিন সংবিধানে অনুসৃত ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির দরুণ কেন্দ্রীয় সরকারে তিনটি বিভাগ দেখা যায়—শাসনবিভাগ, আইনবিভাগ ও বিচার বিভাগ। শাসনবিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি। মার্কিন সংবিধানে কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বৈশিষ্ট্য হল যে, 'এটি একক (Single) এবং আইনসভার ইচ্ছার উপর এর অস্তিত্ব নির্ভরশীল নয়। রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হতে গেলে ন্যূনতম যোগ্যতা হল: রাষ্ট্রপতি-

---

২ পঞ্চদশ ও উনবিংশ সংশোধনেব মাধ্যমে নাগরিকদেব ভোটদানেব অধিকার স্বীকৃতি লাভ করেছে।

পদপ্রার্থী জন্মসূত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হবেন, তাঁকে অন্যূন চোদ্দ বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতে হবে এবং তাঁর বয়স অন্তত পঁয়ত্রিশ হওয়া প্রয়োজন। মার্কিন সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। ভোটদাতারা কয়েকজন প্রতিনিধিকে একটি নির্বাচকমণ্ডলীতে (electoral college) পাঠায়। কোন রাজ্য কেন্দ্রীয় আইনসভায় যতজন প্রতিনিধি পাঠায়, ঐ রাজ্য নির্বাচকমণ্ডলীতে তার সমসংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাতে পারে। এই নির্বাচকমণ্ডলী ভোট দিয়ে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করেন: দলীয় ব্যবস্থা উদ্ভূত হবার পর থেকে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পরোক্ষ না হয়ে প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ ব্যবস্থায় পর্যবসিত হয়েছে। কেন না, নির্বাচকমণ্ডলীতে প্রতিনিধি-নির্বাচন দলীয় নির্দেশের ভিত্তিতেই হয়ে থাকে এবং নির্বাচকমণ্ডলীতে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দলীয় অনুশাসন অনুযায়ী ভোট দিয়ে থাকেন। সেজন্যে নির্বাচকমণ্ডলীতে দলীয় অবস্থা বিচার করলে শেষ পর্যন্ত কোন্ দলের প্রার্থী রাষ্ট্রপতি হবেন তা অনুমান করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে, মার্কিন সংবিধানপ্রণেতাদের উদ্দেশ্য ছিল, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন দলীয় ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে থাকবে এবং রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করার মানদণ্ড হবে রাষ্ট্রপতির গুণ ও যোগ্যতা। দলীয় ব্যবস্থার প্রাধান্যের ফলে বর্তমানে এই দুটি উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়েছে। এজন্যে বলা হয় যে, একজন ভাল রাষ্ট্রপতি (Good President) ও একজন ভাল রাষ্ট্রপতিপদপ্রার্থীর (Good Presidential Candidate) মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

রাষ্ট্রপতির কার্যকাল হল চার বছর। তিনি মোট দুবার নির্বাচিত হতে পারেন। তাঁর কার্যকালের মধ্যে কেন্দ্রীয় আইনসভা বা নির্বাচকমণ্ডলী তাঁকে পদচ্যুত করতে পারে না। কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় আইনসভার নিম্নকক্ষ বা প্রতিনিধিসভা তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধের অভিযোগ আনতে পারে এবং সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সভাপতিত্বে সেনেটে এর শুনানী হয়। এই অভিযোগ অনুমোদিত হলে রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতি ঘটে। এ পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ অনুমোদিত হয় নি। কাজেই বলা যেতে পারে যে, সাধারণত মার্কিন রাষ্ট্রপতির কর্মাবসান হতে পারে তিনভাবে—মৃত্যু, পদত্যাগ বা কার্যকালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা (Powers of the President):

কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হিসাবে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন ক্ষমতাভোগ ও প্রয়োগ করে থাকেন। কেবলমাত্র সংবিধানে এই ক্ষমতাগুলির

উল্লেখ পাওয়া যাবে না। সংবিধান ছাড়াও মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার অন্যান্য উৎসগুলি হল, বিচারবিভাগীয় ব্যাখ্যা (বিশেষত নিহিত ক্ষমতাব নীতি), আইনসভা কর্তৃক প্রণীত নতুন নতুন আইন যার দ্বারা রাষ্ট্রপতিব ক্ষমতা বর্ধিত হয়েছে এবং বাজনৈতিক প্রথা।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাগুলিকে মোটামুটিভাবে চারভাগে ভাগ করা যায় যায়: শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা (executive powers), আইন-প্রণয়ন সম্পর্কীয় ক্ষমতা (legislative powers), বিচাববিভাগ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা (judical powers) এবং দলনেতা হিসাবে ক্ষমতা (powers as Party leader)।

বাষ্ট্রপতিব শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতাব মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য হল, আইনগুলি বলবৎ কবা। এই আইন বলতে কেবল কেন্দ্রীয় আইনসভা প্রণীত আইনগুলিই বোঝায় না, এর মধ্যে বিভিন্ন চুক্তি, বিচারবিভাগেব সিদ্ধান্ত ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত। তিনি দেশেব সেনাবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ। তিনি দেশের শাসনকার্যেব চূড়ান্ত নির্দেশক (Supreme director of administration)—যদিও এ-ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা কেন্দ্রীয় আইনসভার দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়।

শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা
(Executive Powers)

দেশে আইনগুলি যাতে বলবৎ হয়, সেজন্যে রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানদের নির্দেশ পাঠাতে পারেন। আইনসভাকৃত আইনগুলিতে অনেক সময়ে মোটামুটিভাবে শাসন কর্তৃপক্ষেব কার্যধাবাব প্রকৃতি ও সীমা নির্দিষ্ট কবা হয়, রাষ্ট্রপতি বা তাঁব অধস্তন কর্মচাবীদের কাজ হল, উক্ত আইনগুলি যাতে বলবৎ হয়, সেজন্যে বিশদ্ (detailed) বিধি ও বিধান (rules and regulations) প্রবর্তন কবা। রাষ্ট্রপতিব এই ক্ষমতা সংবিধানসম্মত না হলেও বর্তমানে অপবিহার্য। সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাব জন্যে দায়িত্ব রাষ্ট্রপতিরই —তাই সংবিধানানুযায়ী তিনি বিভিন্ন উচ্চ পদে নিয়োগ দানেব ক্ষমতা ভোগ কবেন। তাঁব নিয়োগ দানেব ক্ষমতা কিন্তু নিবঙ্কুশ নয়। কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চ কক্ষ বা সেনেটের অনুমোদন ব্যতীত এই নিয়োগগুলি কার্যকরী হয় না। রাষ্ট্রপতি যাতে তাঁর নিয়োগ দানেব ক্ষমতার অপব্যবহাব করতে না পারেন, সেজন্যে সেনেটেব অনুমোদন প্রয়োজন। বর্তমানে "সেনেটের ভদ্রতা" (Senatorial Courtesy) নীতিটি চালু থাকার দরুণ সেনেট তার অনুমোদনের ক্ষমতা খুব কঠোরভাবে প্রয়োগ কবে না। সংবিধানে কোন উল্লেখ না থাকলেও রাষ্ট্রপতি শাসনবিভাগের কোন কর্মচারীকে পদচ্যুত করতে পারেন এবং এজন্যে সেনেটের অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না।

পররাষ্ট্র সম্পর্কীয় ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি দেশের প্রধান মুখপাত্র হিসাবে কাজ করে থাকেন। সংবিধান অনুসারে তিনি বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি করতে পারেন এবং রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করতে পারেন। সেনেটের অনুমোদন আবশ্যক হলেও এ সমস্ত ব্যাপারে বাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কার্যত অসীম। একমাত্র বাষ্ট্রপতিরই ক্ষমতা আছে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনা চালাবাব; কেন্দ্রীয় আইনসভা বা অন্য কোন সংস্থার এ ক্ষমতা নেই। সেনেটের অনুমোদনের ক্ষমতা থাকলেও বাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কালক্রমে নানাভাবে বর্ধিত হযেছে। আইনসভাব সম্মতি ব্যতীত তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন না বটে, কিন্তু নিজেব কাজের দ্বারা তিনি যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী করে তুলতে পারেন। সেনাবাহিনীব সর্বাধ্যক্ষ হিসাবে তিনি কোন রাষ্ট্রের সীমানায সৈন্য পাঠাতে পাবেন এবং এর ফলে যুদ্ধ অপবিহার্য্য হয়ে পড়তে পারে। অন্য কথায বলতে গেলে, বাষ্ট্রপতি তাঁর কাজ ও নীতির (policy) দ্বারা যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী কবে তুলতে পাবেন—যদিও সংবিধান অনুসারে তিনি আইনসভার বিনাঅনুমতিতে যুদ্ধ ঘোষণা কবতে পারেন না। বাষ্ট্রপতি অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে "শাসনসংক্রান্ত চুক্তি" (executive agreement) প্রণয়ন করতে পাবেন। এই চুক্তির ক্ষেত্রে সেনেটের অনুমোদন প্রযোজন হয না। শেষত উল্লেখযোগ্য, সেনাবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ হিসাবে মার্কিন বাষ্ট্রপতি যুদ্ধের সময় শত্রুকে পরাজিত করবার জন্য যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন কবতে পারেন। যুদ্ধের সময়ে তিনি কার্যত অবাধ ক্ষমতা প্রযোগ কবতে পাবেন।

পববাষ্ট্রসম্পর্কীয ক্ষমতা (Powers relating to foreign relations)

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মার্কিন সংবিধান প্রণেতারা ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকবণ-নীতি সংবিধানে গ্রহণ করেছিলেন। তাই প্রত্যক্ষভাবে বাষ্ট্রপতিব আইন-প্রণযনের ক্ষমতা নেই। সংবিধান প্রণেতাদের উদ্দেশ্য ছিল, শাসন বিভাগ, আইনবিভাগ ও বিচারবিভাগে পরস্পরের প্রভাবমুক্ত রাখা। কিন্তু পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি নানা উপায়ে আইনসভার উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। এই উপায়গুলির মধ্যে কতকগুলি সংবিধানসম্মত, কতকগুলি সংবিধানবহির্ভূত।

আইন-প্রণযন সম্পর্কীয ক্ষমতা (Legislative powers)

সংবিধানে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় মনে করবেন, তা কেন্দ্রীয় আইনসভা বা কংগ্রেসের বিবেচনার জন্যে সুপারিশ করেন। এই ক্ষমতার বলে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের কাছে লিখিত "বাণী (message) পাঠিয়ে থাকেন। সংবিধানে কোন নির্দেশ না থাকলেও প্রথাগত-

ভাবে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের প্রতি অধিবেশনের (Session) শুরুতে কংগ্রেসকে একটি বিস্তৃত (comprehensive) বাণী পাঠান। তাতে মোটামুটিভাবে দেশের বড় সমস্যাগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তাছাড়া রাষ্ট্রপিত তাঁর বাণীর মারফৎ কোন আইন প্রণয়ন করার অনুরোধ জানাতে পারেন বা কোন আইনের খসড়া পাঠিয়ে সেটি আইনে পরিণত করার অনুরোধ জানাতে পারেন। বর্তমানে অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই রকম যে, সংবিধানানুযায়ী রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসে বাণী পাঠানোর যে ক্ষমতা ভোগ করেন, তাঁর সাহায্যেই তিনি আইনপ্রণয়নের ব্যাপারে উদ্যোগী হতে পারেন। কংগ্রেসের বিবেচনাধীন ও অনুমোদিত আইনের অধিকাংশই শাসনবিভাগ থেকে প্রেরিত হয়।

বাণী প্রেরণ করা ছাড়াও রাষ্ট্রপতির আইনপ্রণয়ন সম্বন্ধীয় আরো একটি ক্ষমতা আছে। সেটি হল ভেটো প্রয়োগ বা রাষ্ট্রপতির অনুমোদনার্থে যে সব আইনের খসড়া প্রেরিত হয়, তা অনুমোদন না করা। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ও স্বাক্ষরের জন্যে যে আইনের খসড়া পাঠানো হয়, তা পরবর্তী দশদিনের মধ্যে কংগ্রেসে ফিরে আসার কথা। তা না হলে সেটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ও স্বাক্ষর ব্যতীতই আইনে পরিণত হবে। কিন্তু ঐ দশদিনের মধ্যে যদি কংগ্রেসের অধিবেশন কোন কারণে বন্ধ হয়, তাহলে রাষ্ট্রপতি আইনের খসড়া ফেরৎ না পাঠালেও সেগুলি আইনে পরিণত হয় না। ভেটো প্রয়োগের এই উপায়টিই বিশেষ কার্যকরী। ভেটো প্রয়োগ করে রাষ্ট্রপতি যে কেবল একটি প্রস্তাবিত আইন নাকচ করে দেন, তা নয়—তাঁর ভেটো প্রয়োগের সিদ্ধান্ত আগে থেকে প্রচার করে তিনি প্রস্তাবিত আইনটিতে নিজের সুপারিশক্রমে রদবদল ঘটাতে পারেন।

সংবিধানবহির্ভূত যে সমস্ত উপায়ে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের উপর প্রভাব বিস্তার করেন, সেগুলি হল : ভেটো প্রয়োগের ভয় প্রদর্শন ; পৃষ্ঠপোষকতা (patronage) করা ; বেতারবার্তা, জনসভা বা সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে সরাসরি আবেদন জানিয়ে তাদের সমর্থন লাভ করা।

বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা
Judicial powers

রাষ্ট্রপতির বিচারবিভাগীয় ক্ষমতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, তিনি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগকর্তা। তিনি দণ্ডিত অপরাধীকে ক্ষমা করতে পারেন বা শাস্তির মেয়াদ কমিয়ে দিতে পারেন।

সবশেষে দলনেতা হিসাবে রাষ্ট্রপতি যে ক্ষমতা লাভ করে থাকেন, তার আলোচনা আবশ্যক। রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের আলোচনা প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে

যে, বর্তমানে মার্কিন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সম্পূর্ণভাবে দলীয় ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের সময়ে জনসাধারণকে যেসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, নির্বাচনের পরে সেগুলি কাজে পরিণত করা দরকার। এজন্যে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসে তাঁর দলের সদস্যদের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলেন ও অনেক সময়ে তাঁদের সাহায্যে তাঁর অভিপ্রেত আইন কংগ্রেসকে দিয়ে অনুমোদন করান। সেনেট ও প্রতিনিধিসভার সদস্যদের মনোনয়ন ও নির্বাচনে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা একেবারে অবান্তর নয়। বিশেষত তাঁর স্থলাভিষিক্ত কে হবেন, তা নির্ধারণ করাতে রাষ্ট্রপতির যথেষ্ট হাত আছে।

দলনেতা হিসাবে ক্ষমতা (Powers as Party Leader)

রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন অধিকার ও সুবিধা ভোগ করে থাকেন। তাঁর কার্যকালে তিনি সমস্ত আইনের উর্ধ্বে থাকেন। কেবলমাত্র রাষ্ট্রদ্রোহিতা, উৎকোচ গ্রহণ বা অন্যান্য কোন গুরুতর অপরাধে তাঁকে অভিযুক্ত করা চলে।

রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা (Position of the President :

মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা আলোচনা করলে স্বভাবতই প্রশ্ন হতে পারে, তাঁর পদমর্যাদা কি? একদিকে দেখা গেছে যে, তিনি এক রকম অসীম ক্ষমতার অধিকারী; অপরদিকে দেখা গেছে যে, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসৃত হওয়ার দরুণ মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নানাভাবে সীমাবদ্ধ হয়েছে। অবস্থার এই দুটি দিক বিচার করলে মার্কিন রাষ্ট্রপতির প্রকৃত পদমর্যাদা সম্বন্ধে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব।

একথা সত্য যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ফলে মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নানাভাবে বিভিন্ন সংস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। অন্যদিকে একথাও মনে রাখতে হবে যে কোন সংবিধানের ব্যাখ্যা চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট হতে পারে না। যুগ ও কালের প্রয়োজনে তা পরিবর্তিত হতে বাধ্য। দেশের অবস্থা অনুযায়ী সংবিধানেব অর্থ স্থির হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও সেই ব্যাপারই ঘটেছে। এই শতাব্দীর ত্রিশ শতকে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কবলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও পড়তে হয়েছিল এবং সেই সময়ে প্রধানত রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের বলিষ্ঠ ভূমিকার বলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই বিপর্যয় থেকে উদ্ধার লাভ করে। সেই সময় থেকে—বিশেষত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর যুগে যে-কোন রাষ্ট্রে শাসনবিভাগের ক্ষমতা অত্যন্ত বেড়ে গেছে। এই ক্ষমতাবৃদ্ধির কারণ হিসাবে নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রবণতাকে

(tendencies) চিহ্নিত করা যায়। সে আলোচনা এ-ক্ষেত্রে আবান্তর। কিন্তু শাসনবিভাগের ক্ষমতাবৃদ্ধির নিদর্শন খুঁজে পাওয়া খুব কষ্টসাধ্য নয়। ইংলণ্ডে মন্ত্রিপরিষদের (Cabinet) আধুনিক ক্ষমতাবৃদ্ধি (যাকে কোন লেখক 'মন্ত্রিসভার স্বৈরশাসন' বলে বর্ণনা করেছেন), সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনপরিষদের (Federal Council) যুদ্ধোত্তরকালে ক্ষমতাবৃদ্ধি—এ সমস্ত আধুনিক রাষ্ট্রে শাসক-বিভাগের গুরুত্ব ও ক্ষমতাবৃদ্ধিই প্রমাণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুরূপ ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। যে যে কারণে অধুনা উপরি-উল্লিখিত দেশগুলিতে শাসনবিভাগ ক্ষমতাশালী হয়েছে, ঠিক সেই কারণেই মার্কিন রাষ্ট্রপতি বর্তমানে অভূতপূর্ব ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন। অন্য কথায় বলতে গেলে, সংবিধান-প্রণেতাদেব কল্পনায বাষ্ট্রপতির যে চিত্র স্থান পেয়েছিল, বর্তমানে তা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। শাসনবিভাগ, আইনবিভাগ ও বিচার-বিভাগের সাম্য সংবিধান-প্রণেতাবা কল্পনা করেছিলেন; বর্তমানে শাসনবিভাগ অপব বিভাগ দুটিব উপরে স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত কবেছে। সংবিধানের বিবর্তনপ্রসঙ্গে আলোচনাক্রমে দেখা গেছে, বাষ্ট্রপতিব ক্ষমতা কিভাবে সংবিধান-বহির্ভূত উপায়ে সম্প্রসারিত হয়েছে। রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা কী তা বুঝতে গেলে এই সংবিধান-বহির্ভূত উপায়গুলি মনে রাখতে হবে। এই সংবিধান-বহির্ভূত উপাযগুলির দ্বারা মার্কিন বাষ্ট্রপতির ক্ষমতাব সীমাগুলি যথেষ্ট পবিমাণে সঙ্কুচিত হয়েছে। অন্যদিকে সংবিধানের বলে তিনি যে-সব ক্ষমতা লাভ কবেছেন, সেগুলি কোনভাবেই হ্রাস পায় নি। কাজেই মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে যদি পৃথিবীব সবচেযে ক্ষমতাশালী গণতান্ত্রিক শাসন বলা হয়, তা হলে কোন অতিবঞ্জন হবে না। প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে, মার্কিন বাষ্ট্রপতির ক্ষমতাবৃদ্ধি ও ইংলণ্ডেব প্রধানমন্ত্রীব ক্ষমতাবৃদ্ধিব মধ্যে তুলনা কবলে মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাবৃদ্ধিকে অনেক লক্ষণীয় বলা যায়। কেন না, ইংলণ্ডের প্রধান-মন্ত্রী যে সংবিধানেব অধীন, তা অলিখিত—কাজেই নমনীয, কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতি যে সংবিধানের অধীন, তা লিখিত কাজেই অনমনীয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাবৃদ্ধি প্রসঙ্গে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে বর্তমানে বিবিধ উপায়ে মার্কিন বাষ্ট্রপতি আইন-প্রণযনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন। সংবিধান-রচয়িতাদের উদ্দেশ্য ছিল, আইন প্রণয়নেব সম্পূর্ণ ভার থাকবে কেন্দ্রীয় আইন-সভার হাতে; কিন্তু বর্তমানে বহু আইনের উৎপত্তি কেন্দ্রীয় আইনসভার বাইরে—অধিকাংশ আইনই আইনসভায় আলোচিত হবার আগেই রাষ্ট্রপতির সমর্থন ও আশীর্বাদ লাভ করে। রাষ্ট্রপতি যে আইনগুলির প্রবর্তন চান,

সেগুলি আইনসভায় নিজের দলীয় সদস্যদের সাহায্যে তিনি অনুমোদন করিয়ে নেন। সাম্প্রতিক কালে রাষ্ট্রপতির বর্ধিত ক্ষমতার আলোকে আইনসভার উপর তাঁর এই প্রভাব লক্ষ্য করা দরকার। জনসাধারণের সহায়তা ছাড়া অন্য কোন ভাবেই রাষ্ট্রপতি আইনসভার উপর স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করতে পারেন না। তাই বলা হয়েছে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি স্বৈরাচারী হতে পারেন কিন্তু তাঁর স্বৈরাচার প্রযুক্ত হবে জনসাধারণে বিরুদ্ধে নয়, বরং জনসাধারণের স্বপক্ষে[1]।

মার্কিন রাষ্ট্রপতির অসীম ক্ষমতা আরেকটি কারণের উপরও নির্ভরশীল। তা হল রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিত্ব। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা প্রধানমন্ত্রীর পদে যিনি আসীন, তাঁর উপর নির্ভর করে—অ্যাস্‌কুইথের (Asquith) এই মন্তব্য যে কোন শাসকের পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য। মার্কিন রাষ্ট্রপতি প্রসঙ্গে এই মন্তব্যের সত্যতা আরো বেশী মর্মগ্রাহী এই কারণে যে, ইংলণ্ডে যে-রকম আইনসভা ও মন্ত্রিসভার (Cabinet) মধ্য সহযোগিতার ক্ষেত্র আছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তেমন কিছু নেই—সেখানে শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চিরকাল চলে আসছে। দৃঢ়চেতা ও বলিষ্ঠ রাষ্ট্রপতি থাকলে আইনসভা তাঁকে অনুসরণ করে, আবার রাষ্ট্রপতি দুর্বল হলে তাঁকে আইনসভার নেতৃত্ব অনুসরণ করতে হয়। রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিত্বের উপর তাঁর ক্ষমতা অনেকটা নির্ভর করে। আবার কেবল রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিত্বই নয়, দেশের অবস্থার উপরও রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা অনেকাংশে নির্ভর করে। তাই মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদ ক্ষমতাসীন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও দেশের অবস্থার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে[2]।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি
(The British Prime Minister and the American President)

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রপতির তুলনা করলে দেখা যায়, মার্কিন রাষ্ট্রপতির কার্যকাল নির্দিষ্ট—কিন্তু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যকাল সংবিধানের দ্বারা নির্ধারিত নয়। আইনসভার উপরে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্য প্রত্যক্ষ, মার্কিন রাষ্ট্রপতির প্রাধান্য পরোক্ষ। কাজেই আইনপ্রণয়নের ব্যাপারে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা অনেক বেশী ব্যাপক। দুজনেই তাঁদের দলের নেতা এবং দুজনেই দলের অনুগত্য

1 "He might be a tyrant not against the masses, but with the masses."—Bryce.

2 "The Presidency has been one thing at one time, another at another, varying with the man who occupied the office and with the circumstances that surrounded him." Wilson.

লাভ করে থাকেন। তবে আইনসভা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বিরোধিতা করলে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়, কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতির কার্যকাল কোন ক্ষেত্রেই আইনসভার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না (কেবল গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্র ছাড়া)। সাধারণত বলা যায়, যতক্ষণ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আইনসভার সমর্থন লাভ করেন, ততক্ষণ তাঁর ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার চেয়ে বেশী—কেন না, তাহলে শাসনবিভাগ (মন্ত্রি পরিষদ) ও আইনবিভাগের (আইনসভার) মধ্যে সহযোগিতা দেখা যায়। পক্ষান্তরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনবিভাগ ও আইন-বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চিরাচরিত; রাষ্ট্রপতি অত্যন্ত ব্যক্তিত্বশালী হলে এবং আইনসভার দুটি কক্ষেই তাঁর দলের প্রাধান্য থাকলে তিনি কার্যত স্বৈরশাসন করে থাকেন। তবে মার্কিণ রাষ্ট্রপতি যুগপৎ শাসনবিভাগের প্রধান ও রাষ্ট্রের প্রধান; ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেবল শাসনবিভাগের প্রধান—রাষ্ট্রের প্রধান হলেন ইংলণ্ডের রাজা। এজন্য বলা হয় যে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি যুগপৎ রাজা ও প্রধানমন্ত্রী[3]। তিনি শাসনবিভাগের ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষ, জাতীয় জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, রাষ্ট্রের প্রধান এবং সাম্প্রতিক প্রবণতাগুলি লক্ষ্য করে বলা যায়, তিনি দেশের প্রধান আইন-প্রণেতাও বটেন।[4]

মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি (The Vice-President).

মার্কিন সংবিধানে একজন উপরাষ্ট্রপতির পদ প্রবর্তিত হয়েছে। রাষ্ট্রপতির পরে তাঁর স্থান, কিন্তু রাষ্ট্রপতি প্রভূত ক্ষমতা অধিকারী বলে উপরাষ্ট্রপতির ক্ষমতা খুব বেশী নয়। সাধারণত রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি দেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের লোক। সংবিধান অনুসারে উপরাষ্ট্রপতির কাজ হল সেনেটের (কেন্দ্রীয় আইনসভার ঊর্ধ্বকক্ষ) সভাপতিত্ব করা। স্বীয় পদাধিকারে তিনি এই ক্ষমতা লাভ করেন। প্রসঙ্গত বলা চলে, কেন্দ্রীয় আইনসভার নিম্নকক্ষ বা প্রতিনিধিসভার উপর ঐ সভার সভাপতির (Speaker) যে প্রাধান্য, সেনেটের উপর উপরাষ্ট্রপতির প্রাধান্য তার চেয়ে কম।

---

3 "The President of the U.S.A. is both more and less than a king. He is also at the same time both more and less than a Prime Minister" Laski.

4 প্রসঙ্গতঃ ব্রাইসের যুক্তিপূর্ণ মন্তব্যের উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে :

"Socially regarded, the American President deserves nothing but admiration. The President is simply the first citizen of a free nation, depending for his dignity on no title, no official dress, no insignia of State ··There is a great respect for the office, and a corresponding respect for the man as the holder of the office, if he has done nothing to degrade it. There is no servility, no fictitious self-abasement on the part of the citizens, but a simple and hearty deference to one who represents the majesty of the nation···No President dare violate social decorum as European sovereigns haveoften done. If he did, he would be the first to suffer."

উপরাষ্ট্রপতির পদ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে রাষ্ট্রপতির মৃত্যু, পদচ্যুতি, পদত্যাগ, বা অনুপস্থিতি ঘটলে উপরাষ্ট্রপতি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের মৃত্যুর পরে উপরাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এ ছাড়াও দলের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি হিসাবে উপরাষ্ট্রপতি কিছু প্রাধান্যের অধিকারী। অধুনা দেখা গেছে, রাষ্ট্রপতি নানা ক্ষেত্রে উপরাষ্ট্রপতির সহায়তা ও সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, অধুনা মার্কিন উপরাষ্ট্রপতির বিদেশ সফর অনেক সময়ে মার্কিন বৈদেশিক নীতি ও শাসনবিভাগের কাজে লাগানো হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদের অক্ষম অস্তিত্ব (The Cabinet, an insignificant entity) ঃ

ইংলণ্ডের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও একটি মন্ত্রিপরিষদ আছে এবং ইংলণ্ডের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদ সংবিধান কর্তৃক সৃষ্ট নয়। কিন্তু এই দুটি সংস্থার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ইংলণ্ডে মন্ত্রিপরিষদ শাসনবিভাগে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সংস্থা। পক্ষান্তরে মার্কিন মন্ত্রিপরিষদ একটি অধস্তন সংস্থা। মার্কিন রাষ্ট্রপতি তাঁর কাজের সাহায্যার্থে দশজন কর্মসচিব নিযুক্ত করেন; এই দশজন কর্মসচিবকে নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত। এঁদের নিয়োগ ও কার্যকালের স্থায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রপতির উপর নির্ভর করে। এঁদের কাজ বিভিন্ন বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করা। ইংলণ্ডের মন্ত্রিপরিষদের সদস্যেরা আইনসভারও সদস্য এবং আইনসভারও কাছে তারা দায়ী। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যেরা আইনসভার সভ্য নন এবং আইনসভার কাছে তাঁদের কোন দায়িত্বও নেই। তাঁদের দায়িত্ব আনুগত্য, বশ্যতা—সমস্ত কিছু রাষ্ট্রপতির কাছে। ইংলণ্ডে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যেরা প্রধানমন্ত্রীর সমগোত্রভুক্ত। কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতি তাঁর মন্ত্রিপরিষদের উপর নিরঙ্কুশ প্রাধান্যের অধিকারী। তাই ইংলণ্ডে মন্ত্রিপরিষদের যে যৌথ দায়িত্ব দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তা অশ্রুতপূর্ব। প্রকৃত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির করায়ত্ত বলে দায়িত্বও প্রধানত তাঁর। এজন্যে বলা হয়েছে, ইউরোপে গণতান্ত্রিক সরকার আমাদের মনে মন্ত্রি-পরিষদের যে ধারণা সৃষ্টি করেছে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদ সে ধারণার অনুবর্তী নয়[4]।

---

4 "The Cabinet in the U. S. A. hardly corresponds to the basic idea of a cabinet to which representative Government in Europe has accustomed us."—Laski.

কেন্দ্রীয় আইনসভা

(Congress)

মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের আইন-সংক্রান্ত ক্ষমতাগুলি কেন্দ্রীয় আইনসভাতেই ন্যস্ত হয়েছে। এই কেন্দ্রীয় আইনসভার নাম হল কংগ্রেস এবং পূর্বেই বলা হয়েছে, এই কংগ্রেস দ্বিকক্ষবিশিষ্ট (bicameral)।

দ্বিকক্ষযুক্ত সংসদ
Bicameral Legislature

কংগ্রেসের উচ্চকক্ষটির নাম হল সেনেট (Senate) এবং নিম্নকক্ষটির নাম হল প্রতিনিধিসভা (House of Representatives)। এই দুই কক্ষের গঠনপদ্ধতি এবং কর্তব্য বিভিন্ন ধরণের। সংবিধানে দুই কক্ষের মধ্যে এই পার্থক্যগুলি দেখা যায়। প্রথমেই বলতে হয়, প্রতিনিধিসভার কাজ হল সমগ্র জাতির (nation) প্রতিনিধিত্ব করা ; পক্ষান্তরে সেনেটের কাজ হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব করা।

গঠনপদ্ধতির দিক থেকে দেখলে যে পার্থক্য চোখে পড়ে, তা হল প্রতিনিধিসভার সদস্যসংখ্যা নির্দিষ্ট—৪৩৫। সেনেটের সদস্যসংখ্যা অঙ্গরাজ্যগুলির সংখ্যার উপর নির্ভর করে, প্রতিটি অঙ্গরাজ্য সেনেটে দুজন করে প্রতিনিধি পাঠাতে পারে। প্রতিনিধিসভার সদস্যেরা নির্বাচিত হন জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং প্রতিরাজ্য থেকে অন্তত একজন প্রতিনিধি প্রতিনিধিসভায় থাকা দরকার। অপরপক্ষে, সেনেটে সদস্য নির্বাচনের অন্তর্নিহিত নীতি হল সম-প্রতিনিধিত্বের (equal representation) নীতি। কতকগুলি যুক্তরাষ্ট্রে

উভয়কক্ষের সংগঠন রীতি
Composition of the two Houses

(মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া) সম-প্রতিনিধিত্বের নীতি মেনে চলা হয়। তার কারণ প্রধানত হল এই যে কেন্দ্রীয় আইনসভার নিম্নকক্ষে জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচন হয় বলে ছোট অঙ্গরাজ্যগুলি এখানে খুব সুবিধা করতে পারে না। এমনও দেখা গেছে যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিনিধিসভায় সাতটি অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধিসংখ্যা হল ১৭৩, আর আটটি অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধিসংখ্যা হল ৫৩। ছোট অঙ্গরাজ্যগুলির স্বার্থ যাতে অবহেলিত না হয়, যাতে তারা বড় অঙ্গরাজ্যগুলির সমকক্ষ বলে বিবেচিত হতে পারে সেজন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসের উচ্চকক্ষে সমপ্রতিনিধিত্বের নীতি অনুসৃত হয়েছে। বর্তমানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যের

[illegible] ; সেনেটে সদস্যসংখ্যা তাই ১৯০। প্রতিনিধিসভার সদস্যেরা [illegible] দু-বছরের জন্তে নির্বাচিত হন। সেনেটের সদস্যেরা নির্বাচিত হন ছয় বছরের জন্তে। প্রতি দু-বছর অন্তর সেনেটের সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশকে পুনর্নির্বাচিত হতে হয়। প্রতিনিধিসভার সভাপতিকে বলা হয় (Speaker) এবং তিনি প্রতিনিধিসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হন। সেনেটের সভাপতি হলেন মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি। শেষত উল্লেখযোগ্য, সেনেটে নির্বাচনপ্রার্থী হতে গেলে অন্তত ত্রিশ বছর বয়স ও অন্তত নয় বছর স্থায়ীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতে হবে। প্রতিনিধিসভার নির্বাচনপ্রার্থী হতে গেলে বয়স অন্তত পঁচিশ বছর হওয়া চাই এবং অন্তত সাত বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী বসবাস থাকা দরকার।

কংগ্রেসের ক্ষমতাগুলি আলোচনা করার আগে কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার। ব্রিটিশ আইনসভার মত কংগ্রেস সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন আইনসভা নয়। এর কারণ একাধিক আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেবল কেন্দ্রীয় আইনসভার একচেটিয়া নয়, অঙ্গরাজ্যগুলির আইনসভাগুলিও আইন প্রণয়ন করে। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস অনুমোদন করলেই আইনের খসড়া (bill) আইনে পরিণত হয় না—রাষ্ট্রপতির অনুমোদনও একান্ত আবশ্যক। পূর্বেই দেখা গেছে, ভেটো প্রয়োগ ও অন্যান্য বিবিধ উপায়ে রাষ্ট্রপতি কি ভাবে কংগ্রেসের আইন-প্রণয়নের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করেন। তৃতীয়ত, বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার দ্বারা কংগ্রেসের আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা সীমিত হয়েছে। চতুর্থত, কংগ্রেস শাসন-কর্তৃপক্ষকে নিযুক্ত বা পদচ্যুত কিছুই করতে পারে না। পঞ্চমত, কংগ্রেস এমন একটি সংবিধানের অধীন যা ইচ্ছামত সংশোধন করা যায় না।

কংগ্রেস সার্বভৌম ক্ষমতা-সম্পন্ন নয়
Congress not a Sovereign Legislative organ

কেবল তাই নয়, ব্রিটিশ আইনসভার মত কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন ও বিতাড়ন (Making and Unmaking Ministries) করতে পারে না। তাছাড়া কংগ্রেস ব্রিটিশ আইনসভার মত বিতর্কসভাও (Deliberative Chamber) নয়। ব্রিটিশ আইনসভার মত কংগ্রেসে প্রশ্নোত্তরের কোন অনুষ্ঠান নেই—কারণ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যেরা কংগ্রেসে উপস্থিত হন না। কাজেই নানাদিক বিচার করে দেখলে বলতে হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভা প্রধানত আইন-প্রণয়নকারী একটি সংস্থামাত্র।

সংবিধানে কংগ্রেসের বিভিন্ন ক্ষমতা উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমে উল্লেখ

[illegible] ক্ষমতা—কংগ্রেস দেশে নানা প্রকার কর ধার্য করতে পারে ও রাজস্ব আদায় করতে পারে। কংগ্রেস অন্যান্য রাষ্ট্রকে টাকা ধার দিতেও পারে। কংগ্রেসের আরেকটি বড় ক্ষমতা হল জাতীয় প্রতিরক্ষা সম্পর্কীয় ক্ষমতা। সেনাবাহিনীর খরচ কংগ্রেসের আয়ত্তাধীন বলে কংগ্রেস কার্যত সেনাবাহিনীর আকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া যুদ্ধ ঘোষণা করা একমাত্র কংগ্রেসের হাতে—রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসকে অগ্রাহ্য করে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন না। শিল্প-বাণিজ্য সংক্রান্ত ক্ষমতাও কংগ্রেসের একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা। এই ক্ষমতার মাধ্যমে কংগ্রেস আন্তঃ-রাজ্য (inter-state) ও অন্তঃ-রাষ্ট্র বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে এবং এই ক্ষমতার সাহায্যে কংগ্রেস পরিবহন ব্যবস্থাও নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া কংগ্রেস আর্থিক ব্যবস্থা (monetary system) নিয়ন্ত্রণ করে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জেলা ও রাজ্যগুলি সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করে। পরোক্ষভাবে কংগ্রেস শাসনবিভাগের উপর কিছু প্রাধান্য বিস্তার করে। যেমন, নতুন বিভাগ (department) ও পদ (office) সৃষ্টি করা এবং আইনের সাহায্যে উক্ত বিভাগ ও পদগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা ইত্যাদি। অর্থমঞ্জুরী ক্ষমতার সাহায্যে কংগ্রেস কার্যত সরকারী কর্মচারীদের মাহিনা ও তাদের কর্তব্য স্থির করে থাকে। পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও কংগ্রেসের ক্ষমতা আছে। চুক্তি অনুমোদন (ratification), কূটনৈতিক পদ সৃষ্টি, দেশে বিদেশীর আগমন নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির দ্বারা কংগ্রেস পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য প্রাধান্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়। সব শেষে উল্লেখ করতে হয় কংগ্রেসের একটি বিশেষ ক্ষমতার কথা—গুরুতর অভিযোগ (impeachment) উত্থাপন ও বিচার করা প্রতিনিধিসভা অভিযোগ উত্থাপন করে এবং সেনেট তার বিচার করে।

কংগ্রেসের কার্য ও ক্ষমতা
Powers & Functions of the Congress

কংগ্রেসের এই ক্ষমতাগুলি সংবিধানে উল্লিখিত হয়েছে। নিহিত ক্ষমতার (implied powers) নীতির বলে কংগ্রেসের ক্ষমতাগুলি কালক্রমে যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয়েছে।

কংগ্রেসের ক্ষমতার আলোকে প্রতিনিধিসভা ও সেনেটের ক্ষমতাগুলি আলোচনা করা চলে। উভয় কক্ষের কাজে অনেকটা মিল আছে এই কারণে যে, উভয় কক্ষই প্রস্তাব উত্থাপন ও বিবেচনা করে এবং বিবিধ আইন অনুমোদন করে। তা সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য, প্রতিটি কক্ষেরই কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা আছে যা থেকে অপর কক্ষটি বঞ্চিত।

সেনেটের বিশেষ ক্ষমতার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল নিম্নোক্ত ক্ষমতা দুটি : (১) মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রীয় পদে (federal office) যে সমস্ত নিয়োগ করে থাকেন, তা সেনেটের অনুমোদন ব্যতীত বলবৎ হতে পারে না ; (২) বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যে সব চুক্তি প্রণীত হয়, সেগুলি কার্যকরী করার জন্তে সেনেটের অনুমোদন প্রয়োজন। ক্ষমতা দুটির প্রকৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, এদের মাধ্যমে সেনেট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শাসন ও পররাষ্ট্রীয় সম্পর্কের উপর কত সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা চলে ভার্সাই চুক্তির কথা। মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ভার্সাই চুক্তিতে সই করেন বটে, কিন্তু সেনেট ঐ চুক্তি অনুমোদন না করায় ঐ-চুক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বলবৎ হয় নি। এই একটি উদাহরণই সেনেটের ক্ষমতা সম্বন্ধে ধারণা সৃষ্টি করবার পক্ষে যথেষ্ট। তাছাড়া দ্বিতীয় কক্ষের (Second Chamber) যে সমস্ত উপযোগিতা তত্ত্বগতভাবে স্বীকৃত হয়েছে, সেগুলির বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় আইনসভার উর্ধ্বকক্ষের কার্যধারা পর্যালোচনা করলে।

সেনেটের বিশেষ ক্ষমতা
Special powers of the Senate

প্রতিনিধিসভার বিশেষ ক্ষমতা হল অর্থসংক্রান্ত আইন উত্থাপন করা। এ ক্ষমতা সেনেটের নেই। তাছাড়া প্রতিনিধিসভার আরেকটি বিশেষ ক্ষমতা হল রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতা, উৎকোচ গ্রহণ, অসদ্ব্যবহার ইত্যাদি কোন গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করা।

প্রতিনিধিসভার বিশেষ ক্ষমতা
Special Powers of the House of Representatives

বর্তমানে সরকারের একটি আবশ্যকীয় অঙ্গ—কমিটি ব্যবস্থা—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও গৃহীত হয়েছে। কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয় কক্ষেই একাধিক কমিটি আছে। কমিটিগুলির উপযোগিতা হল, আইনসভার অনেকটা সময় বাঁচানো এবং যে কাজ আগে আইনসভা করত, তা অধিকতর যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করা। এই অধিকতর যোগ্যতার কারণ হল, কমিটিগুলির সদস্যসংখ্যা (একটি কমিটি ছাড়া) আইনসভার কোন কক্ষের সদস্যসংখ্যার চেয়ে কম এবং কমিটির গঠনের সময়ে দেখা হয়, সদস্যেরা যেন বিচার্য সমস্যাগুলির প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত ও সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হন।

কমিটি ব্যবস্থা
Committee System

ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা আলোচনা করলে যে বৈশিষ্ট্যগুলি সহজেই

দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তার অন্যতম হল এই যে, আইনসভায় নেতৃত্ব থাকে সরকারের হাতে; সরকারের প্রতিপক্ষ হিসাবে আইনসভায় থাকে বিরোধী দল। কংগ্রেসে কিন্তু সরকার বা বিরোধী দল কোনটিই দেখতে পাওয়া যায় না। ব্রিটিশ আইনসভায় প্রকৃত নেতৃত্ব থাকে মন্ত্রিপরিষদের হাতে। মার্কিন আইনসভায় এহেন নেতৃত্ব দেখা যায় না; মার্কিন সংবিধানের যে প্রকৃতি, তাতে কংগ্রেসে এ রকম নেতৃত্ব থাকা সম্ভবও নয়। প্রশ্ন হতে পারে, কংগ্রেসের নেতৃত্ব কোন সংস্থার হাতে?

বৃটিশ সংসদের সঙ্গে তুলনা
Comparison with the British Parliament

এই শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত প্রতিনিধিসভার নেতৃত্ব ছিল সভাপতির (Speaker) হাতে। বর্তমানে নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে প্রতিনিধিসভার নেতৃত্ব ন্যস্ত হয়েছে একাধিক ব্যক্তির হাতে যাঁদের মধ্যে সভাপতিও আছেন। অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকটির সভাপতিও অন্তর্ভুক্ত। সেনেটের নেতৃত্ব কিন্তু এর সভাপতি উপরাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত নয়। সাধারণত সেনেটের নেতৃত্ব অর্পিত হয় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সমিতির সভাপতিদের হাতে।

প্রতিনিধিসভার সভাপতির পদ আলোচনার দাবী রাখে। ব্রিটিশ আইনসভার সভাপতির সঙ্গে প্রতিনিধিসভার সভাপতির এক নামগত মিল ছাড়া খুব বেশী মিল নেই। নির্বাচনের পরে ব্রিটিশ সভাপতি আর কোন দলের সদস্য থাকেন না। তিনি হন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ—সব দলের সদস্যের প্রতি সুবিচার করা তাঁর কাজ। ফলে পরবর্তী নির্বাচনে তাঁর বিরোধিতা করা হয় না। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় বর্তমানে প্রথা হয়ে গেছে যে, সভাপতি যতদিন ইচ্ছা সভাপতিত্ব করতে পারবেন। মার্কিন সভাপতি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নগোত্রের মানুষ। সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হবার পরে তিনি দলত্যাগ ত' করেনই না, বরং তাঁর পদের সুযোগ নিয়ে নিজের দলের যথাসম্ভব উপকার করার চেষ্টা করেন। তাঁর পক্ষে নিরপেক্ষতার কোন প্রশ্ন ওঠে না। তিনি প্রতিনিধিসভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের একজন সদস্য। তাঁর দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালে তাঁর সভাপতিত্বেরও অবসান হয়।

প্রতিনিধিসভাব সভাপতি
Speaker

পূর্বেই বলা হয়েছে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত প্রতিনিধিসভার একছত্র নেতৃত্ব ছিল সভাপতির হাতে এবং পরে নানা সাংবিধানিক বিবর্তনের ফলে প্রতিনিধিসভার নেতৃত্ব বর্তমানে সভাপতি সমেত একাধিক ব্যক্তির হাতে গেছে। তা সত্ত্বেও সভাপতির ক্ষমতা কিন্তু যথেষ্টই আছে। আইনপ্রণয়নের

ব্যাপারে তিনি তাঁর ক্ষমতা ও প্রভাব উভয়েরই প্রয়োগ তাঁর দলের স্বার্থে করে থাকেন। কাজেই প্রতিনিধিসভার উপর তিনি যে ধরনের নেতৃত্ব খাটাতে পারেন, ব্রিটিশ সভাপতির ক্ষেত্রে তা কখনও দেখা যায় না। তিনি প্রতিনিধিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করেন, নীতিসংক্রান্ত ব্যাপারে (policy matters) যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন এবং সময়ে সময়ে কৌশল ও হস্তক্ষেপের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ আইনপ্রণয়নের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেন।

মার্কিন সভাপতির ক্ষমতার উৎস কি, তার উত্তর হল তিনি প্রতিনিধি সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলেব একজন নেতৃত্বস্থানীয় লোক এবং এটাই হল তার উৎস। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অন্যতম নেতা হিসাবে তাঁর কাজ হল তাঁর দলের স্বার্থ ও নীতি যাতে সিদ্ধ হয়, তাতে সহাযতা করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করেন—অবশ্য দলের স্বার্থ বাখতে গিযে তিনি অন্য দলের প্রতি কোন অন্যায় করতে পারেন না। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের নেতা হিসাবে আইনসভারও নেতা। কংগ্রেসে ঐ পদবিশিষ্ট কেউ নেই, অথচ কোন সভার নেতৃত্ব গ্রহণের জন্যে একজন লোক আবশ্যক। প্রতিনিধিসভার নেতৃত্ব সভাপতির হাতে স্বাভাবিকভাবে এই জন্যে যে প্রতিনিধিসভার সভাপতি ছাড়া আর কারোবই স্বীয় পদেব জোরে নেতৃত্ব লাভ করবার ক্ষমতা নেই।

মার্কিন সভাপতিব অন্যান্য ক্ষমতাব মধ্যে উল্লেখ করতে হয়, সভাপতি হিসাবে সভা পরিচালনা ও সভার নিযম-কানুন প্রযোগ ও ব্যাখ্যা করা।

মার্কিন সেনেটকে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী দ্বিতীয় কক্ষ (most powerful Second Chamber in the world) বলা হয। এই অভিধাটি কতদূর যুক্তিযুক্ত, তা বিচার করতে গেলে প্রথমেই দেখা যায়, সংবিধানের বিবর্তনের ফলে সেনেটের ক্ষমতা ও প্রভাব বেড়ে গেছে এবং প্রতিনিধিসভার ক্ষমতা ও প্রভাব কমে গেছে।[1] সেনেটের এই মর্যাদার মূলে কতকগুলি কারণ আছে। সর্বাগ্রে বলা দবকার, যে-সব দেশে আইন-সভার দুটি কক্ষ আছে, সেখানে নিম্নকক্ষটি অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন হয় এই কারণে যে মন্ত্রিপরিষদ তার কাছে দায়ী থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রবর্তিত হবার ফলে শাসনকর্তৃপক্ষ আইনসভার কাছে দায়ী নয়। এর ফলে আইনসভার উর্ধ্বকক্ষ নিম্নকক্ষের তুলনায় নিম্নপদস্থ বলে

সেনেটের গুরুত্ব
Importance of the Senate

1......"the Senate is not only as strong as but probably stronger than the lower house of the United States Congress".—Wheare.

বিবেচিত হয় না। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবর্তনের ফলে অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, সেনেটকে কোন কারণেই প্রতিনিধিসভার তুলনায় নিম্নপদস্থ বলা যায় না—তাকে অন্তত প্রতিনিধিসভার সমগোত্রীয় বলে স্বীকার না করে উপায় নেই। অর্থাৎ অন্যান্য দেশের আইনসভার নিম্নকক্ষের হাতে সরকার গঠন ও বিতাড়নের যে ক্ষমতা থাকে, প্রতিনিধিসভার সে ক্ষমতা নেই বলে পরোক্ষভাবে সেনেটের পদবৃদ্ধি ঘটেছে। কেবল তাই নয়। সেনেটে সমপ্রতিনিধিত্ব নীতি অনুসৃত হয় এবং সেনেটের গুরুত্বের কারণ হিসাবে এই নীতির মূল্যও কম নয়। যখন সেনেটে অঙ্গরাজ্যগুলির স্বার্থসংক্রান্ত কোন বিষয় বিবেচনাধীন থাকে, তখন ছোট অঙ্গবাজ্যগুলির এটুকু ক্ষমতা থাকে যে তারা নিজেদের বক্তব্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারে। প্রতিনিধিসভার মত সেনেটে তাদের অবস্থা অসহায় নয়। আরো একটি কারণে সেনেট প্রতিনিধিসভার মুখাপেক্ষী নয়। তা হল এই যে, সেনেটের সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন বলে তাঁরা নিজেদের জাতির প্রতিনিধি বলে দাবী করতে পারেন এবং সে হিসাবে কাজও করতে পারেন—ইংলণ্ডে উধ্বর্কক্ষ হাউস অব লর্ডস্ যা পারে না।

এ ছাড়াও বিবিধ কারণ আছে, যার সাহায্যে সেনেটের গুরুত্ব এত বৃদ্ধি পেয়েছে। সেনেটেব আকৃতি ছোট, এর সদস্যেরা দীর্ঘকাল কাজ করতে পারেন এবং সাধারণত দেখা যায়, প্রতিনিধিসভার সদস্যদের তুলনায় সেনেটের সদস্যদের গুণ ও ক্ষমতা—বুদ্ধিগত, শিক্ষাগত বা যে ধরনেরই হোক না কেন—অনেক বেশী। সেনেটের নিজস্ব বিশেষ ক্ষমতাগুলির গুরুত্ব পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শেষতঃ বলতে হয়, সম্প্রতি মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাপ্রয়োগের সঙ্গে সেনেট এত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যে, রাষ্ট্রপতিব ক্ষমতাবৃদ্ধির ফলে স্বাভাবিকভাবে সেনেটের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।[2]

লর্ড ব্রাইসের ভাষায় বলতে গেলে সেনেট হচ্ছে সরকারের ভারকেন্দ্র বা "centre of gravity"। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি বা প্রতিনিধিসভা উভয়েই নিজের ক্ষমতা অতিক্রম করবার চেষ্টা করলে সেনেট সহজেই উভয়কে বাধ্য করতে পারে। সেনেট রাষ্ট্রপতির একচ্ছত্র অধিপতি হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা (monarchical ambition) ও প্রতিনিধিসভার গণতান্ত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতা (democratic recklessness) উভয়েরই প্রতিষেধক।

2 এ প্রসঙ্গে ল্যাস্কির মন্তব্য স্মরণীয়: "Unaided by the Senate, the America President is a sailor on an unchartered sea".

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারব্যবস্থা (Federal Judiciary)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগকে দুটি অংশে ভাগ করা চলে : কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় (federal) বিচারবিভাগ ও অঙ্গ-রাজ্যগুলির বিচারবিভাগ। আলোচ্যমান প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারবিভাগ তথা সুপ্রীম কোর্টের আলোচনা আবশ্যক। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারবিভাগের কেন্দ্রে সুপ্রীম কোর্ট অবস্থিত। একজন প্রধান বিচারপতি ও আটজন সহযোগী বিচারপতিকে নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট গঠিত। রাষ্ট্রপতি তাঁদের নিয়োগ করেন এবং এই নিযোগ সেনেটের অনুমোদন সাপেক্ষ। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে, ১৯৩০ সালে সেনেট রাষ্ট্রপতি হুভার-কর্তৃক বিচাবপতি পার্কারের সুপ্রীম কোর্টে নিয়োগ অনুমোদন করে নি। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা গুরুতর অভিযোগের ফলে পদচ্যুত হতে পারেন।

সর্বোচ্চ আদালত
Supreme court

এই অভিযোগ উথাপন করতে হবে প্রতিনিধিসভাকে এবং এর বিচার করতে হবে সেনেটকে। মার্কিন সংবিধানের দীর্ঘ ইতিহাসে মাত্র একবারই এই অভিযোগ আনীত হয়েছে ও শেষ পর্যন্ত অগ্রাহ্য হয়েছে। বলা বাহুল্য হলেও উল্লেখযোগ্য মার্কিন রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধেও গুরুতর অভিযোগ মাত্র একবারই উথাপিত হয়েছে এবং সেনেটের বিচারে তিনিও অব্যাহতি লাভ করেছেন।

সুপ্রীম কোর্টের মূল (original) এবং আপীল মামলাব বিচার করার (appellate) ক্ষমতা আছে। কিন্তু সংবিধানের ছাত্রের কাছে মাকিন সুপ্রীম কোর্টের গুরুত্বের কারণ অন্য। সুপ্রীম কোর্ট মার্কিন সংবিধানের অভিভাবক বলে বিবেচিত হয় এবং এজন্যে তার গুরুত্ব অসীম। সংবিধানের অভিভাবক হিসাবেই সুপ্রীম কোর্ট আইন-সমীক্ষা (review) করে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় বিচারবিভাগের কতকগুলি তত্ত্বগত ভূমিকা আছে। যেমন : বিচার-বিভাগের কাজ হল, কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বিভাগ ব্যাখ্যা করা ; দেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধান, কেন্দ্রীয় আইনসভাকৃত আইন ও চুক্তি (treaty) ব্যাখ্যা করা ; বিভিন্ন অঙ্গ-রাজ্যের মধ্যে বা কেন্দ্র ও অঙ্গ-রাজ্যের মধ্যে বিবাদ হলে তার মীমাংসা করা ; আইনপ্রণয়ন কালে কেন্দ্রীয় আইন-সভা তার ক্ষমতা অতিক্রম করেছে কিনা ; ইত্যাদি। আইন-সমীক্ষা করতে সুপ্রীমকোর্ট ও অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের লক্ষ্য হল, কেন্দ্রীয় ও অঙ্গ-রাজ্যের সরকারের মধ্যে ক্ষমতাবিভাগ লঙ্ঘিত হয়েছে কিনা, সেদিকে লক্ষ্য রাখা ; আইনপ্রণয়ন করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভা সংবিধান-অসম্মত কোন আইন

সুপ্রীমকোর্টের এক্তিয়ার
Jurisdiction of the Supreme Court

প্রণয়ন করছে কি না, সেদিকেও দৃষ্টি রাখা। এই ক্ষমতা পরে আলোচনা-সাপেক্ষ। প্রসঙ্গত বলা যায়, এই আইন-সমীক্ষাকালে সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যা করে থাকে।

বিচারবিভাগীয় আইন-সমীক্ষার অর্থ হল, মামলার শুনানী ও বিচারকালে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের আইন কতদূর সংবিধানসম্মত, তার বিচার। সংবিধান অনুসারে বিচারকেরা এই ক্ষমতা লাভ করেছেন যে, সমস্ত আইন মার্কিন সংবিধান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বলবৎ আইন ও কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে প্রণীত চুক্তিগুলির সঙ্গে সুসমঞ্জস নয়, বিচারকেরা সেগুলি বলবৎ রাখতে অস্বীকার করবেন[1]। যদি কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখানো যায় যে, কংগ্রেসের কোন আইন সংবিধানসম্মত নয়, তাহলে সুপ্রীম কোর্ট ঐ আইন প্রয়োগ করতে অস্বীকার করবে। সুপ্রীম কোর্ট এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে সংবিধানের ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হয়। অধিকাংশ বিচারকের মতে কংগ্রেসের বা রাজ্য আইনসভার কোন আইন যদি সংবিধানের ব্যাখ্যাসঙ্গত না হয়, তাহলে ঐ আইন বাতিল হতে বাধ্য। সংবিধানের ব্যাখ্যা বিভিন্ন রকম হতে পারে এবং ঐ ব্যাখ্যা প্রধানত নির্ভর করে বিচারকদের উপর।

আইন-সমীক্ষাব তাৎপয
Significance of Judicial Review

আইনসমীক্ষা প্রথম করা হয় ১৮০৩ সালে; সুপ্রীম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি মার্শাল এই সমীক্ষা করেন।

মার্শাল নিজেই বিচারবিভাগীয় আইন-সমীক্ষার ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "যদি তাঁরা (অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার) এমন কোন আইন করেন যা সংবিধানে লিপিবদ্ধ কোন ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তাহলে বিচারকেরা এটাকে সংবিধানের লঙ্ঘন হয়েছে বলে বিবেচনা করবেন—যে সংবিধানের তাঁরা রক্ষক। তাঁরা এ রকম আইনকে তাঁদের এক্তিয়ারভুক্ত বলে বিবেচনা করবেন না। তাঁরা একে বাতিল বলে ঘোষণা করবেন।[2]" অন্য কথায় বলতে গেলে, সংবিধান হল মৌলিক আইন (fundamental law) এবং আইনসভা যতই ক্ষমতাপন্ন হোক না কেন, সংবিধানকে সে অগ্রাহ্য করতে পারবে না।

---

[1] "This Constitution and the Laws of the United States which made in pursuance thereof ; and all Treaties made, or which shall be made, under the authority of the United States shall be the supreme Law of the Land ; and the Judges in every State shall be bound thereby, any thing in the Constitution or Laws of any State to the contrary notwithstanding". U S. Constitution, Act. VI, Cl. 2.

[2] "If they (i. e., the Government of the United States) were to make a law not warranted by any powers enumerated, it would be considered by the judges as infringement of the constitution which they are to guard. They would not consider such a law as coming under their jurisdiction. They would declare it vo

প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে, সুপ্রীম কোর্ট আইনসমীক্ষা করতে পারে যদি কোন মামলায় কোন আইনের সঙ্গে সংবিধানের অসঙ্গতির প্রতি সুপ্রীম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। আইন-সমীক্ষার দ্বারা সুপ্রীম কোর্ট কোন আইন বাতিল করতে পারে না। এর দ্বারা কেবলমাত্র সুপ্রীম কোর্ট আইনটি প্রয়োগ করায় নিজের অস্বীকৃতি জানাতে পারে এবং পরে কেন্দ্রীয় বা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার ঐ আইন প্রত্যাহার করে নেয়।

আইন-সমীক্ষার গুরুত্ব
Inportance of Judicial Review

আইন-সমীক্ষার গুরুত্ব নানা দিক দিয়ে উপলব্ধি করা যায়। এর দ্বারা কেবল যে সংবিধানের ব্যাখ্যা করা হচ্ছে তাই নয়, নিয়ত পরিবর্তনশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সংবিধানের সঙ্গতি রক্ষা করা হচ্ছে। এই ব্যাপারটি কোন লেখক এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: "আমেরিকানরা সংবিধানের অধীন, কিন্তু সেই সংবিধান হচ্ছে বিচারকেরা একে যা বলে স্থির করেন" ("The Americans live under a constitution, but the constitution is what the judges declare it to be")।

সুপ্রীম কোর্ট আইন-সমীক্ষার মাধ্যমে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তার ফলাফলে অনেক সময় রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াই বেশী দেখা যায়। সংবিধানের ব্যাখ্যা অনেক সময়ে বিচারকের ব্যক্তিগত প্রবণতা ও জনমতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ফলে অনেক সময়ে আইন-সমীক্ষার নামে বিচারকেরা আইন-প্রণেতাদের রাজনৈতিক জ্ঞান ও বিবেচনা সম্বন্ধে নিজেদের মতামত লিপিবদ্ধ করেন। এই জন্যে সুপ্রীম কোর্টকে কখনও কখনও "কংগ্রেসের তৃতীয় কক্ষ" (Third house of the Congress) বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এ অভিযোগ করেছিলেন রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট। তাঁর অভিযোগের মূল ছিল এই যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচার বহু ক্ষেত্রে আইনের বিচার (legal decision) না হয়ে রাজনৈতিক বিচারে (political decision) পর্যবসিত হয়েছে। তাঁর আগে রাষ্ট্রপতি থিওডোর রুজভেল্ট বলেছিলেন, আইন-

আইন-সমীক্ষার ত্রুটি
Shortcomings of Judicial Review

সমীক্ষার নামে বিচারকেরা কার্যত আইন প্রণেতাদের নির্দেশ দিয়ে থাকেন। সুপ্রীম কোর্টের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগও হয়েছে যে বিচার বিভাগীয় কর্তব্য করতে গিয়ে সুপ্রীম কোর্ট রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। ফলে সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিক্ষোভ ঘটেছিল ১৯৩৭ সালে। রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের 'নিউ ডীল'

(New Deal) কার্যপদ্ধতি সুপ্রীম কোর্ট অগ্রাহ্য করার ফলে রুজভেল্ট সুপ্রীম কোর্টের পুনর্গঠনের জন্যে জেহাদ তোলেন। জনমত রুজভেল্টের প্রতিকূলে যায় এবং এর ফলে রুজভেল্টকে সুপ্রীম কোর্ট পুনর্গঠনের প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে হয়।

বিচারবিভাগীয় আইন-সমীক্ষার বিরুদ্ধে এ ছাড়াও নানা অভিযোগ করা হয়। কোন কোন লেখকের মতে, নয়জন বিচারপতির মধ্যে পাঁচজন কোন বিষয়ে একদিকে থাকলে বিষয়টিতে যে বিতর্কের অবসান হয়, এ কথা বলা চলে না। সুপ্রীম কোর্টের ইতিহাসে বিচারবিভাগীয় আইন-সমীক্ষা বহুবার এইভাবে (অর্থাৎ নয়জনের মধ্যে পাঁচজন একদিকে থেকে) কার্যকরী হয়েছে। এ-হেন অভিযোগের কোন শেষ নেই। তবে এ-কথাও সত্য যে, বর্তমানে বিচার-বিভাগীয় আইন-সমীক্ষার কোন বিকল্প ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয় নি[৪] এবং যতক্ষণ তা না হচ্ছে, ততক্ষণ এ ব্যবস্থা বাতিল করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। এ-কথা অবশ্য সত্য যে সুইজারল্যাণ্ডে initiative ও referendum-এর মাধ্যমে বিচার-বিভাগীয় আইন-সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু এই বিকল্প ব্যবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবর্তন করা নানা কারণে সাধ্যাতীত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনবিভাগ, আইনবিভাগ ও বিচারবিভাগের আলোচনা করলে স্পষ্টই দেখা যায়, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতি এখানে কতদূর প্রযুক্ত হয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট কতকগুলি বিষয়ে শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগ নিরপেক্ষ। আবার কতকগুলি ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্ট শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন। পক্ষান্তরে, সুপ্রীম কোর্ট শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তারা নিজের এলাকা অতিক্রম করলে সুপ্রীম কোর্ট তাদের নিজের এলাকার ভিতরে ফিরে যেতে বাধ্য করে। তবে এ-প্রসঙ্গে এ-কথাও মনে রাখা প্রয়োজন, যতক্ষণ না আইনভঙ্গ হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের করণীয় কিছু নেই; আইনভঙ্গ হলে এবং যেদিকে কোন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি (interested party) সুপ্রীম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সুপ্রীম কোর্ট তার ক্ষমতার মাধ্যমে শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগকে শাসনে রাখতে পারে। আইন-সমীক্ষার দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের উপর অর্পণ করা হয়েছে এই কারণে যে, সুপ্রীম কোর্টের কার্যধারার সঙ্গে আইন-সমীক্ষার স্বাভাবিক সঙ্গতি আছে।

---

[৪] "In my opinion, no alternative scheme with less inconveniences seems possible, consistently with maintaining the federal principle."—Wheare.

ডাঃ রমেশচন্দ্র ঘোষের মতে, "the principles that lie at the basis of judicial review and constitutional amendment on the American and other federations exist in Switzerland but in quite a different form, viz., the initiative and the referendum."

রাজনৈতিক দল

(Political Parties)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দ্বিদলীয় ব্যবস্থাই আদর্শ অধ্যাপক হুয়্যার (Wheare) তাঁর Federal Government বইতে এই মন্তব্য করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দলীয় ব্যবস্থার সার্থকতা হল দ্বিবিধ ; প্রথমত :দলীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভাগীয় (sectional) স্বার্থ ও মতের পার্থক্য প্রকাশ পায় ও গুরুত্ব লাভ করে এবং দ্বিতীয়ত, এর মাধ্যমে সমস্ত দেশকে একসূত্রে গ্রথিত করা যায়।

দলীয় ব্যবস্থা ছাড়া গণতন্ত্র বর্তমানে অচল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাই দলীয় ব্যবস্থা দেখা যায়। ইংলণ্ডের মত এখানেও দ্বিদলীয় ব্যবস্থার প্রাধান্য রয়েছে। প্রধান দল দুটির নাম হল ডেমোক্র্যাটিক দল ও রিপাবলিকান দল। এ ছাড়াও দেশে ছোটখাটো বিভিন্ন দল আছে বটে, কিন্তু তাদের গুরুত্ব খুব বেশী নয়। এই দল দুটির উৎপত্তি অনুসরণ করা যায় মার্কিন সংবিধানের ইতিহাসের উষাকাল থেকে—জেফারসনের প্রজাতন্ত্রী (Republican) দল বর্তমানে রিপাবলিকান দলে ও হ্যামিলটনের যুক্তরাষ্ট্রপন্থী (federalist) দল বর্তমানে ডেমোক্র্যাটিক দলে পরিণত হয়েছে। এদের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য খুব বেশী নয়। উভয়েই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং উভয়েই সরকারের তিন-অঙ্গের মধ্যে সংযোগসাধনে প্রয়াসী। এ ছাড়া আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপারে এই দুই দলের মধ্যে মতভেদ খুব বেশী দেখা যায় না। তবে ডেমোক্র্যাটিক দলের তুলনায় রিপাবলিকান দল শিল্প বাণিজ্যের সংরক্ষণের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করে এবং ডেমোক্র্যাটিক দল শ্রমিক স্বার্থের সম্বন্ধে কিছুটা মনোযোগশীল। কিন্তু দুদলের পার্থক্য যতই হোক না কেন, ইংলণ্ডে প্রধান দল দুটির মধ্যে মতের যে পার্থব্য দেখা যায়, তার তুলনায় এ পার্থক্য কিছুই নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান দল দুটির মধ্যে পার্থক্য কোথায়, যে সম্বন্ধে অধ্যাপক হুয়্যার চিত্তাকর্ষক মন্তব্য করেছেন : " . for most of the time it has not been easy to say what divides them, beyond the fact—and it is more important than is often realised—that one party was in office and the other party was out of office and seeking to discredit and criticize the work of the other." তিনি আরও বলেছেন : "It has

often been true that differences on policy among members within any one of these parties were greater than the differences between members of different parties." মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল যে, রাজনৈতিক দলের উদ্ভব রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদার একটি প্রধান কারণ। পূর্বে এ-কথাও বলা হয়েছিল যে, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন বর্তমানে প্রত্যক্ষ নির্বাচন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। নির্বাচকমণ্ডলীর (electoral college) ভোট গণনার সময়ে এই নিয়ম অনুসৃত হয় যে, কোন প্রার্থী কোন অঙ্গরাজ্যের নির্বাচকমণ্ডলীর বেশীভাগ ভোট পেলে তাঁকে ঐ রাজ্যের নির্বাচকমণ্ডলীর দেয় সমস্ত ভোটই দেওয়া হয়। অন্য কথায় বলতে গেলে, কোন প্রার্থী যদি অল্প ভোটের জন্যেও কোন অঙ্গ-রাজ্যের নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটের বেশীভাগ না পান, তাহলে তাঁকে ঐ রাজ্যের নির্বাচকমণ্ডলীর দেয় ভোটের সমস্তই হারাতে হয়। এর ফলে দ্বিদল ব্যবস্থার সার্থকতা আরও উজ্জ্বল ভাবে দেখা গেছে। ছোটখাটো দলে কিছু ভোট কেড়ে নিলে বড় দলগুলিকে অসুবিধায় পড়তে হয়। 'রাষ্ট্রপতির পদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাপেক্ষা লোভনীয় এবং ছোট দলগুলি রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে ভোট কেড়ে নিয়ে বড় দলগুলিকে অসুবিধায় ফেলতে পারে, বড় দলগুলি তা সহ্য করতে রাজী নয়। এ জন্যে বলা হয়েছে যে, ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান দল পরস্পরকে ঘৃণা করতে পারে, কিন্তু তার চেয়েও বেশী ঘৃণা করে তারা কোন তৃতীয় দলকে, যে দল তাদের উভয়কেই বঞ্চিত করে কিছু ভোট কেড়ে নিয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের জয়লাভের পথে বাধার সৃষ্টি করে।

সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি

(Amendment of the Constitution)

তত্ত্বগতভাবে সংবিধানের অনমনীয়তা (rigidity) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে এই বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। সংবিধানের অনমনীয়তার অর্থ হল এই যে, সংবিধান সংশোধন করতে হলে একটা বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন। যে পদ্ধতিতে অন্যান্য আইন প্রণীত হয়, সে পদ্ধতি সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অচল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান-সংশোধনের দুটি উপায় উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমত, সংবিধানের সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারে কেন্দ্রীয় আইনসভা কংগ্রেস। সেক্ষেত্রে প্রতিনিধি সভা ও সেনেটের সদস্যদের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ কর্তৃক পৃথকভাবে ঐ প্রস্তাবের সমর্থন আবশ্যক।

দ্বিতীয়ত, অঙ্গরাজ্যগুলির আইনসভার অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ আইনসভা কেন্দ্রীয় আইনসভা কংগ্রেসকে নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে সংবিধানের সংশোধন উত্থাপন করার জন্যে একটি সভা (convention) ডাকবার জন্যে অনুরোধ জানাতে পারে। ঐ সভা তখন সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব আনতে পারে।

কিন্তু সংবিধানের সংশোধন-সংক্রান্ত প্রস্তাব কেবল উত্থাপিত হলেই চলবে না—তা অনুমোদিত হওয়ার প্রয়োজন। অনুমোদনও আবার দু-ভাবে হতে পারে। প্রথমত, এজন্যে অঙ্গরাজ্যগুলির আইনসভার অন্তত তিন-চতুর্থাংশের সমর্থন প্রয়োজন। অন্যথায়, প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে একটি করে সভা (convention) আহূত হওয়া দরকার এবং ঐ সভাগুলির অন্তত তিন-চতুর্থাংশের অনুমোদন পাওয়া গেলে সংবিধানের সংশোধন বলবৎ হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সংবিধানের অনমনীয়তার উদ্দেশ্য হল, সংবিধানের সংশোধন কষ্টসাধ্য ব্যাপারে পরিণত করা। সেই উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান সংশোধনের একটি অতি দুরূহ পদ্ধতি উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্য যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যথেষ্ট সার্থকতা লাভ করেছে, তার নিদর্শন পাওয়া যায় এই থেকে যে মার্কিন সংবিধানের দীর্ঘ ইতিহাসে মাত্র বাইশটি সংশোধন সম্ভব হয়েছে এবং তার মধ্যে প্রথম দশটিকে অনেক লেখক সংশোধন বলে মানতে প্রস্তুত নন। এ প্রসঙ্গে আরও বলা চলে যে, এই বাইশটি সংশোধনের প্রত্যেকটিই কেন্দ্রীয় আইনসভা কংগ্রেস কর্তৃক উত্থাপিত হয়েছে এবং একুশ নম্বর সংশোধন ব্যতীত বাকিগুলি অঙ্গরাজ্যগুলির আইনসভার দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।

সর্বশেষে বলা প্রয়োজন, সংবিধানের সংশোধন-পদ্ধতিতে প্রধান ভূমিকা হচ্ছে কেন্দ্রীয় আইনসভা কংগ্রেসের। কেন না, সংশোধন প্রস্তাব যে-ভাবেই উত্থাপিত হোক না কেন, তা কিভাবে অনুমোদিত হবে তা স্থির করতে পারে কেবল কেন্দ্রীয় আইনসভা কংগ্রেস।

সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধান

ঐতিহাসিক পটভূমি (Historical Background) :

আন্দ্রে সিগফ্রায়েডের মতে সুইজারল্যাণ্ডের জন্ম ইচ্ছাকৃত সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে সুইজারল্যাণ্ড ছিল কতকগুলি সার্ব্বভৌম ছোট ছোট রাষ্ট্রের সমষ্টি। এই ছোট ছোট রাষ্ট্রের অধিবাসীরা প্রায় একই রকমের জীবন ধারণ কোরত। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন জাতিগত, ভাষাগত ও ঐতিহাসিক সমতা ছিল না।

ত্রয়োদশ শতকের শেষ ভাগে 'হ্যাপসবার্গ' এর ফিউডাল (Feudal) রাজাকে বাধা দেওয়ার জন্ম প্রথম তিনটি টিউটনিক দেশ সংঘবদ্ধ হয়। পরবর্তী চল্লিশ বছরের মধ্যে আরও পাঁচটি ক্যান্টন এর সংগে যোগ দেয়, এবং ১৩৮৬ সালে প্রথম স্বাধীনতা লাভ করে। এর পরে ধর্ম সম্বন্ধীয় বহু বিবাদের অস্তিত্ব সত্বেও ক্যান্টনগুলি শুধুমাত্র আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ ছিল। এই সময় কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র বৈদেশিক নীতি, যুদ্ধ ও শান্তির বিষয়, এবং ক্যান্টন-গুলির মধ্যে বিবাদের বিষয় নিয়ে আলোচনা কোরত। প্রত্যেকটি ক্যান্টনের থেকে প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত 'ডিয়েট' (Diet) নামের একটি গঠনসভা সমস্ত কাজ পরিচালনা কোরত। কিন্তু যেহেতু সাধারণতঃ শক্তিশালী ক্যান্টন-গুলিকে 'ডিয়েট' এ বেশী প্রাধান্য দেওয়া হতো সেইহেতু অন্যান্য ক্যান্টনগুলির মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। পরে ফরাসী বিপ্লবের সময় সুইজারল্যাণ্ড আরও দৃঢ় এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং এই সময় মোট ২২টি ক্যান্টন একসংগে সম্মিলিত হয়। এই সময় ফরাসী গণতান্ত্রিক ও কেন্দ্রীয়করণ নীতি সুইজারল্যাণ্ডের রাজনৈতিক সংগঠনগুলির ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ফ্রান্সের গণতান্ত্রিক মুক্তি আন্দোলনই সুইজারল্যাণ্ডের গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তি।

ক্যান্টনের ঐক্য
Cantonal unity

ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব
Influence of the French Revolution

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডে ১৩টি ক্যান্টনের একটি দুর্ব্বল সন্ধি সমবায় ছিল। ১৮৪৭ সালে 'সন্দারবন্দে'র যুদ্ধে দৃঢ় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব কোরে ১৮৪৪ সালে সুইজারল্যাণ্ড একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৮৭৪ সালে

৬। ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সুইস শাসনতন্ত্রে বহু বিধান রয়েছে। কোন ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলকভাবে কোন বিশেষ ধর্মীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। প্রত্যেক নাগরিক তার ইচ্ছামত ধর্মীয় পন্থায় বিশ্বাসী হতে পারে। ধর্ম কোনদিনও রাজনৈতিক অধিকারের বাধাস্বরূপ হয় না। অর্থনৈতিক অথবা ধর্মের ভিত্তিতে "বিবাহের অধিকার" কে সীমিত করা হয় না।

ধর্মনিরপেক্ষতা
Secularism

৭। ব্রাইসের মতে সুইজারল্যাণ্ড সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক দেশ। সুইজারল্যাণ্ডের ছোট ছোট গ্রাম ও শহরতলীর অধিবাসিরা নিজেদের শাসনকাজ পরিচালনা কোরতে অভ্যস্ত। রাজনৈতিক দলগুলি নাগরিকদের রাজনৈতিক শিক্ষা দেয় এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে। সুইজারল্যাণ্ডে সমস্ত শাসনতান্ত্রিক বিষয় জনসাধারণের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ও প্রয়োজনমত জনসাধারণ শাসনতন্ত্র পরিবর্তন কোরতে পারে। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সুইজারল্যাণ্ডের বিশেষত্ব। গণভোট, গণ-নির্দেশ ও গণ-প্রস্তাব এর সাহায্যে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কার্যকরী করা হয়।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র
Direct Democracy

(৮) সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র অনমনীয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুইস শাসনতন্ত্রকে সহজ ভাবে সংশোধন করে প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করা যায়। তাই সুইস শাসনতন্ত্রকে অনেক সময় পরিবর্তনশীল শাসনতন্ত্র বলা হয়। জাতীয়করণ ও রাষ্ট্রীয় প্রগতির জন্য নীতিগুলিকে লক্ষ্য করলে সুইজারল্যাণ্ডের কল্যাণজনক আদর্শ প্রতিফলিত হয়।

নমনীয়তা
Flexibility

(৯) সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের আরও একটি বিশেষত্ব হোল যে শাসন ক্ষমতা কোন একজনের হাতে কেন্দ্রীভূত না হয়ে মন্ত্রী-পরিষদের হাতে দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী-পরিষদের সমস্ত সদস্য সমান ক্ষমতার অধিকারী। সুইজারল্যাণ্ডের আইনসভার দুটি পরিষদ আছে। রাজ্য পরিষদে ক্যাণ্টনগুলি প্রতিনিধি পাঠায় এবং জাতীয় পরিষদে সমানুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে প্রতিনিধি-সদস্য নির্বাচিত হয়। দুটি পরিষদই সহযোগীতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সুইস শাসনতন্ত্রে ক্ষমতা স্বাতন্ত্র্য বিধান নীতির কোনও স্থান নেই সুতরাং আইনসভা সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী। সুইস আইনসভার ক্ষমতা গণনির্দেশ দ্বারা সীমায়িত।

ক্ষমতা বণ্টন
Distribution of Powers

(১০) সুইস শাসনতন্ত্রের একটি অভিনবত্ব হল বিচারব্যবস্থা। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের মত সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সমপর্যায়ের নয়। সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত শাসন তন্ত্রের রক্ষক নয়; আইনসভায় প্রণীত আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতাও সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের নেই।

অভিনব বিচারব্যবস্থা
Peculiar Judicial system

আইন সভা

(Federal Legislature)

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয়সভায় দুটি পরিষদ আছে—রাজ্যপরিষদ ও জাতীয়পরিষদ শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সুইস জাতীয়সভা যুক্তরাষ্ট্রের সব চেয়ে বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন সভা। (৭১ ধারা) সুইস জাতীয়সভা যে সমস্ত আইন পাস করে রাষ্ট্রপতি অথবা কোন সুইস আদালত তাকে অবৈধ বলে ঘোষণা কোরতে পারে না। শাসন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়েই জাতীয় সভার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়। একমাত্র সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিকরাই কোন আইনকে প্রয়োজন হলে গণভোট ও গণ-উদ্যোগ দিয়ে পরিবর্তিত কোরতে পারে।

রাজ্যপরিষদ (The Council of States): সুইজারল্যাণ্ডের জাতীয় সভার উচ্চপরিষদ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি ক্যাণ্টন থেকে দুজন করে এবং প্রত্যেকটি অর্ধ-ক্যাণ্টন থেকে একজন ক'রে প্রতিনিধি নিয়ে রাজ্যপরিষদ গঠিত হয়েছে (৮০ ধারা)। রাজ্যপরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ৪৪ জন। প্রত্যেকটি ক্যাণ্টনের নিজস্ব আইন পদ্ধতি অনুযায়ী সেই ক্যাণ্টনের প্রতিনিধি নির্বাচন ও কাজের সময় নির্ধারিত হয়। নির্বাচন সম্বন্ধে কোনও বিশেষ নিয়ম অনুসরণ করা হয় না, এবং সদস্যদের জন্য কোন বিশেষ স্থির বেতনের কথাও শাসনতন্ত্রের কোথাও উল্লিখিত নেই। কোন কোন ক্যাণ্টনে সদস্যরা গণভোটের দ্বারা নির্বাচিত হন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিন বছর কার্যকাল স্থির করা হয় যদিও এক বছর থেকে চার বছর পর্যন্ত কাজের সময় স্থির করা যেতে পারে। সদস্যদের বেতন ও অন্যান্য খরচ ক্যাণ্টনগুলি থেকে দেওয়া হয়।

গঠনবিধি
Composition

রাজ্যপরিষদ প্রত্যেক বছর একটি নির্দিষ্ট দিনে অন্ততঃ একবার সমবেত হয়। শাসনতন্ত্রে উল্লেখ আছে যে জরুরী অবস্থায় রাজ্যপরিষদ যদি অধিবেশনে না থাকে তবে শাসনপরিষদ অথবা এক চতুর্থাংশ সদস্য অথবা যে কোন পাঁচটি ক্যাণ্টনের অনুরোধে রাজ্যপরিষদের জরুরী অধিবেশন ডাকা যেতে পারে। রাজ্যপরিষদ এবং জাতীয় পরিষদ সমান ক্ষমতাসম্পন্ন। প্রত্যেকটি বিল পাসের জন্য দুটি পরিষদেরই অনুমোদন দরকার। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায় যে সুইস রাজ্যপরিষদ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের সমপর্যায়ভুক্ত হলেও যেহেতু রাজ্যপরিষদের কোন নির্দিষ্ট কাজ নেই এবং কোন নির্দিষ্ট কার্যকাল নেই সেইহেতু কোন অভিজ্ঞ সমর্থ যুবক এই পরিষদে নির্বাচিত হতে চান না। অনেক সময় রাজ্যপরিষদ জাতীয়পরিষদের চেয়ে দুর্বল বলে মনে হয়। কিন্তু তা বলে তখনই মনে করা উচিত নয় যে রাজ্যপরিষদ জাতীয় পরিষদের অধীনে। তবে অধুনা রাজ্যপরিষদ বহু কারণে শক্তিশালী হচ্ছে।

কার্যক্রম
Functions

জাতীয় পরিষদ (National Assembly)ঃ সমানুপাতিক ভোটপদ্ধতির ভিত্তিতে জনগণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে জাতীয়পরিষদের প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হন। জাতীয় পরিষদের গঠন অনেকটা রাজ্যপরিষদের মত। ১৯৬ জন সদস্য নিয়ে জাতীয় পরিষদ গঠিত। প্রত্যেক ২০ বছর বয়স্ক পুরুষ নাগরিক ভোটদান কোরতে পারে। কোন স্ত্রীলোক ভোটদানে অংশগ্রহণ কোরতে পারে না। প্রত্যেক চব্বিশ হাজার জন লোকের জন্য একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। প্রত্যেক ক্যাণ্টন থেকে অন্ততঃ একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেই। প্রতিনিধির সংখ্যা ক্যাণ্টনের জনসংখ্যার ওপর নির্ভর করে। প্রতিনিধিগণ সাধারণতঃ চার বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

গঠনবিধি
Composition

জাতীয় পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে থেকেই একজন সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত নির্দ্দিষ্ট দিনে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসে।

কতকগুলি বিশেষ বিষয়ে আলোচনা করার সময় দুটি পরিষদের যুক্ত অধিবেশন বসে। ১। রাষ্ট্রপতি, সহ-রাষ্ট্রপতি, যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের বিচারপতি প্রভৃতি নিয়োগের ব্যাপারে ; আইন সম্পর্কিত প্রশ্নের সমাধানের জন্য ; এবং অপরাধীর অপরাধ মার্জ্জনা করার জন্য এই যুক্ত অধিবেশন ডাকা হয়।

যুক্ত অধিবেশন
Joint Session

আইনসভার কাজ (Functions of the Legislature) :

আইনসভা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে যে সমস্ত বিষয় উল্লেখ আছে সমস্ত বিষয়ের ওপর আইন-প্রণয়ন কোরতে পারে। সুইস যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের নির্বাচন সম্বন্ধীয় সমস্ত আইনও আইনসভায় পাস হয়। সুইজারল্যাণ্ডের বাহ্যিক নিরাপত্তা রক্ষা ও আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার ভার আইনসভার উপর। আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও সন্ধিচুক্তির অনুমোদন আইনসভার আরও দুটি প্রধান কাজ। আভ্যন্তরীণ শান্তিভঙ্গের সময় কি নীতি মানা হবে তা আইন-সভার বিচারাধীন থাকে।

আইন সংক্রান্ত কাজ
Legislative function

রাজ্যপরিষদ ও জাতীয়সভা যুক্ত অধিবেশনে শাসন পরিষদের সাতজন সদস্যকে নির্বাচিত করে এবং একজন সভাপতি নির্বাচিত করে। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের বিচারপতিও এই যুক্ত অধিবেশন দ্বারা নির্বাচিত হন। আইনসভা সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের কাজের প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং তাদের মধ্যে কোন শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে মতানৈক্য হলে আইনসভা তা সমাধানের চেষ্টা করে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাও আইনসভা স্থির করে। যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য আইনসভার হাতে থাকে এবং আইনসভা যুদ্ধ ও শান্তির সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

শাসনক্ষমতা
Executive powers

যখন দুটি পরিষদই শাসনতন্ত্রের কোন একটি অঙ্গ পরিবর্তনের বিষয়ে একমত হয় তখন শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করা যায়। যখন দুটি পরিষদ পরিবর্তন সম্পর্কে একমত হয় না তখন বিষয়টি জনসাধারণের কাছে উল্লেখ করা হয়।

শাসনতন্ত্র পবিবর্তন
Amendment

শাসন পরিষদ

(Federal Council)

অন্যান্য প্রত্যেকটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে সাধারণতঃ দেখা যায় শাসনক্ষমতা একজনের হাতে ন্যস্ত থাকে। সুইস শাসনব্যবস্থার একটি প্রধান বিশেষত্ব হল যে সুইজারল্যাণ্ডের শাসনক্ষমতা একজনের হাতে না থেকে একাধিক ব্যক্তির

হাতে রয়েছে। সুইস শাসনপরিষদ সাতজন মন্ত্রী নিয়ে গঠিত। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার পরিষদ দুটির যুক্ত অধিবেশনে সদস্যরা শাসনপরিষদের মন্ত্রীদের নির্বাচিত করেন। মন্ত্রীরা সাধারণতঃ চার বছরের জন্য নির্বাচিত হন। আইনসভার সদস্যরা অথবা অন্য নাগরিকেরাও মন্ত্রীরূপে নির্বাচিত হতে পারেন। তবে সাধারণতঃ মন্ত্রীরা আইনসভার সদস্যদের মধ্যে থেকেই নির্বাচিত হন যদিও শাসনতন্ত্রে সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু উল্লেখ করা নেই। মন্ত্রিগণ পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন। শাসনপরিষদে জার্মান ভাষাভাষি ক্যান্টনগুলি থেকে চারজন, দুজন ফরাসী ভাষাভাষী এবং ইতালীয় ভাষাভাষি ক্যান্টনগুলি থেকে মন্ত্রিগণ নির্বাচিত হন। প্রত্যেক বছর পরিষদের সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন রাষ্ট্রপতি ও একজন উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন, রাষ্ট্রপতির পরে সাধারণতঃ উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির পদ অধিকার করেন।

পরিষদের গঠন
Composition of the Council

Bryce-এর মতে "সুইস শাসনপরিষদ কোন দলীয় ভিত্তিতে গঠিত নয়। কিন্তু তবুও তা যে একেবারেই নির্দলীয় সদস্যদের নিয়ে গঠিত ও দলীয় সম্পর্কহীন সে কথা বলা যায় না। বিভিন্ন দলের থেকে সদস্যগণ নির্বাচিত হলেও মানসিক দৃঢ়তা, শান্ত ও বিচক্ষণ বুদ্ধি এবং শাসন দক্ষতাই তাদের নির্বাচনের উপযুক্ত গুণ বলে বিবেচিত হয়। শাসনপরিষদ সব সময় আইনসভার অধীনে কাজ করে, শাসনপরিষদ কেবলমাত্র শাসন সংক্রান্ত কাজ পরিচালনা করে ও আইন প্রণয়ণে সহায়তা করে।

সভ্যগণের দলীয় আনুগত্য
Party affiliations of the members

সুইস শাসনপরিষদের সদস্যরা চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত হলেও সাধারণতঃ তাদের স্থায়িত্ব অনেক বেশী কারণ সুইজারল্যাণ্ডের লোকেরা সহজেই একজন দক্ষ শাসনপরিষদের সদস্যকে হারাতে চায় না।

রাষ্ট্রপতি অন্যান্য সদস্যদের চেয়ে কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে বেশী সুযোগ পেলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি অন্যান্য সদস্যদের সমগোত্রীয় একজন। প্রশ্ন হতে পারে তা'হলে রাষ্ট্রপতির পদের প্রয়োজন কি? কিন্তু কতকগুলি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতির পদ-এর প্রয়োজনীয়তা আছে। যেমন, পরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করা, পরিষদের বিভিন্ন সভ্যের কাজ কর্মে সহযোগিতা করা ও বিরোধ নিরসন করা। এছাড়া জাতীয় ঐক্য ও সার্বভৌমিকতার ব্যক্তি-প্রতীক হিসাবেও রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা কম নয়।

রাষ্ট্রপতি
The President

শাসনতন্ত্রের ১০২ নং ধারায় শাসনপরিষদের মূল ক্ষমতা ও কাজগুলির সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। সংক্ষেপে এই কাজগুলি হল: (১) যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন কানুন অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত কাজ পরিচালনা করা। শাসনপরিষদ অবশ্যই শাসনতন্ত্রের আইন ও নির্দেশ মেনে চলবে। আন্তর্জাতিক চুক্তি অথবা শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত আইন সম্পর্কে যদি কোন বিরোধ অথবা মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় তবে শাসনপরিষদ স্ব-ইচ্ছায় অথবা কোন ক্যাণ্টনের অনুরোধে সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে। (১১৩ ধারা) আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে শাসনপরিষদ গান্ধীমতবাদে বিশ্বাসী।

পরিষদের কাজ
Functions of the Council

(২) ভোট দেবার অধিকার না থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদের সদস্যরা আইনসভার অধিবেশনে যোগদান করে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে।

(৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনপরিষদ কিছু বিচারবিভাগীয় কাজও পরিচালনা করে। শাসনবিভাগীয় বিচারালয় হিসেবে ক্যাণ্টনগুলির মধ্যে মতানৈক্য প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ ব্যাপারে শাসনপরিষদ বিচার করে থাকে।

(৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখা, বিভিন্ন সরকারী কর্মচারী নিয়োগ এবং বৈদেশিক নীতি স্থির করা শাসনপরিষদের অন্যতম প্রধান কাজ।

(৫) আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও শত্রুর আক্রমন থেকে দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব শাসন পরিষদের, কোন সংকটজনক অবস্থায় (যখন আইনসভা অধিবেশনে থাকে না) শাসনপরিষদ নিজে যা করা যুক্তিযুক্ত মনে করে তাই করে থাকে। কিন্তু সেই কারণে যদি দুহাজারের বেশী সৈন্যের প্রয়োজন হয় এবং তিন সপ্তাহের বেশী সময় লাগে তবে তখনই আইনসভার অধিবেশন ডাকা হয়।

(৬) শাসন পরিষদের হাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈনদল ও যুদ্ধ সম্বন্ধীয় শাসনভার ন্যস্ত থাকে।

(৭) শাসন পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়-ব্যায়ের বাজেট তৈরী করে এবং আয়-ব্যায়ের হিসাব দাখিল করে। শাসনপরিষদ যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত কর্মচারী ও অফিসারদের কাজের ধারার দিকে লক্ষ্য রাখে।

শাসনবিভাগের যৌথ চরিত্র ও তার সুবিধে (Collegial Executive & its advantages):

সুইস শাসন পরিষদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট হল এর যৌথ চরিত্র।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত একজন রাষ্ট্রপতির হাতে ক্ষমতা না দিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে সাতজন সহকর্মী মন্ত্রীদের হাতে শাসনপরিষদের ক্ষমতা দেওয়া হয়। এমন কি আইন সভা যদি শাসন পরিষদের নীতি অনুমোদন না করে তাহলেও এরা পদত্যাগ করেন না।

একাধিকের শাসন
Plural Executive

সুইজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থা গ্রেটবৃটেনের পার্লামেন্টারী ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সিয়াল শাসনব্যবস্থার সংমিশ্রন। সুইস শাসনপরিষদ বৃটিশ ক্যাবিনেটের মত আইনসভাকে পরিচালিত করে না বরং আইনসভার ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সুইস শাসন পরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হওয়ার পর আইন সভার সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করে না।

সুইস শাসন পরিষদের যৌথ চরিত্রের ফলে ক্যাবিনেট প্রথার সমস্ত সুবিধেগুলি এতে পাওয়া যায়। সহযোগিতা ও সমমর্মিতা থাকার ফলে পার্লামেন্টারী সরকারের মধ্যে সৌহার্দ্যবোধ বজায় থাকে। শাসন পরিষদ দল-নিরপেক্ষ হওয়ার জন্য দেশের সমস্ত সম্প্রদায়ের মতামতকেই মূল্য দেওয়া হয়। এর ফলে বিরোধী পক্ষের শক্তিশালী হওয়ার কোনও সম্ভাবনা থাকে না।

ক্যাবিনেট প্রথার সঙ্গে তুলনা
Comparison with the Cabinet System

সুইস যৌথ শাসন পরিষদের আর একটি সুবিধে হল এর স্থায়িত্ব। যেহেতু আইন সভার ভোটের ওপর কোন সদস্যের পদত্যাগ নির্ভর করে না, সেইহেতু বলা যায় শাসন পরিষদ স্থায়ী। তাই অভিজ্ঞ এবং সমর্থ শাসকরা দেশের সমস্ত সাসন সংক্রান্ত কাজে অংশ গ্রহণ করে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চেষ্টা করে।

স্থায়িত্ব
Permanence

যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত

সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় ১৮৪৭ সালের সৃষ্টি। ১৮৪৭ সালেই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের ক্ষমতা প্রসারিত হয়।

বিচারালয়ের গঠন (Formation of the Judiciary) :—

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় সুইস শাসনব্যবস্থার একটি বিশেষ অঙ্গ। সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ে ২৬ থেকে ২৮ জন বিচারপতি থাকেন। এছাড়াও স্থায়ী বিচারপতিদের অনুপস্থিতির সময় কাজ করার জন্য আরও ১১ থেকে ১৩জন বিচারপতি থাকেন। বিচারপতিদের নির্বাচনের জন্য কোন বিশেষ ধরণের গুণের কথা শাসনতন্ত্রে কোথাও বলা হয়নি। শাসনতন্ত্রে শুধুমাত্র বলা হয়েছে যেকোনও সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিক যারা জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হবার উপযুক্ত তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের বিচারপতি হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেন। তবে শাসনতন্ত্রে একটিমাত্র শর্তের উল্লেখ আছে যে বিচারপতি নির্বাচনের সময় যাতে তিনটি সরকারী ভাষাভাষী অঞ্চলের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সাধারণতঃ অভিজ্ঞ ও উচ্চশিক্ষিত আইনবিদরাই বিচারপতি নিযুক্ত হন। বিচারপতিরা সাধারণতঃ ৬ বছরের জন্য নির্বাচিত হন কিন্তু সুইস প্রথা অনুযায়ী যদি তাঁরা ইচ্ছা করেন তবে আবার নির্বাচিত হতে পারেন।

বিচারপতিদের নির্বাচন
Posts of the judges elective

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের ক্ষমতা (Powers of the Judiciary)

দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা ও সাধারনের আইন সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি বিচার করার ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের আছে। কিন্তু এই বিচারালয়ের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের কোন আচরণের ব্যাখ্যা অথবা আইনসভা প্রণীত কোন আইনকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করার কোন অধিকার নেই।

শাসনতন্ত্র অনুযায়ী এই বিচারালয় যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যাণ্টনগুলির মধ্যে অথবা বিভিন্ন ক্যাণ্টনের মধ্যে দেওয়ানী আইন সম্পর্কিত মামলায় বিচার করতে পারে। কোন ব্যক্তি অথবা কর্পোরেশনের সংগে যুক্তরাষ্ট্রের মামলার বিচারও এই আদালতে হতে পাবে যদি সেই মামলাটি, ৪০০০ ফ্রাঙ্কের ও বেশী সম্পত্তি সম্পর্কিত হয়। কোন কমিউন ও ক্যাণ্টনের মধ্যে নাগরিকতা ও জাতীয়তা লোপের বিষয় কোন মামলার উৎপত্তি হলে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় তার নিষ্পত্তি করে। ক্যাণ্টন আদালত থেকে আনা সমস্ত আপীল যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের শোনবার অধিকার আছে।

দেওয়ানী ক্ষমতা
Civil Jurisdiction

সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের কতকগুলি ফৌজদারী মামলার বিচারের ক্ষমতা আছে, যেমন,—

ফৌজদারী ক্ষমতা
Criminal Jurisdiction

(১) যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ অথবা ষড়যন্ত্রের জন্য মামলার বিচার।

(২) জাতীয় আইনের বিরুদ্ধে অপরাধ করার জন্য মামলার বিচার।

(৩) রাজনৈতিক অপরাধ যার ফলে রাষ্ট্রীয় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলতা দেখা যায় সেই সম্পর্কিত মামলার অপরাধ।

(৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের নিযুক্ত কোন কর্মচারীর কোন অপরাধের জন্য যদি নিয়োগকারী কোন মামলা দায়ের করে—তার বিচার।

(৫) ১২ জন জুরীর সাহায্যে সাধারণ ফৌজদারী মামলার বিচার যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধীয় ক্ষমতা খুব সীমাবদ্ধ।

সংবিধান সংরক্ষণ
Protection of the Constitution

প্রথমতঃ যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যাণ্টনগুলির মধ্যে বিভক্ত ক্ষমতাগুলির উপযুক্ততা সম্বন্ধীয় কোন প্রশ্নের বিচার এই বিচারালয়ে হয়।

দ্বিতীয়তঃ নাগরিকের শাসনতান্ত্রিক অধিকার অমান্য করা হলে এ বিচারালয়ে তার জন্য আপিল করা চলে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের সঙ্গে তুলনা (Comparison with the U. S. Judiciary) ঃ

বাস্তব দিক থেকে বিচার কোরতে গেলে সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের সঙ্গে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের প্রচুর পার্থক্য আছে। সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় জাতীয় আদালত হইলেও একক—মার্কিণ সুপ্রিম কোর্টের মত দেশজুড়ে এর কোন অধীনস্থ কোর্ট নেই। কিন্তু আসল পার্থক্য হ'ল দুটি দেশের ক্ষমতার পার্থক্যের মধ্যে। শাসনতন্ত্রের ১৩ ধারা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার প্রণীত সমস্ত আইন ও চুক্তি অনুযায়ী সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়কে বিচার কোরতে হবে। শাসনতান্ত্রিক ব্যাখ্যার ভার একমাত্র আইনসভার হাতেই থাকে। সুতরাং এখানে বিচারবিভাগ শাসন-বিভাগের অধীনে থাকে। কিন্তু আমেরিকায় আইনের বৈধতা সম্পর্কে বিবেচনা করার পূর্ণ অধিকার

মার্কিণ সুপ্রিম কোর্টের আছে। সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সরকারী কর্মচারী ও সাধারণ নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত বিরোধের জন্য শাসন-বিভাগীয় আদালত হিসেবে কাজ করে। মার্কিণ সুপ্রিমকোর্টের এ রকম কোন ক্ষমতা নেই। তবে সরকারী কর্মচারীদের ওপর সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের চেয়ে অনেক বেশী। সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ও শাসন পরিষদের মধ্যে ক্ষমতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন বিচারের ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের নেই। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট নিজ ক্ষমতার পরিধি সম্পর্কিত প্রশ্ন নিজেই বিচার করে। সুতরাং তুলনামূলকভাবে বিচার করলে মার্কিণ সুপ্রিম কোর্ট সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের চেয়ে অনেক বেশী স্বাধীন ও ক্ষমতাশালী বলে মনে হয়।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সুইজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থার একটি বিশেষত্ব। প্রকৃতপক্ষে সুইজারল্যাণ্ডকে একটি মিশ্রগণতন্ত্র বলা যেতে পারে। কারণ এখনে আইন-সভার মাধ্যমেও গণভোটের মাধ্যমে দু'ভাবেই জনমত প্রকাশ হতে পারে। Referendum বা গণনির্দ্দেশ ও Initiative বা গণপ্রস্তাব সুইজারল্যাণ্ডের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি, তাই প্রথমে এই দুটি সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

গণনির্দ্দেশ (Referendum) :

ইংরাজীতে (Referendum) কথার অর্থ হ'ল নির্দেশার্থে প্রেরিতব্য ('must be referred') যখন আইনসভা প্রণীত ও মতামত সমম্বিত কোন আইনকে (মূল অথবা সাধারণ) জনমতের জন্য সরাসরিভাবে নাগরিকদের সামনে ভোটদানের জন্য আনা হয় তখন তাকে গণনির্দ্দেশ বলে। যদি অধিক-সংখ্যক নাগরিক আইনটির স্বপক্ষে ভোট দেয় তবে আইনটি গৃহীত হয়, এবং যদি অধিকসংখ্যক নাগরিকের ভোট আইনটির বিপক্ষে থাকে তবে আইনটি বাতিল হয়।

সাধারণতঃ দুই রকমের গণনির্দ্দেশ হতে পারে। একটি বাধ্যতামূলক নয়

অপরটি বাধ্যতামূলক। বাধ্যতামূলক গণনির্দ্দেশের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি আইনকেই গণনির্দ্দেশের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি আইনকেই গণনির্দ্দেশের জন্য উপস্থিত করতে হয়। অন্যটির জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক নাগরিকের সই করা একটি আবেদন পত্রের দরকার হয়।

গণনির্দেশের দুই শ্রেণী
Two types of Referendum

বাধ্যতামূলক গণনির্দ্দেশ বেশী গণতান্ত্রিক এবং সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসীরা কার্যক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক গণনির্দ্দেশের পক্ষপাতি।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ও ক্যাণ্টন-এর শাসনতন্ত্রের প্রত্যেকটি পরিবর্তনের সময় বাধ্যতামূলক গণনির্দ্দেশ-এর প্রয়োজন হয়।

শাসনতন্ত্রের পারিবর্তন সম্পর্কে গণনির্দ্দেশের সময় প্রথমে আইন সভা সাধারণ আইনের মত আইন পাশ করে ও বিষয়টি গণনির্দ্দেশের জন্য পাঠায়। অধিকসংখ্যক নাগরিক যদি আইনটির স্বপক্ষে ভোট দেয় তবে আইনটি গৃহীত হয়। যদি কোন পরিষদ অন্য পরিষদের সংগে আইনটির বিষয় অনুমত হয় তবে আইনটি গণনির্দ্দেশের জন্য পাঠান হয় এবং আইনটি গৃহীত হলে নতুন ভাবে আইনসভার নির্বাচন হয় এবং যথারীতি আইনটি পাশ হয়। আইনটি প্রণীত হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে ৮টি ক্যাণ্টন একসাথে অথবা ৩০,০০০ নাগরিক গণনির্দ্দেশ দাবী কোরতে পারে। সাধারণতঃ প্রণীত আইনএর বিপক্ষ-মতবাদী নাগরিকরা জনমত গড়ে তোলে ও সই জোগাড় করে। তারপর প্রণীত আইনটিকে ছেপে সমস্ত দেশের নাগরিকদের মধ্যে দেওয়া হয়। আইনটি সম্বন্ধে নাগরিকদের মধ্যে ভোট নেওয়ার আগে আলোচনা সভাও বসে। ক্যাণ্টনগুলিতে ভোট গ্রহণ করা হলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যালট যোগান দেয়। সাধারণতঃ রবিবার ভোট গ্রহণ করা হয়।

গণনির্দেশ ও সংবিধান সংশোধন
Referendum and Constitutional Change

গণপ্রস্তাব অধিকার (Initiative):

গণনির্দ্দেশ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের জন্য একটি অপ্রত্যক্ষ উপায়। কারণ গণনির্দ্দেশ কেবলমাত্র জনসাধারণের প্রতিনিধিদের প্রণীত আইনগুলিকে গণভোটের মাধ্যমে স্বীকার করে অথবা বাতিল করে। কিন্তু প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের প্রত্যক্ষ উপায় হিসেবে সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসিরা গণপ্রস্তাব অধিকারকে বেশী পছন্দ করে। কারণ এই পদ্ধতি দ্বারা উত্থাপিত কোন বিল আইন সভার বিরোধিতা সত্ত্বেও গণভোট দ্বারা গৃহীত হলে আইন বলে

গণপ্রস্তাবের দ্বারা গণআইন প্রণয়ন
People legislates by initiative

পরিগণিত হয়। গণপ্রস্তাব অধিকারে জনসাধারণের দায়িত্ব ও অধিকারের ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

গণপ্রস্তাব অধিকারকে অনেক সময় গণআবেদন বলে ভুল করা হয়। কিন্তু এ দুটির মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। গণ আবেদন দিয়ে কেবলমাত্র আইনসভাকে কোন আইনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে সেই আইনটি পাশ করানোর জন্য অনুরোধমত কাজ করতেও পারে নাও করতে পারে। কিন্তু গণপ্রস্তাবের বেলায় যদি কোন প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ বিলের মত আইনসভায় আনা হয়, আইনসভা সেটিকে না পাল্টে ঠিক সেইরকম ভাবে আলোচনা করতে বাধ্য থাকে।

গণ প্রস্তাব অধিকার দুরকমের হতে পারে। একটিতে জনসাধারণের ইচ্ছা অনুযায়ী বিলটি প্রস্তুত করার দায়িত্ব আইনসভার ওপর থাকে। অন্যটিতে জনগণই প্রস্তাবিত আইনটিকে একটি সম্পূর্ণ বিলের আকারে আইনসভায় উপস্থিত করে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যাণ্টন উভয়েরই গণপ্রস্তাব করার অধিকার আছে। গণপ্রস্তাব করার জন্য অন্তত:পক্ষে ৫০,০০০ নাগরিকের সই দরকার হয়।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রেব প্রযোগ
Application of Direct Democracy

১৮৪৮ সাল থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসিদের কম-পক্ষে ১০০ বার ভোটদান কেন্দ্রে যেতে হয়েছে। ১৮৭৪ সাল থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে ৬২০টি আইনসংক্রান্ত বিষয় গণনির্দ্দেশের সম্মুখীন করা হয়েছে। গণনির্দ্দেশ ও গণপ্রস্তাব সম্পর্কে সচেতনতা ফ্রেঞ্চ ভাষাভাষি ক্যাণ্টনগুলির থেকেও জার্মান ভাষাভাষী ক্যাণ্টনগুলিতে অনেক বেশী।

যে ধরণের বিষয়গুলি গণভোট ও গণনির্দ্দেশের মাধ্যমে বাতিল করা হয়েছে তাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে বিষয়গুলি হয় খুব জটিল, ব্যাখ্যাহীন, বেশী কাজ সমম্বিত অথবা টাকাকড়ি সংক্রান্ত কোন বিষয়।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রেব শর্ত
Conditions of Direct Democracy

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সফলতার জন্য সুইস জাতির যে ক'টি গুণ আছে তাদের মধ্যে প্রথম হল তাদের গণতান্ত্রিক মন ও স্বাধীনতা-প্রিয়তা। দ্বিতীয়তঃ সুইসজাতি অযথা খরচ অথবা জাতীয় সম্পদ নষ্ট করার পক্ষপাতি নয়। তৃতীয়তঃ সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসীরা শান্ত ও বিচারবুদ্ধিশীল। চতুর্থতঃ সুইস সরকারের নমনীয়তা ও সহযোগীতাবোধও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সফলতার অন্যতম কারণ।

গণনির্দেশ ও গণপ্রস্তাবের জন্য সুইজারল্যাণ্ডে কতকগুলি অনুকূল রাজনৈতিক প্রবণতা দেখা যায়।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সুফল
Merits of Direct Democracy

প্রথমতঃ পরোক্ষ গণতন্ত্রের যে সমস্ত দোষ আছে সেগুলি সুইজারল্যাণ্ডে অনেক কম।

দ্বিতীয়তঃ গণনির্দেশ ও গণপ্রস্তাবের জন্য সুইস সরকারে দলীয় মনোবৃত্তি ও দলীয়প্রভাব অনেক কম।

তৃতীয়তঃ গণনির্দেশ ও গণপ্রস্তাব নাগরিকদের দেশপ্রেম বাড়ায় এবং রাজনৈতিক শিক্ষা দেয়।

চতুর্থতঃ দুটি পরিষদের মধ্যে কোন বিষয় মতানৈক্যর সমাধানের একটি প্রকৃষ্ট উপায় হল গণনির্দেশ।

সোভিয়েট সংবিধান

(Constitution of the U.S.S.R.)

প্রারম্ভিক আলোচনা (Preliminary Discussions)

মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় (Introduction to the Marxist Conception of the State) :

১৯১৭ সালের রুশবিপ্লবের পর সোভিয়েট রাশিয়ার যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে তার তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং প্রেরণার উৎস মার্ক্সীয় রাষ্ট্রদর্শন। বুর্জোয়া রাষ্ট্রদর্শনে রাষ্ট্রকে একটি সর্বনিরপেক্ষ, সমাজের উর্ধ্বে অবস্থিত, বিমূর্ত কর্তৃত্ব হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। মার্ক্স কিন্তু রাষ্ট্রকে এই ধরনের ভাববাদী দৃষ্টিভংগীতে না দেখে একান্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থারই ফলশ্রুতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সমাজে প্রচলিত অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপরেই রাষ্ট্র, আইন, সমাজ ইত্যাদির বিভিন্ন ধ্যানধারণা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।[1] সুতরাং রাষ্ট্র বলতে বাইরে থেকে সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়া কোন প্রতিষ্ঠান বোঝায় না বরং সমাজব্যবস্থারই একটা বিশেষ পর্যায়ে রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব।

সমাজেরই এক বিশেষ পর্যায়ে রাষ্ট্রের উদ্ভব
The State is a product of society at a certain stage of development

ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে মার্ক্স দেখিয়েছেন যে সমাজে শ্রেণীবৈষম্যের সঙ্গে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। পরস্পর বিবদমান শ্রেণীসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রয়োজন হয়েছে। আদিম যুগে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে মানুষ বাস করত এবং সকলের কায়িক পরিশ্রমের ফলে যা কিছু আহার্য সংগৃহীত হত সকলের মধ্যে তা সমভাবে বণ্টিত হত। ফলে শ্রেণীগত পার্থক্য বা শোষণের কোন সুযোগই এই আদিম সাম্যবাদী সমাজে (primitive communism) না থাকায় রাষ্ট্রসংগঠনের কোন প্রয়োজন দেখা যায়নি।

---

1 "In the social production of their means of life human beings enter into definite and necessary relations…The totality of these production relations constitutes the economic structure of society, the real basis upon which a legal and political superstructure arises and to which definite forms of social consciousness correspond." Introduction to "Critique of Political Economy," Karl Marx.

কিন্তু ক্রমেই উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে (কৃষিকার্য, ধাতুর ব্যবহার পণ্যবিনিময় শ্রমবিভাগ ইত্যাদি) উদ্বৃত্ত উৎপাদন ও ব্যক্তিগত মালিকানার সূত্রপাত হল। কৃষি নির্ভর সমাজে উৎপাদনশক্তির (অর্থাৎ জমি, শ্রম ইত্যাদি) মালিকেরা এই উদ্বৃত্ত শোষণ ও নিজস্ব মালিকানা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে একটি সর্বময় নিয়ামক ব্যবস্থা স্থাপনে উদ্যোগী হল। সংখ্যায় দুর্বল হওয়ায় মালিকশ্রেণী এজন্য অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব ছাড়াও কতকগুলি দমনমূলক শাসনযন্ত্র (coercive apparatus) চালু করল—যেমন, সশস্ত্র সৈন্য বাহিনী, পুলিশ, বিচারালয়, জেলখানা ইত্যাদি। এইভাবে একটি শ্রেণীর ওপর আর একটি শ্রেণীর প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্যই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সূত্রপাত হল। লেলিন এইজন্য বলেছেন, রাষ্ট্র শ্রেণী সংঘর্ষেরই ফল এবং প্রতিবিম্ব।[2] তাই দাসসমাজে (slave society) ক্রীতদাসদের ওপর দাস-প্রভুদের কর্তৃত্ব, সামন্ত সমাজে (feudal society) ভূমিদাসদের ওপর ভূম্যধিকারীব কর্তৃত্ব এবং ধনতান্ত্রিক সমাজে (capitalist society) শ্রমিকদের ওপর মূলধন-মালিকদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্যই রাষ্ট্র ব্যবহার করা হয়েছে।

রাষ্ট্র ও শ্রেণী সংঘর্ষ
The State and Class Antagonism

সমাজে শ্রেণীসংঘর্ষ দেখা দেয় কেন, এর হদিশ মিলবে উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদনসম্পর্কের পারস্পরিকতায়। বৈজ্ঞানিক যান্ত্রিক ও অন্যান্য কলা-কৌশলের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন পদ্ধতি তথা উৎপাদনশক্তির মধ্যে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে এবং এই পরিবর্তনের সঙ্গে সমাঞ্জস্য রেখে উৎপাদনসম্পর্ক যদি না পরিবর্তিত হয়, অর্থাৎ পূর্বতন মালিক শ্রমিক সম্পর্ক যদি না পাল্টে যায় তাহলে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাসের সর্বস্তরে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের উদাহারণ ছড়িয়ে আছে এবং এই শ্রেণীসংঘর্ষের ফলেই সমাজে গুরুপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন, সামন্ততান্ত্রিক সমাজে যখন ভূমিকেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার পাশাপাশি ক্রমশঃ শিল্পকেন্দ্রিক উৎপাদনব্যবস্থা এবং পণ্যের বাজার প্রসার লাভ করতে লাগল, তখন নূতন উৎপাদনী শক্তির প্রতিভূ শিল্পপতি বা বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের প্রাধান্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। অথচ পুরোণ ক্ষয়িষ্ণু শোষকশ্রেণী অর্থাৎ সামন্তবর্গ নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ কায়েম রাখার জন্য নূতন উৎপাদনশক্তিকে বাধা দিতে ছাড়ল না।

শ্রেণীসংঘর্ষ ও সমাজবিপ্লব
Class struggle and social Revolution

---

[2] "The State is the product and manifestation of the irreconciliability of class antagonisms". V. I. Lenin : "The State and Revolution"

এর ফলে শিল্পপতিদের নেতৃত্ব সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধে সামাজিক বিপ্লব শুরু হল এবং শেষ পর্যন্ত ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল। নূতন সমাজ ব্যবস্থায় ভূম্যধিকারী ও ভূমিদাসদের স্থানে দেখা দিল মালিকশ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণী। আবার ধনতন্ত্রেরও ক্রমপরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তার নিজস্ব অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে দেখা দেয়। দেশের সমগ্র শ্রমশক্তির সহযোগিতায় যে উৎপাদন হয় তার অতি নগণ্য অংশ শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টিত হয় এবং অবশিষ্ট সমস্ত উদ্বৃত্তমূল্য (surplus value) মুনাফার আকারে মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণীর হাতে সঞ্চিত হয়। প্রতিযোগিতা-মূলক মুনাফালোভী উৎপাদনব্যবস্থায় আর্থিক সংকট, ব্যবসায়িক উত্থান-পতন, বেকার সমস্যা এবং সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদী সংগ্রাম সমাজজীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। ক্রমশঃ শ্রমিক ও মালিক শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ তীব্র হয়ে ওঠে এবং একসময় সর্বহারা শ্রমিক সম্প্রদায় একযোগে সামাজিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে ধনতন্ত্রের উৎখাত করে।

ইতিহাসের এই বস্তুবাদী ব্যাখ্যার শ্রেণীসংঘর্ষের অবশ্যম্ভাবিতা কার্ল মার্কস অর্থনৈতিক কারণেই অমোঘ বলে মনে করেন (Economic Determinism)। প্রত্যেক শ্রেণীবৈষম্য-মূলক সমাজে উৎপাদনের শক্তি সমূহের ওপর যে শ্রেণীর মালিকানা, সেই শ্রেণীই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে এবং নিজেদের এই সুযোগ-সুবিধাকে কায়েম রাখার জন্য রাষ্ট্রশক্তিকে নিয়োজিত করে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব
The Socialist Revolution

মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে রাষ্ট্র তাই শোষণ যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। ক্রমাগত শোষণের ফলে শ্রেণী সংঘর্ষ রাষ্ট্রনৈতিক সংঘর্ষে পরিণত হয় এবং এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে সামাজিক বিপ্লব ঘটে, অর্থনৈতিক অবশ্যম্ভাবিতার তত্ত্ব অনুসরণ করে মার্কস প্রচলিত ধনতন্ত্রের অবসান এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। শ্রমিকশ্রেণী বা সর্বহারার বিপ্লবের মধ্য দিয়েই এই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে। তবে অন্যান্য বিপ্লবের ফলে একটি শোষকশ্রেণীর বদলে যেমন আর একটি শোষকশ্রেণীর ক্ষমতা লাভ করে, এক্ষেত্রে সেরকম কোন শোষকশ্রেণীর উদ্ভব হয় না। উৎপাদনব্যবস্থার ওপর মালিকানা এবং তার ফলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব সামগ্রিকভাবে সমাজের ওপরেই অর্পিত হয়।

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই অবশ্য রাষ্ট্র-বিবর্তনের শেষ কথা নয় এবং এই স্তরেও শ্রেণী সংগ্রামের অবসান ঘটে না। রাষ্ট্র কর্তৃত্ব দখল করে মেহনতী শ্রেণীকে ঘরে-বাইরে প্রতিবিপ্লবী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির উচ্ছেদের জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রকে

ব্যবহার করতে হয়। বিপ্লবী সরকারকে সফল ও সুদৃঢ় করার এই প্রতিরোধ-মূলক পর্যায়কে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র (Dictatorship of the Proletariat) বলা হয়। সমাজ থেকে শোষণের বিলোপ, সমাজতন্ত্র গঠন ও সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রয়োগ এই একনায়কতন্ত্রের কাজ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ রচনায় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব একটি শ্রেণী অর্থাৎ মেহনতী শ্রেণীর স্বার্থেই অপরিহার্য হয়ে রয়েছে। কিন্তু মার্ক্সীয়দর্শন অনুযায়ী রাষ্ট্রের বিলুপ্তি এবং সাম্যবাদী সমাজ স্থাপনই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চরম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌছবার সর্বপ্রধান শর্ত হল শ্রেণীসংঘর্ষের অবসান। পূর্ণ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শ্রেণীবিরোধ অবসিত হবে বলে আশা করা হয়েছে ; কারণ সমাজে এখন একটি মাত্র শ্রেণীই থাকবে—সে শ্রেণী শ্রমিক ও কৃষকদের শ্রেণী। যেহেতু শ্রেণী-সংঘর্ষের পটভূমিকায় শোষণযন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল, সেইহেতু শ্রেণীসংঘর্ষের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে। একেই 'Withering away of the state' বা রাষ্ট্রের ক্রমবিলোপ বলা হয়েছে। শ্রেণী-বিহীন ও রাষ্ট্র-বিহীন এই যে সমাজ, এখানেই যথার্থ সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং সমাজতন্ত্র সাম্যবাদের পথে পদার্পণের প্রাথমিক স্তর। উৎপাদন শক্তিগুলির রাষ্ট্রীয়করণ এবং মুনাফা ও শোষণের অবসানের মধ্যদিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সাম্যবাদী সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। বণ্টন ব্যবস্থার দিক থেকে এই দুই ব্যবস্থার পার্থক্য হল—সমাজতন্ত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির শ্রমানুপাতিক ভোগ আর সাম্যবাদী সমাজে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে ভোগ ("from each according to his ability, to each according to his needs")।

সাম্যবাদীসমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা
Foundation of the Communist society.

সোভিয়েট সংবিধানের বিবর্তন (Evolution of the Soviet Constitution) :

যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা মাকর্সীয় রাষ্ট্রদর্শনে বলা হয়েছে আধুনিক রাশিয়া তার প্রথম পতাকাবাহক। অথচ তত্ত্বের দিক থেকে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বশর্তগুলির (Prerequisites) অস্তিত্ব ছিল বলা চলে না। বুর্জোয়া-নিয়ন্ত্রিত শিল্পান্বিত সমাজের বদলে রাশিয়া তখনও স্বৈরাচারী জারের শাসনে সামন্ত-সমাজকে জীইয়ে রেখেছিল। আসলে উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়াও সমাজ-বিপ্লবের জন্য সবচেয়ে বড়ো যা প্রয়োজন, সেই

প্রাক বিপ্লব রাশিয়া
Pre-revolution Russia

গণ-অসন্তোষ রাশিয়ায় ভীষণ আকার ধারণ করেছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের টুকরো টুকরো সংস্কার সত্ত্বেও দেশের জনসাধারণ দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য আর সর্বোপরি আমলাশ্রেণীর প্রতিকারবিহীন অত্যাচারে মরীয়া হয়ে উঠেছিল। এই সময় ১৯০৪—৫ সালে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে রাশিয়ায় জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিক্ষোভ দেখা দিল। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য নিয়মতান্ত্রিক শাসনের প্রতিশ্রুতি এবং Duma সমূহ (রাশিয়ার তৎকালীন প্রতিনিধি পরিষদ) আহ্বান করা হলেও, জারের অত্যাচার অব্যাহত রইল। ফলে দেশের নানাস্থানে বিপ্লবী সংস্থা গড়ে উঠল এবং ঘরে-বাইরে জারতন্ত্র উচ্ছেদের চেষ্টা চলতে লাগল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও বিপ্লব
World-War I & the Revolution

এই অবস্থায় আবার জার্মানীর সাহায্যপুষ্ট অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সার্বিয়ার পক্ষ নিয়ে রাশিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। ফলে জনসাধারণের দুরবস্থা বেড়েই চলল। যুদ্ধে জারসরকারের দুর্বলতা ক্রমেই প্রকট হয়ে দেখা দিতে লাগল। এই সুযোগে ১৯১৭ সালে বিপ্লবী সংস্থাগুলি জারশাসনের পতন ঘটিয়ে একটি অস্থায়ী সরকার স্থাপন করল। কিন্তু অস্থায়ী সরকার মৌলিক পরিবর্তনের কোন চেষ্টা না করে পশ্চিমী গণতন্ত্রের অনুকরণে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনে মনোযোগী হওয়ায় প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহ ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। এই সময় ভি, আই লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক দল সরাসরি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কার্যক্রম নিয়ে সোভিয়েট বা প্রতিনিধি সভাগুলিতে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে এবং ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর অস্থায়ী সরকারের উচ্ছেদ করে সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।

১৯১৮ সালের সংবিধান
The constitution of RSFSR of 1918

এরপর ১৯১৯ সালে কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের নির্দেশে দেশের জন্য একটি নূতন সংবিধান রচনায় ভার পড়ে একটি কমিটির ওপর। খসড়াটি সমগ্র রাশিয়ার সোভিয়েট সমূহের পঞ্চম অধিবেশনে অনুমোদিত হয় এবং নূতন সংবিধান ১৯১৮ সালের জুলাই থেকে চালু হয়। সর্বহারার শাসন প্রতিষ্ঠা এবং শোষকশ্রেণীর উচ্ছেদ ছিল এই সংবিধানের উদ্দেশ্য। স্বাভাবিকভাবেই মূলধন—মালিক, সম্রাট-বংশের জীবিত ব্যক্তিগণ, ধর্মযাজক সম্প্রদায় এবং পুরাতন জার আমলের আমলাশ্রেণীকে এই সংবিধানে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। বিদ্যালয়ে ধর্মপ্রচার নিষিদ্ধ হয় এবং

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাষ্ট্রের সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করা হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার মূল কর্তৃত্ব থাকে একটি Central Executive কমিটি বা কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের হাতে। তবে গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তি রচনার জন্য সোভিয়েট সমূহের একটি কংগ্রেস (All Russian Congress of Soviets) স্থাপিত হয়েছিল। এই কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ নির্বাচন করত। এছাড়া কংগ্রেস ও কার্যকরী পরিষদের কাছে একযোগে দায়ী একটি Council of People's Commissars-ও গঠন করা হয়েছিল। এই সংবিধানে রুশ রাষ্ট্রের নাম দেওয়া হয়েছিল Russian Socialist Federated Soviet Repulic (RSFSR)।

ইতিমধ্যে সোভিয়েট রাষ্ট্রব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। চারটি অঙ্গরাজ্য নিয়ে পূর্বতন R.S.F.S.R. একটি রাষ্ট্র সম্মেলনে পরিণত হল ১৯২২ সালে। এই নূতন Union of Soviet Socialist Republics (U.S.S R) এর জন্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের নির্দেশে ১৯২৪ সালে একটি নূতন সংবিধান প্রবর্তিত হয়। এই সংবিধানের বিশেষত্ব হল যে যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং অঙ্গরাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের পরিষ্কার বিধান এতে দেওয়া হয়। কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে ক্ষমতা দিয়ে অবশিষ্ট সকল ক্ষমতা অঙ্গরাজগুলির ওপর অর্পিত হয়। এই সংবিধানেও ভোটাধিকার পূর্বের মতই সীমিত রাখা হয়েছিল এবং সমগ্র রাশিয়ার 'কংগ্রেস অব সোভিয়েট্স্' অপরিবর্তিত রইল, শুধু কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদে দ্বিকক্ষ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে একটি Union of Soviets এবং একটি Soviet of Nationalities গঠন করা হল। প্রথম কক্ষে সমগ্র জনসাধারণের প্রতিনিধিরা প্রাপ্তবয়স্ক ভোটে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জনসংখ্যার অনুপাতে নির্বাচিত হতেন। দ্বিতীয় কক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী অঙ্গরাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হল। স্বভাবতঃই দ্বিতীয় কক্ষের থেকে প্রথম কক্ষের আকৃতি বৃহত্তর ছিল। ব্যবস্থাপক সভায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এল ২৭ জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি প্রেসিডিয়ম স্থাপনের মধ্য দিয়ে। এই ২৭ জনের মধ্যে ৯ জন Union of Soviets কক্ষ দ্বারা, ৯ জন Soviet of Nationalities কক্ষের দ্বারা এবং উভয়ের সম্মিলিত অধিবেশনে বাকী ৯ জন নির্বাচিত হতেন। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের কার্যপালিকা বিভাগ হিসাবে বিভিন্ন বিভাগের শাসনপরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ একটি Council of People's

১৯২৪ সালের সংবিধান
The Constitution of the U.S.S.R. of 1924

Commissar নিয়োগ করত। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত এই সংবিধান অনুযায়ী সোভিয়েট শাসনকার্য পরিচালিত হয়েছিল।

সোভিয়েট রাশিয়ার সাংবিধানিক ইতিহাসে ১৯৩৬ সাল একটি স্মরণীয় তারিখ। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্রমান্বয়ে শক্তিসঞ্চয় এবং উপর্যুপরি দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যমণ্ডিত রূপায়নের ফলে দেশের পুরোন শ্রেণী-বিভেদ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে এসেছে। বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের অবদমনের জন্য এতদিন যে সমস্ত কঠোর নিয়ন্ত্রণ চালু ছিল এবার সেগুলি শিথিল হওয়ার প্রতীক্ষিত সময় এলো। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য সর্বত্রই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং উৎপাদনব্যবস্থায় বৃহদায়তন যান্ত্রিক পরিবর্তনের ফলে দেশের রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক কাঠামোতেও আনুষঙ্গিক পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিল। নূতন পটভূমিকায় প্রচলিত সংবিধানের আমূল সংশোধনের এক প্রস্তাব দেওয়া হল সোভিয়েট সমূহের সপ্তম কংগ্রেসে। সংবিধান-রচনা পরিষদকে যে সমস্ত নিদেশ দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল, ভোটাধিকার প্রসার ও গোপন ভোট গ্রহণের পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচন ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রসম্মত করা এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংযোগটি সুপরিস্ফুট করা। ষ্ট্যালিনের সভাপতিত্বে ৩১ জন সদস্য সমন্বিত সংবিধান রচনা পরিষদ নূতন সংবিধানের খসড়া যে প্রস্তুত করে জনমত গঠনের জন্য তা বিপুলসংখ্যায় প্রচারিত হয় এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য অসংখ্য সভাসমিতিতে অলোচনা চলে। অবশেষে সোভিয়েট সমূহের কংগ্রেসে ১৯৩৬ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে নূতন সংবিধান অনুমোদন লাভ করে।

ষ্ট্যালিন সংবিধান
The Stalin Constitution (1936)

সোভিয়েট সংবিধানের বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করলে কতকগুলি মূলনীতি চোখে পড়ে। সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে এই নীতিগুলি হল, (১) মেহনতী শ্রেণীর শাসনকর্তৃত্বের নিয়মতান্ত্রিক সংহতি, (২) সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রসার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার বস্তুগত প্রতিশ্রুতি, (৩) প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের নির্মম উচ্ছেদসাধন, (৪) প্রতিটি সাংবিধানিক পরিবর্তনের পশ্চাতে জনসম্মতি এবং প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের অনুমোদন এবং (৫) নিয়মতান্ত্রিকতার সংরক্ষণের জন্য কম্যুনিষ্ট পার্টির সদা-সচেতন নেতৃত্ব।

সোভিয়েট সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ (Salient Features of the Soviet Constitution) :

রাষ্ট্র যে সমাজব্যবস্থারই প্রতিফলন বা সামাজিক কাঠামোর ওপরেই যে রাষ্ট্রীয় উপ-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে—মার্ক্সীয় রাষ্ট্রদর্শনের এই মূলনীতি সোভিয়েট সংবিধানে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। সংবিধানের প্রথম অধ্যায়ে তাই সোভিয়েট সমাজব্যবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং ১ম ধারায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে: "সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের সম্মেলন শ্রমিক ও কৃষকদেরই সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র।"[3] ৪র্থ ধারায় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি হিসাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা এবং উৎপাদন শক্তিসমূহের রাষ্ট্রীয় মালিকানার উল্লেখ করা হয়েছে; আর মেহনতী মানুষের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সোভিয়েট সমূহকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তার রাজনৈতিক ভিত্তি হিসাবে। পরিশেষে শ্রমের মর্যাদা এবং শ্রমের উৎকর্ষ অনুসারে উৎপন্ন সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক নীতি বলে গ্রহন করা হয়েছে।[4]

সমাজ ও রাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক
State & Society closely related

সংবিধানের লিখিত বিধানসমূহ থেকে সোভিয়েট রাশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন কাঠামো প্রবর্তিত হয়েছে বলা চলে। সমমর্যাদাসম্পন্ন ১৫টি ইউনিয়ন রিপাব্লিকের স্বেচ্ছায় সম্মিলনের ফলে উদ্ভূত এই যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলি পারস্পরিক ক্ষেত্রাধিকার নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ১৪ সংখ্যক ধারায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাগুলির উল্লেখের পর ১৫ সংখ্যক ধারায় অবশিষ্ট সমস্ত বিষয়ে অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য প্রতিশ্রুত হয়েছে। প্রত্যেক ইউনিয়ন রিপাব্লিক নিজস্ব সংবিধান অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করে। মোটামুটিভাবে এই লিখিত সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়ও বটে; সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি ছাড়া সংবিধান সংশোধন করা যায় না। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এই সব বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কতকগুলি বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করা দরকার। প্রথমতঃ, আইনতঃ প্রত্যেক

যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈচিত্র্যসমূহ
Federal Peculiarities

---

3 "The Union of Soviet Socialist Republics is a socialist state of workers and peasants" – Constn, of U.S.S.R. Art. I.

4 "Work in the U.S.S.R. is a duty and a matter of honour for every able bodied citizen in accordance with the principle : He who does not work, neither shall he eat. The principle applied in the U.S.S.R. is that of socialism : 'From each according to his ability, to each according to his work".—Ibid, Art, 12.

অঙ্গরাজ্যগুলির যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রয়েছে (যদিও একটিমাত্র রাজনৈতিক দল কম্যুনিষ্ট পার্টির সর্বব্যাপী নির্দেশে এই সুযোগের বাস্তবতা প্রশ্নসাপেক্ষ)। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। তৃতীয়তঃ, সাংবিধানিক নির্দেশসমূহের ব্যাপারে বিরোধের ক্ষেত্রে আইনগত ব্যাখ্যার ভার দেশের সর্বোচ্চ আদালতে ন্যস্ত হয়নি। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রেসিডিয়মের ওপর। এ ছাড়া অঙ্গরাজ্যগুলির সঙ্গে আইন প্রণয়নে বিরোধ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় আইনই বলবৎ থাকে এবং সংবিধান সংশোধনেও সম্পূর্ণ উদ্যোগ কেন্দ্রীয় আইনসভাই নিয়ে থাকে।

সোভিয়েট রাশিয়ায় যে সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সংবিধানের ধারা সৃষ্ট হয়েছে আপাতদৃষ্টিতে পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রচলিত প্রতিষ্ঠান সমূহের সঙ্গে তাদের গঠনগত সাদৃশ্য উদ্দেশ্যের দিক থেকে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। পাশ্চাত্য দেশগুলির মত সোভিয়েট রাশিয়াতেও ব্যবস্থাপক সভা, কার্যপালিকা বিভাগ এবং বিচার পরিষদ—এই তিনশ্রেণীর সংস্থা থাকলেও কোন সংস্থারই কোন বিষয় অন্য-নিরপেক্ষ (exclusive) নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব নাই কারণ, ক্ষমতা-বিভাগের দ্বারা পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের মাধ্যমে স্বৈরাচারের প্রতিরোধ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার সংরক্ষণের তত্ত্বটি সোভিয়েট সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ মেনে নিতে পারেননি। তাঁদের মতে এই ধরণের বিভাজন ও নিয়ন্ত্রণের ধাপে রাষ্ট্রশক্তি অপটু হয়ে পড়ে আর এর জন্য ব্যক্তি স্বাধীনতারও কিছু উন্নতি হয়না। সমাজের শ্রেণী সম্পর্কের ওপরই ব্যক্তিস্বাধীনতা নির্ভর করে। এছাড়া আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ প্রচলিত থাকলেও ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে কার্যপালিকাবিভাগ, বিশেষতঃ আমলাতন্ত্রেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। সোভিয়েট রাশিয়ার সমস্ত রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপের একটি মাত্র লক্ষ্য: সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সংরক্ষণ এবং সমভোগবাদী সমাজে তার উত্তরণ। এর জন্যে জনসাধারণের মধ্যে যেমন কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে, রাষ্ট্রশক্তিতেও তেমনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই জন্যই সুপ্রীম সোভিয়েট একাধারে ব্যবস্থাপনা, বিচার ও শাসনক্ষমতার অধিকারী।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতির অনুপস্থিতি
Absence of separation of powers

সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের মত (federal council) সোভিয়েট

রাশিয়াতে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে প্রেসিডিয়ম (presidium) নামে এক যৌথ সংস্থার ওপর। এই প্রেসিডিয়ম অবশ্য সুপ্রীম সোভিয়েটের দ্বারাই নির্বাচিত হয় এবং সুপ্রীম সোভিয়েটের কাছে দায়ী থাকে। আবার দুইকক্ষের বিরোধের ক্ষেত্রে সুপ্রীম সোভিয়েটকে ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতাও প্রেসিডিয়মকে দেওয়া হয়েছে। এদিক থেকে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সঙ্গে কিছুটা তুলনীয় হলেও ক্ষমতার দিক থেকে উভয়ের আকাশ-পাতাল প্রভেদ রয়েছে। প্রেসিডিয়মের প্রশাসন বিভাগের ওপর কোন কর্তৃত্ব নাই। শাসন-পরিচালনার ভার বিভাগীয় মন্ত্রিদের ওপর অর্পিত। কেবল আইনসভার অধিবেশন, নির্বাচন অনুষ্ঠান, বৈদেশিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষা এবং কিছু কিছু আলংকারিক ক্ষমতা (খেতাব, নাগরিকতা প্রদান ইত্যাদি) এই প্রেসিডিয়মের রয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে অপরাধীর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের যে ক্ষমতা অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের রয়েছে। সেটি ছাড়াও প্রেসিডিয়ম আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিচারবিভাগীয় কাজ করে থাকে। সংবিধানের ব্যাখ্যা এবং সংবিধান বিরোধী আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশ বাতিল করার ক্ষমতা বিচার-বিভাগের বদলে প্রেসিডিয়মের হাতেই দেওয়া হয়েছে।

যৌথ রাষ্ট্রপ্রধান
Collegial Executive Head

অন্যান্য দেশে বিচারবিভাগকে অন্যান্য শাসনপ্রতিষ্ঠান থেকে স্বতন্ত্র এবং রাজনীতির উর্ধ্বে অবস্থিত বলে মনে করা হয়। সরকারী অতি-কর্তৃত্ব বা আইনসভার স্বেচ্ছাচারিতা থেকে ব্যক্তি স্বাধীনতার সংরক্ষণ এবং সংবিধান-সম্মতভাবে শাসনপরিচালনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাই বিচার-বিভাগীয় স্বাধীনতার ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু রুশ সংবিধান বিশেষজ্ঞগণের মতে বিচারব্যবস্থাকে রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপের উর্ধ্বে একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান বলে মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। বরং পাশ্চাত্য রাষ্ট্রে শ্রেণীস্বার্থে যে সমস্ত আইন ও শাসন-বিভাগীয় নির্দেশ প্রবর্তিত হয়, বিচারবিভাগও শ্রেণী-স্বার্থেই সেইসব আইন ও নির্দেশের মর্যাদা রক্ষা করে থাকে। বস্তুতঃ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিচারবিভাগের উদ্দেশ্যের কোন বিরোধ থাকতে পারে না। সোভিয়েট রাশিয়াতেও বিচারালয়গুলির উদ্দেশ্য হল সমাজতন্ত্র গঠনের অনুকূল সমস্ত রাষ্ট্রীয় আইনের রক্ষণাবেক্ষণ করা। সেখানে বিচারকগণ স্বাধীন কোন মতামত প্রকাশ করেন না, সমাজতান্ত্রিক আইনের ধারণা অনুযায়ী তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য
Peculiarities of the judiciary

সোভিয়েট বিচারব্যবস্থার আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল এর গণতান্ত্রিকতা। সেখানে বিচারকগণ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন এবং জনগণের দ্বারাই recall বা প্রত্যাবর্তনের দাবীতে অপসারিত হন। এছাড়া বিচারার্থে সবসময় জনগণের এ্যাসেসরগণ উপস্থিত হলে সহযোগিতা করে থাকেন।

জনসাধারণের মূলগত অধিকারগুলির সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি সোভিয়েট রাশিয়াতেও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অধিকারগুলির উল্লেখ করেই সংবিধান রচয়িতাগণ ক্ষান্ত হননি। ঐ সমস্ত অধিকার কিভাবে কার্যকরী হবে তারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এইজন্য শিক্ষার অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, অবসরের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন কার্যকাল নির্ধারণ ও অবসর উদযাপনের জন্য স্যানাটোরিয়ম, ক্লাব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা, কর্মসংস্থানের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য সমস্ত অর্থনীতির সমাজতন্ত্রীকরণ ইত্যাদি একাধিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর বর্তেছে। আবার সোভিয়েট সংবিধানে নাগরিকদের শুধুমাত্র অধিকার ও সুযোগ সুবিধার কথাই উল্লেখ করা হয়নি। সংবিধান ও আইনকানুন মেনে চলা, সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি সংরক্ষণ, প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত—রাষ্ট্রনীতির এই মূল তত্ত্বটি একমাত্র সোভিয়েট সংবিধানেই তখন লিখিতভাবে স্থান পেয়েছে।

নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যের সংযোগ
Rights & Duties of the citizens go together

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়াতে গণতন্ত্র পরিপূর্ণতা লাভ করেছে বলে মনে করা হয়। অর্থনৈতিক শোষণ, ধনবৈষম্য, দারিদ্র প্রভৃতি সামাজিক অবক্ষয় সেখানে সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করা হয়েছে। জীবনে অর্থ নৈতিক নিরাপত্তা এবং সর্বত্র সমান অধিকার থাকায় জনগণ অধিক মাত্রায় গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি কাজে লাগাতে পারে। আনুষ্ঠানিকভাবেও সোভিয়েট রাশিয়ায় সর্বাধিক ভোটাধিকার, গোপন ব্যালটে নির্বাচন, জাতি-ধর্ম শিক্ষা স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সুপ্রীম সোভিয়েটে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, সমাজতন্ত্র অক্ষুণ্ণ রেখে সভাসমিতি শোভাযাত্রার অধিকার ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সংস্থা গড়বার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এইভাবে গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা সমস্ত জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

একদল ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ
One party system & Democratic Centralism

এরই পাশাপাশি আবার রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব কেন্দ্রীকরণের প্রবণতাটি লক্ষ্য করা

প্রয়োজন। একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের ওপর সর্বময় কর্তৃত্ব থাকায় ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে একটি গোষ্ঠীর হাতে। দেশে অন্য কোন বিরোধী রাজনৈতিকদল গড়ে তোলার সুযোগ নাই ; নির্বাচনে কম্যুনিষ্ট পার্টিই প্রার্থীদের মনোনয়ন দিয়ে থাকে। সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন, যুবসংস্থা, যৌথসমবায় সর্বত্র কম্যুনিষ্ট পার্টির অবিসংবাদিত নেতৃত্ব। গণতান্ত্রিক সংবিধানে নিরঙ্কুশ ক্ষমতাসম্পন্ন একদলীয় কর্তৃত্ব থাকায় Democratic Centralism বা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ কথাটির উদ্ভব হয়েছে। এই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ অবশ্য কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষেও প্রযোজ্য। কারণ গঠনের দিক থেকে পার্টি মেহনতী মানুষদেরই প্রতিভূ। সমস্ত নেতৃপদ, কমিটি-সদস্যপদ নির্বাচনের মাধ্যমেই পরিপূর্ণ হয়ে থাকে এবং নেতৃবৃন্দ সাধারণভাবে দলীয় সংস্থার কাছে দায়ী থাকেন। এই সঙ্গে আবার পার্টিতে গৃহীত নীতি পার্টি প্রদত্ত আদেশ নির্দেশ বিনাবিরোধিতায় মেনে নেওয়ার বাধ্যবাধকতাও রয়েছে। সুতরাং বলা চলে সোভিয়েট রাশিয়ায় পার্টির মধ্যে, এবং পার্টির বাইরে সাধারণ শাসনের ক্ষেত্রে সর্বত্র গণতন্ত্র ও কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

এই আলোচনা থেকে দেখা গেল সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থায় তত্ত্ব ও প্রয়োগ উভয় ক্ষেত্রেই প্রচলিত ধ্যান ধারণার বহু ব্যতিক্রম সাধিত হয়েছে। এর কারণ সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ইতিহাসের একটি অভিনব পর্যায়[5] সূচিত করেছে। এর আগে কোথাও কখনও সমাজতন্ত্রকে বাস্তব রূপায়নের চেষ্টা হয়নি। সুতরাং আমূল পরিবর্তিত একটি সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি যে বিচিত্র ভূমিকা গ্রহণ করবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নাই।

সোভিয়েট দেশের সামাজিক কাঠামো (Social Structure of the Soviet Union) :

পাশ্চাত্য দেশগুলির সংবিধানে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন উল্লেখ দেখা যায় না। সম্ভবতঃ রাষ্ট্রযন্ত্রের কষ্ট-কল্পিত নিরপেক্ষতার ধারণাই এই বিষয়ে মনোযোগের অভাবের কারণ। মার্ক্সীয় তত্ত্বে অনুপ্রাণিত সোভিয়েট সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাব

---

5 The U.S.S.R is "an entirely novel socialist state, unprecedented in history." —J. Stalin.

গ্রহণ করে সংবিধানের প্রথম অধ্যায়েই দেশের সামাজিক কাঠামোর বিবরণ লিপিবদ্ধ করে এক নতুন নজীর সৃষ্টি করেছেন। সংবিধানে বলা হয়েছে যে সোভিয়েট রাশিয়া শ্রমিক ও কৃষকের রাষ্ট্র। এর রাজনৈতিক ভিত্তি মেহনতী মানুষের প্রতিনিধিসভা সোভিয়েটসমূহ এবং এর অর্থনৈতিক ভিত্তি সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা খাতে ব্যক্তিগত মালিকানা শোষণ ও ধনতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সমস্ত উৎপাদনশক্তির ওপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

সোভিয়েট রাশিয়ায় সমস্ত জাতীয় সম্পদ সমাজেরই অঙ্গীভূত। এই সামাজিক সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত হতে পারে অথবা সমবায়মূলক বা সমষ্টিগত সম্পত্তি হিসেবেও থাকতে পারে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ ভূমি, খনিজ, জলজ, বনজ সম্পদ ইত্যাদি এবং কারখানা, নৌ-বিমান ও স্থল-পরিবহন, বন্দর, ব্যাঙ্ক, যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষি-শিল্পায়নের সমস্ত বড় বড় উদ্যোগ ও শহর ও শিল্পাঞ্চলে অধিকাংশ বসতবাড়ীই রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তি বলে পরিগণিত। যৌথ ও সমবায় সংস্থাগুলির দ্বারা পরিচালিত খামারসমূহ, তাদের পশু ও যন্ত্রপাতি, ও বাড়ীঘর প্রভৃতি ঐসব সংস্থার আয়ও সামাজিক সম্পত্তি বলে ধরা হয়।

সমাজের অঙ্গীকৃত সম্পত্তি
Socialist Property

রাষ্ট্রায়ত্ত ও যৌথ ভূ-সম্পত্তি ছাড়াও প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব একখণ্ড করে জমি আছে। যৌথ ও সমবায় খামার থেকে প্রাপ্ত উৎপাদনের অংশ ছাড়াও এই জমি কাজে লাগিয়ে পরিবারগুলি অতিরিক্ত উপার্জন করতে পারে। এ ছাড়া পারিবারিক প্রয়োজনের জন্য পশুপালনের ব্যবস্থা, পোলট্রি চালানো যায়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পাশাপাশি ব্যক্তিগত শ্রম ও কুশলতা নিয়োগ করে ছোটখাট কৃষি-শিল্প বা তৎসংক্রান্ত বেসরকারী উদ্যোগও চলতে পারে; কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই অন্যের শ্রম-শোষণ করা চলবে না। শ্রমের দ্বারা অর্জিত অর্থ, সঞ্চিত অর্থ, বসতবাড়ী, ঘর-গৃহস্থালীর আসবাব ও জিনিষপত্র এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বিলাসদ্রব্য ও আভরণ সমূহের ওপর সকলের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে।

ব্যক্তিগত শ্রমবিনিয়োগের সুযোগ
Scope of personal application of labour

সোভিয়েট রাশিয়ার অর্থনৈতিক জীবন জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। এইসব অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল জাতীয় সম্পদের পরিবর্ধন, মেহনতী মানুষের জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য-বৃদ্ধি ও

সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন, সমাজতন্ত্রের অধিকতর সংহতি, এবং দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দুর্ভেদ্যতা। এই উদ্দেশ্য সফল করতে গিয়ে মেহনতী মানুষের পথ-প্রদর্শক কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সমাজ-উন্নয়নে প্রত্যেক নাগরিককেই সাধ্যমত অংশগ্রহণ করতে হয়। সোভিয়েট দেশে কাজ করা সকলের পক্ষেই একটি সম্মানজনক কর্তব্য বলে মনে করা হয়। বলা হয়ে থাকে যে, 'যে কাজ করে না সে খেতেও পাবে না' (He who does not work, neither shall he eat.)। পরিশেষে পরিকল্পনাজাত সমস্ত সমৃদ্ধিতে সকলের সমান অংশ। বর্তমান উৎপাদনব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পদ বণ্টনে এই সমাজতান্ত্রিক নীতি গৃহীত হয়েছে; 'সকলে যোগ্যতামত কাজ করবে আর কাজের অনুপাতে ভোগ করবে' (from each according to his ability, to each according to his work)।

পরিকল্পিত অর্থনীতি
Planned Economy

সোভিয়েট দেশে শিক্ষার অগ্রগতি অন্য সমস্ত দেশকে হার মানিয়েছে। যে দেশে জার আমলে শতকরা ৬৭ জন অশিক্ষিত ছিল এখন সেখানে অতি বৃদ্ধ শ্রেণী ছাড়া অশিক্ষিতের চিহ্নই পাওয়া যাবে না। শিক্ষার এই বিপুল প্রসারের মূলে রয়েছে সমভোগবাদের আদর্শের তাগিদ। লেনিন বলেছেন, অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে সমভোগবাদ প্রতিষ্ঠা করা যায় না ("you cannot build a communist state with an illiterate people")। রাশিয়ায় তাই বিজ্ঞান-কারিগরি কলা-বাণিজ্য সকল স্তরেই শিক্ষাকে সার্বজনীন করে তোলার প্রয়াস চলেছে। দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা অবশ্য পুরোপুরি রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত। মূলতঃ দুটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে সেদেশে শিক্ষা দেওয়া হয় :—(১) মার্ক্সীয় দর্শন উপলব্ধির মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রচেতনা সৃষ্টি (বিকৃত ভাষায় যাকে রাজনৈতিক দীক্ষাদান বা political indoctrination বলা হয়), এবং (২) দ্রুত উন্নয়নশীল অর্থনীতির জন্য উপযুক্ত সংখ্যায় সুদক্ষ কর্মী সৃষ্টি।

সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা
Universal Education

স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকার পাশ্চাত্য দেশগুলিতে স্বীকার করে নেওয়া হলেও সোভিয়েট রাশিয়ায় এর বাস্তব রূপায়নের সন্দেহাতীত উদাহরণ স্থাপিত হয়েছে। কলকারখানার সাধারণ শ্রমিক থেকে শুরু করে বড় বড় ইঞ্জিনীয়ার, সামান্য নার্স/নারী শিক্ষিকা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসকগণ, লেখিকা, সোভিয়েট সদস্যা সেদেশে অজস্র সংখ্যায়

বর্তমান। এমনকি সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রেসিডিয়ামেও ১৯৫৬ সালে মাদাম ফুর্তসেবা নাম্নী এক মহিলাকে স্থান দেওয়া হয়েছিল।[৫]

সমাজে নারীর স্থান
Position of women in Society

সমাজের সকল স্তরে মহিলাদের পদক্ষেপে সামগ্রিকভাবে জাতীয় অগ্রগতি দ্রুততর হয়েছে। কিন্তু সেজন্য পারিবারিক জীবনের প্রয়োজনীয় কর্তব্য ও পবিত্র বন্ধনে যাতে শৈথিল্য না আসে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এইজন্য বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, মাতৃত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে একাধিক আইন করা হয়েছে।

শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান-উন্নয়ন এবং দুঃস্থ অবসরপ্রাপ্ত ও অকর্মণ্যদের সুবিধার জন্য একটি সর্বব্যাপী সমাজসেবামূলক পরিকল্পনা নূতন শাসনের অন্যতম কৃতিত্ব। পাশ্চাত্য দেশেও এইরকম পরিকল্পনা চালু করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে সামাজিক ন্যায়ের (social justice) থেকেও বড়ো যে প্রয়োজনে এইসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে শ্রমনিয়োগের স্তরে হ্রাসবৃদ্ধির ক্ষতিপূরণ করা। সে সব দেশে তাই ব্যাপকভাবে বেকারভাতা (unemployment aid) দেওয়া হয়ে থাকে। সোভিয়েট রাশিয়ায় বেকার-সমস্যা নাই। কাজেই জনকল্যাণের উদ্দেশ্য নিয়েই সমাজসেবামূলক ব্যবস্থাগুলি সেখানে গ্রহণ করা হয়েছে। যৌথ ও সমবায় খামার এবং অন্যান্য যে সমস্ত শ্রমিক এই পরিকল্পনার আওতার বাইরে ছিল তাদেরকেও ১৯৪১ সালের পর থেকে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ায় ফলে সমাজসেবার কাজটি সঠিক রূপ নিয়েছে। এই সমাজসেবার সম্পূর্ণ আর্থিক দায়িত্ব রাষ্ট্র বহন করে থাকে, যদিও সাহায্যদানের ব্যাপারটি প্রত্যেক শিল্পসংস্থায় ট্রেড ইউনিয়নগুলির হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ শ্রমিকদের প্রতিনিধিসংস্থা হিসাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলিই শ্রমিকদের প্রকৃত অভাব অভিযোগ নির্ধারণ করতে পারে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সরকারী কর্মচারীদের হাতে সমাজসেবার নিয়ন্ত্রণ থাকে বলে সমাজসেবার ব্যবস্থাগুলি শ্রমিকদের ন্যায্য দাবীপূরণের বদলে নিতান্ত সাহায্যদানের পর্যায়ে পড়ে।

সমাজসেবা
Social services

---

৫ আধুনিক কালে মহাশূন্য পর্যটনেও সোভিয়েট বীরাঙ্গনারা (ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা) পুরুষদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

(Soviet Federation)

সোভিয়েট দেশে যুক্তরাষ্ট্রগঠনের তত্ত্বগত ভিত্তি (Theoretical basis of the Soviet Federation) :

সোভিয়েট সংবিধানের ১৩ সংখ্যক ধারা অনুসরণ করলে দেখা যাবে সেখানে ১৫টি সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের স্বেচ্ছাসম্মেলনের মাধ্যমে এক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হয়েছে।[1] পূর্বেই বলা হয়েছে সোভিয়েট রাষ্ট্রব্যবস্থা মার্কসীয় রাষ্ট্রদর্শনের নির্দেশে সংগঠিত। অথচ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনকাঠামো সম্পর্কে সাধারণভাবে মার্কস এবং এঙ্গেল্‌স যে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন তার উদাহরণের অভাব নেই। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সময় জার্মানীতে সুইস ধরনের যুক্তরাষ্ট্রের বদলে একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র স্থাপনের স্বপক্ষে তাঁরা অসংখ্য যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। এর পরেও শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যের স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর আদর্শগত বিরোধিতা করে এঙ্গেল্‌স তাঁর "The Role of force in History"-তে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পুরোপুরি অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করে মার্কস ও এঙ্গেলস কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রকর্তৃত্বকেই দ্রুত শিল্পায়ন ও শ্রমিকসংহতির অনুকূল বলে মনে করেছেন। এরই পাশাপাশি আবার জাতিগত স্বাধীনতার প্রশ্নে যেমন গ্রেটব্রিটেনে আয়ার্ল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে মার্কস যুক্তরাষ্ট্রকে নীতিগতভাবে স্বীকৃতি দিতে ইতস্ততঃ করেননি। কারণ কোন জাতিই অপর একটি জাতির অধীনে স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশ লাভের সুযোগ পায় না। তবে সাধারণভাবে মেহনতী মানুষের স্বার্থ এবং সর্বহারার বিপ্লবের সমর্থনে মার্কস ও এঙ্গেল্‌স গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণে (democratic centralism) বিশ্বাস করবেন।

যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে মার্ক্সীয় মতবাদ
Marx on Federalism

---

[1] "The Union of Soviet Socialist Republic is a federal state, formed on the basis of a voluntary union of equal Soviet socialist Republics"…Art. 13 of the Constn. of USSR. যে ১৫টি অঙ্গরাজ্য নিয়ে এই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত তাদের নাম—রাশিয়া, যুক্রেন, বেইলোরাশিয়া, উজবেকিস্তান, কাজাকস্তান, জর্জিয়া, আজারবাইজান, লিথুয়ানিয়া, মোল্ডাভিয়া লাতভিয়া, কিরঘিজ, তাজাকিস্তান, আর্মেনিয়া, তুর্কমেনিস্তান, ও এস্তোনিয়া।

তত্ত্বগত দিক থেকে লেনিনই সর্বপ্রথম যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে সমভোগ-বাদের আপাতবিরোধ নিরসনের চেষ্টা করেন। অক্টোবর বিপ্লবের আগে পর্যন্ত রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রশ্নটিকে বিপ্লবের পটভূমিকায় সর্বহারা জনতার ঐক্যের বৃহত্তর প্রশ্নের কাছে গৌণ বলে মনে করত। কিন্তু বিপ্লবের পর যখন বহু জাতি অধ্যুষিত রাশিয়ায় জাতিগত সমস্যা সমাধান করা একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ল তখন পার্টি যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে নূতন ভাবে চিন্তা করতে শুরু করল। দ্বিতীয় পার্টিকংগ্রেসে লেনিনের নেতৃত্বে তাই জাতিসমূহের সমমর্যাদা এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হল। লেনিন এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে জাতিসমস্যাটিকে বিচার করতে চেয়েছিলেন। সাংবিধানিকভাবে এই মতবাদ প্রথম কার্যকরী হল যুক্রেনকে পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্যদানের মধ্য দিয়ে। এরপর নিখিল রুশিয়া সোভিয়েট কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে এক ঘোষণায় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্তটিকে আইনসম্মত রূপ দেওয়া হল।[2]

অক্টোবর বিপ্লবের পর দলীয় সিদ্ধান্তের পরিবর্তন
Change in the Party Line after the October Revolution

মোটামুটি ভাবে, তিনটি কারণে পার্টি এই নূতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রথমতঃ, অক্টোবর বিপ্লব চলাকালীন রাশিয়ার বিভিন্ন জাতিগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এর ফলে জার আমলের আপাত ঐক্য ভেঙ্গে গিয়ে অঞ্চলগুলি রাশিয়ার মূলভূখণ্ড থেকে সরে আসতে চাইল। এর সঙ্গে প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহ বৈপ্লবিক রাশিয়ার ঐক্য প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করার জন্য উঠে পড়ে লাগল। এখন নতুন করে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র গঠন করার সম্ভাবনাও রইলনা অথচ সমাজতন্ত্রী সরকারের স্থায়িত্বের জন্য অন্তর্দেশীয় ঐক্যস্থাপন একান্ত প্রয়োজন হয়ে উঠল। সেইজন্য জোর করে ঐক্য চাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা না করে স্বেচ্ছায় সম্মিলিত হবার জন্য অঙ্গরাজ্যগুলির সঙ্গে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। দ্বিতীয়তঃ, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে হলে সমগ্র দেশের মধ্যে সংযোগ ও সংহতি অপরিহার্য। এইজন্য ইউনিয়ন রিপাব্লিকগুলির সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার এর পর ধীরে ধীরে দ্বিপাক্ষিক

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কারণ
Reasons for instituting a Federation

---

2 "The historic Declaration of Rights of the Toiling and Exploited people was the First *legislative* act in which the Communist Party firmly and definitely embraced federation.' – D. Zlatopolsky : State System of the USSR, P. 23

(bilateral) অর্থনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতার চুক্তি স্থাপন করতে উদ্যোগী হল। এই চুক্তিগুলিও কার্যকরী করতে গিয়ে একটি সাধারণ প্রশাসন ব্যবস্থা গঠন করা ছাড়া উপায় ছিল না। এইভাবে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ঐক্যসৃষ্টির পথ সুগম হল। তৃতীয়তঃ মার্কসীয় মতাদর্শ অনুযায়ী জাতিসমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের পূর্ণ মর্যাদা দেওয়ার জন্যও যুক্তরাষ্ট্র গঠন একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠল। এই অধিকার নানা ভাবে সংরক্ষিত হতে পারে: মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রগঠন (secession) বা যুক্তরাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যের সুযোগ regional autonomy in a federation)। বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে যখন ঘরে বাইরে শত্রুর ছড়াছড়ি এবং দেশের ঐক্য বিপন্ন তখন কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষে রাষ্ট্রসমূহের বিচ্ছিন্ন হবার অধিকারটি স্বীকার করা সম্ভব ছিল না; কেননা তাহলে সমগ্র বিপ্লবই ভেঙ্গে পড়ত। সেজন্য যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দ্বারা অঙ্গরাজ্য-গুলির আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়াই শ্রেয় বলে মনে করা হয়েছিল। এই সমস্ত ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই রাশিয়ার যুক্তরাষ্ট্রে পরিণতি সম্ভব হয়েছে।

কতকগুলি মূলনীতির ওপর এই যুক্তরাষ্ট্র দাঁড়িয়ে আছে। সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নলিখিতভাবে বিবৃত করা চলে:

রুশ যুক্তরাষ্ট্রের মূল নীতিসমূহ
Main principles of the Soviet Federation

(১) কম্যুনিষ্ট দলের নেতৃত্ব এবং সোভিয়েট সংস্থার মাধ্যমে মেহনতী শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব। বহু জাতি অধ্যুষিত এই রাজ্য সম্মেলনে সমাজতন্ত্রই মূল ঐক্যবন্ধন এবং সমাজতন্ত্র সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র ছাড়া সম্ভব নয়। তবে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র একটি গতিময় প্রতিষ্ঠান; সুতরাং এর ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এর অন্তর্নিহিত মূলনীতি-গুলিও সামঞ্জস্য রেখে পরিবর্তিত হয়। তাই শোষণমূলক ধনতন্ত্রের শেষচিহ্নের অবসান এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর যখন রাষ্ট্রশক্তি শুধু মেহনতী জনতা নয় সারা দেশের সমস্ত জনসাধারণকে নিয়ে গঠিত হবে ও তাদের ইচ্ছাকে রূপ দেবে তখন আর এই একনায়কতন্ত্রের নীতিটির কোন প্রয়োজন থাকবে না।

(২) এই যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যগুলির অঞ্চলবিভাগ জাতিগত সীমানার অনুসরণেই স্থিরীকৃত। ইউনিয়ন রিপাব্লিকগুলির জনসংখ্যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে প্রত্যেক রিপাব্লিকেই এক একটি বিশেষ জাতি ৭৫% এর অধিক সংখ্যায় বাস করছে। দেশে বহু সংখ্যক জাতি ও উপজাতি থাকায় ১৫টি ইউনিয়ন রিপাব্লিক ছাড়াও ২০টি 'অটোনমাস রিপাব্লিক', ৮টি 'অটোনমাস

রিজিয়ন' এবং ১০টি 'ন্যাশনাল এরিয়া' গঠন করা হয়েছে। জাতিগত ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক গঠন হওয়ায় জাতিসমূহের ভাষা ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত প্রশ্নের সমাধান সহজ হয়েছে।

(৩) অঙ্গরাজ্যগুলির স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্রগঠনও রুশ যুক্তরাষ্ট্রের একটি উল্লেখযোগ্য নীতি। বলপ্রয়োগের বদলে নিজের ইচ্ছায় চুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানই কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ অধিকতর কাম্য মনে করেছেন।[৪] রাজ্য সম্মেলনে যোগদানের ফলে সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যের স্বাধীনতার ওপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ অবশ্যম্ভাবী হলেও ঐক্যের স্বার্থে জনগণ ঐ নিয়ন্ত্রণ মেনে নিয়েছে বলেই যুক্তরাষ্ট্র গঠন সম্ভব হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের এই স্বেচ্ছামূলক ভিত্তি ১৩ সংখ্যক ধারায় সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে, এ ছাড়া একক সিদ্ধান্তে প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের অধিকার (১৭ ধারা) এই স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

(৪) অঙ্গরাজ্যগুলি সকলেই সমমর্যাদাসম্পন্ন। সংবিধানের ১৩ ধারায় স্পষ্টভাবে এই সমতার উল্লেখ ছাড়াও অন্যান্য নানা উপায়ে এই সমতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন, আভ্যন্তরীণ বিষয়ে প্রত্যেক রাজ্যের সার্বভৌমিকতা, নিজস্ব সংবিধান রচনা ও সংশোধনের ক্ষমতা, যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের ক্ষমতা. সম্মতি ছাড়া আঞ্চলিক সীমানা পরিবর্তনে বাধা, অধিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিকত্ব ছাড়াও রাজ্য-নাগরিকতা, সোভিয়েট অব ন্যাশনালিটিজে জনসংখ্যানির্বিশেষে সমানসংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার, সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রেসিডিয়ামে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এবং কেন্দ্রীয় সুপ্রীম কোর্টে একজন করে প্রতিনিধি প্রেরণ এবং প্রেসিডিয়ামের দ্বারা সুপ্রীম সোভিয়েটের অতিরিক্ত অধিবেশন বা দেশব্যাপী গণভোটের দাবী জানানোর অধিকার ইত্যাদি।

(৫) সর্বশেষে গণতন্ত্রসম্মত কেন্দ্রীকরণ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্যতম নীতি। এর অর্থ হল, সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্নস্তর পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও প্রশাসনের সমস্ত সংস্থাই নির্বাচনের দ্বারা গঠিত, দায়িত্বশীল এবং গণদাবীক্রমে অপ্রসারিতব্য ; রাষ্ট্রশাসনে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ ; এবং আঞ্চলিক সমস্যা অঞ্চলসমূহের প্রতিনিধিসভাতেই সমাধানযোগ্য। এই গণতান্ত্রিক

---

৪ "The Republic of the Russian people must attract other nations or national groups to itself not by force but exclusively through voluntary agreement to set up a Common State" – Lenin.

ব্যবহার পাশাপাশি আবার একটিমাত্র কেন্দ্র থেকে প্রশাসন পরিচালনার ব্যবস্থা, উচ্চতর রাষ্ট্রযন্ত্রগুলির নিম্নতন সংস্থাসমূহের ওপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ, সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে সংখ্যালঘিষ্ঠের অধীনতা এবং কঠোর নিয়মানুবর্তিতা রয়েছে। মূলতঃ দ্রুত অর্থনৈতিক প্রগতি এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় একযোগে সম্মিলিত শক্তিপ্রয়োগের উদ্দেশ্যেই শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক রীতির সঙ্গে কেন্দ্রীকরণের এই বিচিত্র সংযোগ ঘটানো হয়েছে।

রাশিয়ার যুক্তরাষ্ট্রের বৈচিত্র্যসমূহ (Peculiarities of Soviet Federation)

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসংগঠনের তত্ত্বসমূহের যৌক্তিকতা অস্বীকার করলেও, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা সোভিয়েট সংবিধানবিদরা মেনে নিয়েছেন। ১৯৩৬ সালের ষ্ট্যালিন সংবিধানের ব্যবস্থা অনুযায়ী পশ্চিমী যুক্তরাষ্ট্রগুলির সঙ্গে রাশিয়ার যুক্তরাষ্ট্রের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়।

সংবিধানের ১৩ সংখ্যক ধারায় বলা হয়েছে যে সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ১৫টি অঙ্গরাজ্যের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সম্মেলনের দ্বারা গঠিত একটি যুক্তরাষ্ট্র। বহু জাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলির মধ্যে আবার জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের সুযোগ প্রদানের জন্য কতকগুলি Autonomous Republic (সংখ্যায় মোট ১৬টি), Autonomous Region (মোট ৯টি) এবং National Areas সৃষ্টি করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও অঙ্গরাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রে। সংবিধানের ১৪ সংখ্যক ধারায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষমতাগুলির একটি বিশদ তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষমতাগুলি ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত বিষয়ে অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে (১৫ ধারা)। তদুপরি, প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজ নিজ এলাকার জন্য সংবিধান রচনা ও সংশোধন করতে পারে (১৬ ধারা)। প্রয়োজনবোধে একক সিদ্ধান্তে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করতে পারে (১৭ ধারা) এবং বৈদেশিক শক্তিসমূহের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে (১৮-ক ধারা)। এছাড়া সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সম্মতি ছাড়া ভৌগোলিক সীমার কোন পরিবর্তন করা চলে না (১৮ ধারা)। যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি অনুসরণ করে সংবিধানকেও লিখিত এবং দুষ্পরিবর্তনীয় রাখা হয়েছে। সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রত্যেক কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়া এর সংশোধন করা চলে না। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মত এখানেও কেন্দ্রীয় আইন

সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানসমূহ
Federal Provisions of the Cons n.

সভাকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট করে সভার উচ্চতর কক্ষে (Soviet of Nationalities) জাতিসমূহের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রত্যেক ইউনিয়ন রিপাব্লিক ২৫ জন করে, প্রত্যেক অটোনমাস রিপাব্লিক ১১ জন করে, প্রত্যেক অটোনমাস রিজিয়ন ৫ জন করে এবং ন্যাশনাল এরিয়াগুলি প্রত্যেকে একজন করে সোভিয়েট অফ ন্যাশনালিটিজে প্রতিনিধি পাঠিয়ে থাকে।

উপরোক্ত বিধানগুলি থেকে স্বভাবতঃই সোভিয়েট রাশিয়াকে একটি যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করায় কোন আপত্তি থাকতে পারে না। এছাড়াও সংবিধানে এমন কতকগুলি ব্যবস্থা রয়েছে যেগুলিকে অতিযুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। যেমন, পৃথিবীর অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলির যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের অধিকার না থাকলেও সোভিয়েট রাশিয়াতে তার ব্যবস্থা রয়েছে; কারণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানই সেখানে অধিকতর কাম্য বলে মনে করা হয়েছে। এছাড়া ১৮-খ ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য নিজস্ব সমর-বাহিনী রাখতে পারে এবং ১৮-ক ধারা অনুযায়ী বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, চুক্তি সম্পাদন ও রাষ্ট্রদূত বিনিময় করতে পারে। শেষোক্ত অধিকারটি ১৯৪৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী সুপ্রীম সোভিয়েটে গৃহীত এক বিশেষ বিধানে স্বীকৃত হয়। ফলে ইউক্রেন ও বেইলোরাশিয়া প্যারিস শান্তি সম্মেলনে যোগ দেয় এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরণ করে।

অতি যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য
Ultra-federal features

সাংবিধানিক তত্ত্বের দিক থেকে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের এই সব বৈশিষ্ট্য যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির সন্দেহাতীত প্রতিফলন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন কোন লেখক যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রবণতার বদলে এককেন্দ্রিক কর্তৃত্বের পরিচয় পেয়েছেন। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার যে সমস্ত সমালোচনা তাঁরা করে থাকেন সংক্ষেপে সেগুলি হল :—

আপাত দৃষ্টিতে কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা
Apparent tendency towards Centralisation

(১) কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তারপর আর অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য বলে কিছু থাকে না; (২) কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ও সৈন্যবাহিনী গঠনের মধ্যে নূতনত্ব কিছু নাই; (৩) সুপ্রীম সোভিয়েট ইচ্ছা করলে আইনপ্রণয়ন করে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে নূতন ক্ষমতা দিতে পারে; (৪) রাজ্য ও কেন্দ্রীয় আইনের বিরোধের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইন বলবৎ থাকে; (৫) সংবিধানের ব্যাখ্যা ও ক্ষমতাবণ্টন

সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসার ভার একটি নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থার বদলের কেন্দ্রীয় সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রেসিডিয়মের উপর ন্যস্ত; এবং (৬) অঙ্গরাজ্যগুলির অনুমোদন ছাড়াই সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রের উদ্যোগে সংবিধান সংশোধন।

কোন দেশের সংবিধানের সমালোচনা করতে গিয়ে সাধারণতঃ যে সব ভুল করা হয়ে থাকে এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। প্রথমতঃ, সংবিধানের উদ্দেশ্যের বদলে আক্ষরিক অর্থকে বড় করে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, সংবিধানের অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে পারম্পরিকতা বজায় রেখে সংশ্লিষ্ট বিধানগুলির ব্যাখ্যা করা হয়নি। তৃতীয়তঃ, কোন একটি দেশের (এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) প্রচলিত ব্যবস্থাকে আদর্শ বলে ধরে নিয়ে অপর দেশের অবস্থাগত তারতম্যজনিত সাংবিধানিক পার্থক্যকে অযৌক্তিকভাবে ত্রুটি বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। যুক্তি-বিচারে উপরোক্ত সমালোচনাগুলি যে দাঁড়ায় না তা সহজেই প্রমাণ করা যেতে পারে। যেমন, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরাট ক্ষমতার উত্তরে বলা যায় যে, সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সুদূরপ্রসারী—এই তত্ত্বের স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত হিসাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রভূত ক্ষমতা। কিন্তু তার জন্যে অঙ্গ-রাজ্যগুলির ক্ষেত্রাধিকার সঙ্কুচিত হয়েছে বলা যায় না। কারণ সব ক্ষমতা লিখিতভাবে তালিকাভুক্ত করা সম্ভব হয় না। সুতরাং রাজ্যগুলির অলিখিত ক্ষমতার বিস্তার কতখানি সে সম্পর্কে কোন স্থিরসিদ্ধান্ত করে নেওয়া ঠিক নয়। এছাড়া কেন্দ্রের লিখিত ক্ষমতার ক্ষেত্রেও অঙ্গরাজ্যগুলি অংশগ্রহণ করতে পারে। যেমন শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, শ্রম প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে কেন্দ্র মৌলিক নীতিসমূহ নির্ধারণ করে মাত্র; এইগুলি কার্যকরী করার ভার অঙ্গরাজ্যগুলির সরকারের।

ভ্রান্তিপূর্ণ সমালোচনার উত্তর
Reply to the faulty Criticism

দ্বিতীয়তঃ, কোন অঙ্গরাজ্য বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করুক এমন ধারণা নিয়ে কোন যুক্তরাষ্ট্র এমনকি রাষ্ট্রসম্মেলনও (Confederation) গঠিত হতে পারে না। সুতরাং কূটনৈতিক সম্পর্ক ও সেনাবাহিনী গঠনের ব্যাপারে অঙ্গরাজ্যগুলির যেটুকু ক্ষমতা আছে তার অভিনবত্ব স্বীকার করায় কোন বাধা নেই, বিশেষতঃ যখন অন্য কোন যুক্ত-রাষ্ট্রেই এতটা ঝুঁকি নেওয়া হয়নি। তদুপরি এর পাশাপাশি যে কোন সময় যুক্তরাষ্ট্র-ত্যাগের অধিকারটি দাঁড় করালে সমস্ত চিত্রটি অন্য আকার ধারণ করে।

তৃতীয়তঃ, সহযোগিতা ও অধিকতর দক্ষতার প্রয়োজনে এবং বিশেষ বিশেষ

সঙ্কট মুহূর্তে অপ্রত্যাশিত প্রয়োজনে অনেক সময় কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব বর্ধিত করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। সেই উদ্দেশ্যেই সুপ্রীম সোভিয়েটকে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে নূতন ক্ষমতা দেওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষের সংবিধানেও ২৪৯ এবং ২৫০ ধারায় সংসদকে অনুরূপ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থতঃ, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় আইনের বিরোধের ক্ষেত্রে শেষোক্ত আইন সর্বত্রই বলবৎ থাকে। তবে এ সম্পর্কে বিচারবিভাগীয় মীমাংসার সুযোগ অন্যান্য দেশে থাকলেও সোভিয়েট রাশিয়ার প্রেসিডিয়মকেই এ বিষয়ে একমাত্র ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বিচারবিভাগ সম্বন্ধে সোভিয়েট সংবিধান-বিশেষজ্ঞদের মতামতই এই অভিনবত্বের কারণ। পাশ্চাত্য দেশে বিচারবিভাগকে রাষ্ট্র ও রাজনীতি নিরপেক্ষ মনে করা হলেও সোভিয়েট তাত্ত্বিকগণ বলেন যে বিচার-বিভাগের নিরপেক্ষতা একটি ভ্রান্ত ধারণা, কারণ বিচারবিভাগ রাষ্ট্রেরই আইন প্রয়োগ করে রাষ্ট্রেরই স্বার্থ তথা রাষ্ট্রের প্রভাবশালী শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখে। সমাজতন্ত্রের দেশ সোভিয়েট রাশিয়ায় বিচারবিভাগ সমাজতন্ত্রী আইনকেই সংরক্ষণ দিয়ে থাকে। কাজেই রাজ্য ও কেন্দ্রের এক্তিয়ারগত বিরোধসমূহ উভয় পক্ষের প্রতিনিধি আছেন এমন সংস্থাতেই বিচার হওয়া ভাল। সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রেসিডিয়মে অঙ্গরাজ্যের প্রেসিডিয়মসমূহের সভাপতিবৃন্দও আসন লাভ করে থাকেন (৪৮ সংখ্যক ধারা)।

পঞ্চমতঃ, সংবিধান সংশোধনের প্রশ্নেও একইভাবে বলা যায় যে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার উর্ধ্বতন কক্ষ সোভিয়েট অব ন্যাশনালিটিজ জাতীয় প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত। প্রত্যেক ইউনিয়ন রিপাব্লিক; অটোনমাস্ রিপাব্লিক ও রিজিয়ন, এমনকি ন্যাশনাল রিজিয়ন থেকেও এই কক্ষে প্রতিনিধি পাঠানো হয়। আর যেহেতু এই কক্ষেরও দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অনুমোদন ছাড়া কোন সংশোধনপ্রস্তাব গৃহীত হতে পারে না, সেই হেতু অঙ্গরাজ্যগুলির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার কোন প্রশ্নও ওঠে না। এছাড়া কোন অঙ্গরাজ্য দাবী জানালে গণভোটের ব্যবস্থা তো আছেই।

প্রসঙ্গতঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক হুয়্যার যে বক্তব্য রেখেছেন তার আলোচনা করা যেতে পারে। যে সব আপাতঃ ত্রুটির কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি ছাড়াও অধ্যাপক হুয়্যার দুটি মূল প্রশ্নে সোভিয়েট দেশকে পুরোপুরি যুক্তরাষ্ট্র বলে মেনে নিতে রাজী নন। এক হল অতি-যুক্তরাষ্ট্রীয় যে সমস্ত ক্ষমতা অঙ্গরাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়েছে (যেমন, স্বতন্ত্র-ভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, সৈন্যবাহিনী গঠন ইত্যাদি), সেগুলির ওপর

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকায় যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির বদলে এক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের নীতিরই প্রয়োগ হয়েছে।[4] অর্থাৎ সমান মর্যাদা নিয়ে এই সমস্ত ক্ষমতার অংশ না নিয়ে কেন্দ্রের অনুমোদন সাপেক্ষেই অঙ্গরাজ্যগুলি এই ক্ষমতাগুলি কাজে লাগাতে পারে। এর উত্তরে আমরা বলতে পারি যে, যেসব দেশকে হুয়্যার প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, সে সব দেশে যখন এই ধরনের কোন ক্ষমতা—তা সে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি অনুসারেই হোক বা বিকেন্দ্রীকরণের নীতি অনুসারেই হোক—অঙ্গরাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়নি, তখন সোভিয়েট সংবিধানের এই ব্যবস্থাটিকে সোজাসুজি যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি-বিরোধী বলে মনে না করে একটি অতিরিক্ত ও অভিনব বৈশিষ্ট্য বলে গ্রহণ করতে আপত্তি কি? বিশেষতঃ ভারতবর্ষের সংবিধান রচনা হওয়ার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবণ্টনের ক্ষেত্রে একটি নূতন ধারণার উদ্ভব হয়েছে, সেটি হল 'যুগ্ম কর্তৃত্বের এক্তিয়ার'। একেবারে কেন্দ্র ও রাজ্যবিষয় এইভাবে নিশ্ছিদ্র দেওয়াল না তুলে যদি উভয়ের একটি সহযোগিতার ক্ষেত্র স্বীকার করে নেওয়া হয়, তাহলে প্রশাসনিক সুবিধা ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রীয় পারস্পরিকতার সম্পর্কটি (Co-ordinate relation) কি অধিকতর স্পষ্টতা লাভ করে না?

অধ্যাপক হুয়্যারের বক্তব্য
Opinion of Prof. Wheare

অধ্যাপক হুয়্যারের দ্বিতীয় আপত্তিটি অপেক্ষাকৃত জোরালো এবং যৌক্তিকতাপূর্ণ। সোভিয়েট সংবিধানের ১৯ সংখ্যক ধারাটির উল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় বাজেট ছাড়াও রাজ্যসরকারের বাজেট-সমূহও কেন্দ্রীয়সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ। কাজেই আর্থিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রের সঙ্গে অঙ্গরাজ্যগুলির সহযোগিতার বদলের অধীনতার সম্পর্কটিই পরিস্ফুট। সংবিধানের এই ব্যবস্থাটি সোভিয়েট সংবিধানকে চূড়ান্তভাবে 'প্রায় যুক্তরাষ্ট্রের' পর্যায়ে ফেলে দিয়েছে বলে হুয়্যার মনে করেন।[5] সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মূল নীতিগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেই দেখেছি যে গণতান্ত্রিকতার

---

4 "There is no doubt of the reality of the grant of power to the regions···but it is a grant upon the principle of decentralisation, of delegation from the centre and not upon the federal principle"—K.C. Wheare : "Federal Government." Page 27.

5 "...in allocating the constitution to the class of quasi-federal···Article 19 contains what appears to me a decisive provision. It declares that the powers of the All Union authorities include the 'confirmation of the unified state budget of the U. S. S. R as well as of the taxes and revenues which go to form the All-Union, the republic and the local budgets'. Ie is an assertion in law that, in respect of finance, the regional governments are sub-ordinate to the general government, not co-ordinate with it"—ibid, P. 27.

সঙ্গে কেন্দ্রীকরণের এক বিচিত্র সংমিশ্রণ এদেশের শাসনব্যবস্থার ভিত্তিমূল। পরিকল্পিত অর্থনীতির সাফল্য এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাভাবিকভাবেই একটি এককেন্দ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তদুপরি শ্রেণীবিহীন সমাজগঠনের দুষ্কর আদর্শ রূপায়ণের জন্যও একটি সর্বব্যাপী কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক এবং সর্বহারা শ্রেণীর পরিচালক হিসেবে দেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল কম্যুনিষ্ট পার্টির ওপর এই দায়িত্ব বর্তেছে। সেদিক থেকে বিচার করলে সোভিয়েট রাশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রীয় এককগুলির স্বাতন্ত্র্যের নীতি যে প্রযুক্ত হয়নি সেকথা স্বীকার করতেই হয়। তবে, একমাত্র এই কারণেই যদি সোভিয়েট রাশিয়াকে যুক্তরাষ্ট্র বলতে বাধা থাকে, তাহলে মনে করতে হবে যে পশ্চিমী যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাতেই প্রযোজ্য, সমাজতন্ত্রের সঙ্গে এর মূলগত বিরোধ আছে। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন, অঙ্গরাজ্যগুলির সাংস্কৃতিক সামাজিক ও ভাষাগত অবাধ স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের যে সামঞ্জস্য করা চলে সোভিয়েট রাশিয়া তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সোভিয়েট রাষ্ট্রশক্তির উচ্চতর সংস্থাসমূহ

(The Higher Organs of state-power in the U. S. S. R.)

সোভিয়েট রাশিয়ায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে সাধারণভাবে ব্যবস্থাপক, প্রশাসনিক ও বিচারবিভাগীয় এই তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করা হলেও এই তিনটি সংস্থাকে সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা হয় না। দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রশক্তি সুপ্রীম সোভিয়েট বা কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি পরিষদে ন্যস্ত করা হয়েছে। অন্য সমস্ত সংস্থাকে—প্রেসিডিয়ম, মন্ত্রিসভা ইত্যাদি—সুপ্রীম সোভিয়েটের কাছে নিজ নিজ কার্যের জন্য জবাবদিহি করতে হয়। এমনকি বিচারবিভাগকেও সুপ্রীম সোভিয়েটের আইনের ওপর কোন সমীক্ষামূলক মন্তব্য করার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। বিচারবিভাগ শুধু সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক আইনগুলির প্রয়োগ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে মাত্র। এদিক থেকে ইংল্যাণ্ডের সংসদীয় সার্বভৌমত্বের ধারণার সঙ্গে খানিকটা আপাত সাদৃশ্য চোখে পড়তে পারে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে সংসদের সঙ্গে মন্ত্রিসভার শুধু দায়িত্বমূলক ঘনিষ্ঠ যোগই নেই, সংসদের ওপর কর্তৃত্ব করারও নানা অধিকার রয়েছে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রসংস্থাগুলির মূলপ্রকৃতি
Fundamental Nature of the Soviet Organs of State-power.

বাস্তবিক পক্ষে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে সংসদের প্রতি দায়িত্ব বা ক্ষমতাস্বতন্ত্রী-করণের কথা যতই বলা হোক না কেন আসলে সর্বত্রই কার্যপালিকাবিভাগের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইংল্যাণ্ডে তাই ক্যাবিনেট স্বৈরাচারের অভিযোগ উঠেছে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা তো দিন দিন ক্রমবর্ধমান। তাই আপাতদৃষ্টিতে পশ্চিমী দেশগুলির রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সঙ্গে কিছু কিছু গঠনগত সাদৃশ্য দেখা গেলেও মনে রাখা দরকার যে সোভিয়েট রাষ্ট্র-সংস্থাগুলি সম্পূর্ণ পৃথক নীতি ও উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছে এবং সর্বত্রই সমাজ-তান্ত্রিক গণতন্ত্রের স্বার্থের দিকে নজর রেখেই সংস্থাগুলির প্রকৃতি ও কার্যকলাপ স্থির করা হয়েছে। সুতরাং কোন কোন ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য দেশের প্রচলিত সাংবিধানিক ধারার ব্যতিক্রম হলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

সোভিয়েট দেশের সুপ্রীম সোভিয়েট (The Supreme Soviet of the U. S. S R.):

যতদিন না অর্থনৈতিক বৈষম্যজনিত শ্রেণী শোষণের অবসান ঘটানো যাচ্ছে ততদিন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্থা থাকা বা না-থাকা দুই-ই সমান। সোভিয়েট রাশিয়ায় তাই বিপ্লবের পরবর্তী ১৯১৮ বা ১৯২৪ সালের সংবিধানে সংসদীয় শাসনব্যবস্থার প্রচলিত সংস্থাগুলি গড়ে তোলার চেষ্টা দেখা যায় নি। মেহনতী মানুষের কর্তৃত্ব কায়েম হওয়ার পর সমাজতন্ত্র গঠন ও সংরক্ষণের সম্ভাবনা যখন বাস্তবায়িত হতে চল্‌ল, তখন ১৯৩৬ সালের ষ্ট্যালিন সংবিধানে আনুষ্ঠানিকভাবে ঐসব সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি শুরু হল। সুপ্রীম সোভিয়েট এরই একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ। পূর্ব ইতিহাস অনুসরণ করে টাউষ্টার একে প্রাক্তন নিখিল রুশ সোভিয়েট কংগ্রেস এবং কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের মিলনজাত প্রতিষ্ঠান বলে বর্ণনা করেছেন।[1]

সোভিয়েট সংবিধানের ৩০ সংখ্যক ধারায় সুপ্রীম সোভিয়েটকে দেশের রাষ্ট্রশক্তির সর্বোচ্চ সংস্থা (highest organ of statepower') বলা হয়েছে। সুপ্রীম সোভিয়েট একটি দ্বিকক্ষযুক্ত ব্যবস্থাপকসভা। নিম্নতন কক্ষটির নাম 'সোভিয়েট অফ ইউনিয়ন' এবং উচ্চতর কক্ষের নাম 'সোভিয়েট অফ ন্যাশনালিটিজ'।

---

1 "It constitutes a structural cross between the former all Russian Congress of Soviets and Central Executive Committee"—Julian Towster : "Political Power in the U. S. S. R", P. 262

সোভিয়েট অফ ইউনিয়ন সোভিয়েট জনগণের সাধারণ স্বার্থের প্রতিফলনস্থল।

সংগঠন
Composition

সার্বিক সমাধিকার প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত ডেপুটি বা প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এই কক্ষ গঠিত। অপরাধী এবং উন্মাদ ছাড়া ১৮ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত সকল লোকেই এই নির্বাচনে ভোট দিতে পারে এবং ২৩ বৎসর বয়ঃক্রম হলেই সোভিয়েট অফ ইউনিয়নের সদস্যপদের যোগ্যতা অর্জন করা যায়। প্রতি ৩০০,০০০ অধিবাসীর জন্য এক একজন প্রতিনিধি রয়েছেন (৩৪ ধারা)। উচ্চতর কক্ষ সোভিয়েট অফ ন্যাশনালিটিজে দেশের বিভিন্ন জাতির বিশেষ স্বার্থ প্রতিফলিত হয়। প্রত্যেক 'ইউনিয়ন রিপাব্লিক' থেকে ২৫ জন, 'অটোনমাস রিপাব্লিক' থেকে ১১ জন, 'অটোনমাস রিজিয়ন' থেকে ৫ জন এবং 'ন্যাশনাল এরিয়া' থেকে ১ জন করে প্রতিনিধি এই কক্ষে নির্বাচিত হন (৩৫ ধারা)। কক্ষদ্বয়ের সদস্যগণ প্রায় সকলেই কমুনিষ্ট পার্টির সভ্য। সরকারী কর্মচারী বা সামরিক অফিসারদের প্রতিনিধি হওয়ার অধিকার, বয়সের দিক থেকে ডেপুটিদের অপেক্ষাকৃত তারুণ্য, প্রভূত সংখ্যায় মহিলা প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং বিশেষ করে শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যাধিক্য সুপ্রীম সোভিয়েটের অন্যতম বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া প্রতিকক্ষেই একজন সভাপতি ও চারজন সহসভাপতি সভার পরিচালনার জন্য নির্বাচিত হন।

সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রতিনিধিদের সংবিধানে কতকগুলি বিশেষাধিকার দেওয়া হয়েছে। সুপ্রীম সোভিয়েটের (বা অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন প্রেসিডিয়মের) অনুমতি ব্যতিরেকে কোন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা চলে না। এ

সদস্যদের বিশেষাধিকার ও কর্তব্য
Privileges & Duties of the Deputies

ছাড়া, সমালোচনা, আইনের প্রস্তাব, বক্তৃতা, ইত্যাদি সাধারণ অধিকার তো আছেই। তবে অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিধিদের কতকগুলি দায়িত্বও রয়েছে। প্রত্যেক প্রতিনিধি নিজস্ব অঞ্চলের জনসাধারণের আজ্ঞাবাহী সেবক এবং যে কোন মুহূর্তে তাদের দাবীতে পদচ্যুত হতে পারেন। পশ্চিমী সংসদসদস্যদের মত তিনি সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে চমকপ্রদ বক্তৃতা করেই ক্ষান্ত হন না। বরং প্রত্যেক সোভিয়েট সদস্যই যেহেতু রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে পারদর্শী কর্মী, সেইহেতু তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা ও সুদক্ষ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থা-প্রণয়নে সক্রিয় সহযোগিতা করে থাকেন। একই সঙ্গে নির্বাচক মণ্ডলীকে

আইনসভায় অনুষ্ঠিত কার্যবিধি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখার জন্য প্রাসঙ্গিক বিবৃতি দেওয়াও তাঁদের কর্তব্য।

বৎসরে দু'বার প্রেসিডিয়মের আহ্বানে সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন বসে। এ ছাড়া প্রেসিডিয়মের নিজস্ব সিদ্ধান্তে বা কোন ইউনিয়ন রিপাব্লিকের দাবীতে বিশেষ অধিবেশনও আহূত হতে পারে। সাধারণতঃ একসপ্তাহের মত অল্প সময়ের জন্য এক একটি অধিবেশন চলে থাকে। একই সঙ্গে উভয় কক্ষের অধিবেশন শুরু ও শেষ হয় (৪১ ধারা)। অধিবেশনে সভাপতিত্ব ও অধিবেশন পরিচালনার ভার প্রত্যেক সভার নির্বাচিত সভাপতির ওপর অর্পিত। যুক্ত অধিবেশনের সময় সভাপতিদ্বয়ের মধ্যে এক এক বার একজন করে (alternately) সভাপতিত্ব করেন।

সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন
Sessions of the Supreme Soviet

সাংবিধানিক অধিকার ও ক্ষমতার দিক থেকে সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় কক্ষেরই সমান মর্যাদা। আইনের প্রস্তাব উত্থাপন বা অনুমোদন সবক্ষেত্রেই উভয়ের সমান অধিকার। কার্যকালের দিক থেকেও উভয় কক্ষই ৪ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। স্বাভাবিক কার্যকালের পূর্বেই প্রেসিডিয়ম কক্ষ দুটি ভেঙে দিতে পারে যদি উভয়ের মধ্যে গুরুতর বিরোধ দেখা যায়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে উভয় কক্ষের সমসংখ্যক কয়েকজন সভ্য নিয়ে একটি বিরোধ নিরসন কমিটি (Conciliation Committee) গঠন করা হয়। মতদ্বৈততা নিরসনে কমিটি ব্যর্থ হলে সুপ্রীম সোভিয়েটের দুই কক্ষের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করা হয়। সেখানেও অবস্থার কোন উন্নতি না হলে সুপ্রীম সোভিয়েট ভেঙেদিয়ে প্রেসিডিয়ম নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করে।

উভয় কক্ষের সম্পর্ক
Relation between the Two Houses

দেশের রাষ্ট্রশক্তির সর্বোচ্চ আধার হিসেবে সুপ্রীম সোভিয়েটের অনেক ক্ষমতা। এইগুলিকে আইনগত আর্থিক, সাংবিধানিক, নিয়োগসংক্রান্ত বৈদেশিক বিষয়সংক্রান্ত, সমর বিভাগসংক্রান্ত এবং নির্বাচনিক প্রভৃতি কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

সুপ্রীম সোভিয়েটের কার্যধারা
Function of the Supreme Soviet

(১) আইনগত ক্ষমতা :—সংবিধানের ১৪ ধারায় বর্ণিত মত সমস্ত কেন্দ্রীয় বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়ন করার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সুপ্রীম সোভিয়েটের। সমস্ত অঞ্চলিক ভাষায় অনূদিতব্য এই সমস্ত আইন ইউনিয়ন রিপাব্লিক গুলির

ওপরে প্রযোজ্য। কার্যপালিকা বিভাগের ভিটো (Executive Veto) না থাকায় সুপ্রীম সোভিয়েটে গৃহীত সিদ্ধান্তই চরম আইন বলে গণ্য হয়। আইন-গুলিতে প্রেসিডিয়মের অনুমোদনমূলক স্বাক্ষর শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক কারণেই প্রয়োজন হয়। অবশ্য নিজ উদ্যোগে বা কোন ইউনিয়ন রিপাব্লিকের অনুরোধে সুপ্রীম সোভিয়েটে গৃহীত আইন গণভোটে (Referendum) দেওয়া যেতে পারে।

(২) আর্থিক ক্ষমতা :—সোভিয়েট দেশে অর্থবিল ও সাধারণ বিলের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। সাধারণ আইনের মতই অর্থবিলগুলিও উভয় কক্ষের সম্মতিক্রমে পাশ হয়ে থাকে। বাৎসরিক বাজেট অনুমোদন, কেন্দ্র ও ইউনিয়ন রিপাব্লিকগুলির মধ্যে কর ও রাজস্ব বণ্টন এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য পরিকল্পনা পরীক্ষণ সুপ্রীম সোভিয়েটের অন্যতম ক্ষমতা। সোভিয়েট দেশে আর্থিক বিলগুলি শুধুই অর্থমন্ত্রণালয়ের প্রধানের দ্বারা উত্থাপিত হয় না, এবিষয়ে সুপ্রীম সোভিয়েটের অর্থনৈতিক কমিটিরও যথেষ্ট প্রভাব আছে।

(৩) সাংবিধানিক ক্ষমতা—সংবিধানের পরিবর্তন সংক্রান্ত চূড়ান্ত ক্ষমতা সুপ্রীম সোভিয়েটে ন্যস্ত। সোভিয়েটের উভয় কক্ষ অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ সভ্যের ভোটে সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব পাশ হয়। এছাড়া সোভিয়েট দেশে নূতন রিপাব্লিকের প্রবেশ, নূতন অটোনমাস রিপাব্লিক বা রিজিয়ন বা ন্যাশনাল এরিয়া সৃষ্টি এবং যে কোন রকমের সীমানা পরিবর্তনের ক্ষমতাও সুপ্রীম সোভিয়েটকে একান্ত ভাবে দেওয়া হয়েছে। একমাত্র শেষোক্ত ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন রিপাব্লিক বা রিপাব্লিকসমূহের অনুমোদন প্রয়োজন হয়।

(৪) নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা—শুরু থেকেই সুপ্রীম সোভিয়েট তিনটি স্থায়ী কমিশন নিয়োগ করে রেখেছে: আইনের প্রস্তাব পরীক্ষণ কমিটি বাজেট পরীক্ষণ কমিটি ও বৈদেশিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত কমিটি। এছাড়া সে কোন বিষয়ে অনুসন্ধান ও নিরীক্ষার জন্য নূতন নূতন কমিশন বসানোর ক্ষমতাও সুপ্রীম সোভিয়েটের আছে। এইসব কমিটির সুপারিশমত সুপ্রীম সোভিয়েটে বিল পাশ হয়ে থাকে।[২]

(৫) বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত ক্ষমতা—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি সুপ্রীম সোভিয়েটে আলোচিত হয়। অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সমস্ত চুক্তি সুপ্রীম সোভিয়েটের অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল।

---

[২] Harper বলেছেন, "It has been in these commissions rather than in the plenary sessions of the two houses that the detailed consideration of the proposed legislation has been handled—Harper, S.N. : 'The Government of the Soviet Union",

(৬) সমরবাহিনী সংক্রান্ত ক্ষমতা—সংবিধানে প্রত্যেক ইউনিয়ন রিপাব্লিকের নিজস্ব সমরবাহিনী গঠনের সুযোগ থাকলেও, সুপ্রীম সোভিয়েটই এই সমস্ত বাহিনীর সংগঠন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করে।

(৭) নির্বাচনিক ক্ষমতা—উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে সুপ্রীম সোভিয়েট প্রেসিডিয়মের সভ্যবৃন্দ, মন্ত্রিসভার সভ্যবৃন্দ, সুপ্রীম কোর্টের বিচারকবৃন্দ এবং প্রকুরেটর জেনারেলকে নির্বাচিত করে। ফলে এই সমস্ত সংস্থা ও পদাধিকারী ব্যক্তিবৃন্দ সুপ্রীম সোভিয়েটের নিকট দায়িত্বশীল থাকে।

সুপ্রীম সোভিয়েটের গঠন এবং ক্ষমতা আলোচনা করলে পশ্চিমী সংসদ প্রথার সঙ্গে এর কতকগুলি বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমতঃ ক্ষমতাবণ্টনের নীতিটি এখানে অনুসৃত হয়নি। সামরিক ও বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত ক্ষমতা ছাড়াও প্রশাসন ও বিচার বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগসমূহ সুপ্রীম সোভিয়েটের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এর উত্তরে সোভিয়েট সংবিধানবিদ্‌গণের বক্তব্য হল, শ্রেণীবিভক্ত ধনতান্ত্রিক সমাজে বিভিন্ন স্বার্থের সংশ্লেষের দরুণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের মধ্য দিয়ে একটি নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের ব্যবস্থা প্রয়োজন হলেও শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজে এর কোন উপযোগিতা নেই, বিশেষতঃ, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নামে যখন পশ্চিমী দেশগুলিতে কার্যপালিকা বিভাগেরই প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ, সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় কক্ষেরই সমান ক্ষমতা ও কার্যকাল এবং একই রকম সাধারণ নির্বাচনের দ্বারা সংগঠনের ফলে দ্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজনটি সুস্পষ্ট নয়। এই প্রসঙ্গে ভিশিন্‌স্কি বলেছেন, পশ্চিমী গণতন্ত্রের আপাতদৃষ্টিতে জনপ্রতিনিধি সভাকে বেশী ক্ষমতা দেওয়া হলেও, স্থায়িত্ব ও অন্যান্য নানা দিক থেকে উচ্চতর কক্ষকে অনেক সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত এই দ্বিতীয় কক্ষের প্রধান কাজই হল জনসভার প্রস্তাব সমূহের বিরোধিতা করা। সোভিয়েট দেশে সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে দ্বিতীয় কক্ষের সৃষ্টি—সে উদ্দেশ্য হল অসংখ্য জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা ও অধিকারের সংরক্ষণ।

পশ্চিমী সংসদ প্রথার সঙ্গে পার্থক্য

Marks of difference from the western Parliamentary practice

সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রেসিডিয়ম (Presidium of the Supreme Soviet)

১৯৩৬ সালের সংবিধানের একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রেসিডিয়ম বা সভাপতিমণ্ডলী। রাষ্ট্রশক্তির অন্যতম উচ্চতর সংস্থা হিসাবে

প্রেসিডিয়ম একটি যৌথ সংস্থা যা সবসময়ই ব্যবস্থাপক এবং কার্যকরী নানাবিষয়ে ব্যাপৃত থাকে। এমন একটি সংবিধানিক সংগঠন পৃথিবীর আর কোন দেশে সৃষ্টি হয়নি। একযোগে বিচার, আইন প্রণয়ন এবং প্রশাসন এই তিন ধরণের ক্ষমতাই প্রেসিডিয়মের ওপর ন্যস্ত। গঠনের দিক থেকে সুইজারল্যাণ্ডের ফেডারেল কাউন্সিলের মত এটি একটি বহুত্ববাচক কার্যকরী সংস্থা (Plural Executive)। অথচ সুইস ফেডারেল কাউন্সিলের প্রেসিডিয়মের মত কোন বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা নেই। প্রশাসনিক ও বৈদেশিক নীতিসংক্রান্ত ক্ষমতার দিক থেকে মার্কিণ প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে তুলনীয় হলেও, সুপ্রীম সোভিয়েটের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সংযোগ মার্কিণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণকে অস্বীকার করেছে। প্রেসিডিয়ম ছাড়াও একটি মন্ত্রিসভা থাকায় ব্রিটিশ মন্ত্রি পরিষদের সঙ্গেও এর তুলনা অসম্ভব। সুতরাং সোভিয়েট প্রেসিডিয়মকে একটি সাংবিধানিক অভিনবত্ব (Constitutional novelty) বলা চলে।

সংগঠন
Composition

একজন সভাপতি, প্রত্যেক ইউনিয়ন রিপাব্লিকের প্রতিনিধি স্থানীয় ১৫জন সহ-সভাপতি এবং ১৬ জন অন্যান্য সদস্য নিয়ে প্রেসিডিয়ম গঠিত হয়। সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে প্রেসিডিয়মের সভ্যগণ নির্বাচিত হন (৪৮ ধারা)। যে কোন কাজের জন্য প্রেসিডিয়মকে সুপ্রীম সোভিয়েটের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। এর কার্যকাল সাধারণতঃ চার বৎসর। তবে তার আগেই যদি সুপ্রীম সোভিয়েট ভেঙে যায় তাহলে প্রেসিডিয়মের কার্যকালও সেই সঙ্গে শেষ হয়। সংবিধানের ৫৩, ৫৪ ও ৫৫ সংখ্যক ধারা অনুসারে সুপ্রীম সোভিয়েটের কার্যকাল শেষ হলে বা ভেঙে গেলে যতদিন না নূতন সুপ্রীম সোভিয়েট অপর একটি প্রেসিডিয়ম গঠন করছে ততদিন পুরাতন প্রেসিডিয়মই কাজ চালিয়ে থাকে, দুই মাসের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করে এবং নির্বাচনের পর তিনমাসের মধ্যে নব নির্বাচিত সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন আহ্বান করে।

প্রেসিডিয়মের সভাপতি
Chairman of the Presidium

সংবিধানে আলাদা করে কিছু বলা না হলেও প্রেসিডিয়মেরই কিছু কিছু কাজ প্রেসিডিয়মের সভাপতি করে থাকেন। ভিশিন্স্কির মতে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির অধিনায়কদের মত তাঁর নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই, বিশেষ কর্তৃত্ব একটি যৌথসংস্থার প্রধান বলেই তাঁর ওপর কিছু কিছু অধিকার বর্তায়।[3]

3 "He has no such special rights as characterise the individual heads of the bourgeois states. His rights flow out of his position as the head of a Collegium institution of special authority." Vyshinsky : "The Law of the Soviet State."

সুপ্রীম সোভিয়েটে যে সমস্ত আইন গৃহীত হয়, সেগুলি তাঁর স্বাক্ষর সম্বলিত হয়ে প্রযুক্ত হয়। প্রেসিডিয়মের নির্দেশ (decree) সমূহের ওপরও তাঁরই স্বাক্ষর থাকে। বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত ও কূটনীতিক প্রতিনিধি গ্রহণ ও প্রেরণ এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে বাণীবিনিময় তিনিই করে থাকেন। এক দিক থেকে তাঁকে দেশের নাম-সর্বস্ব অধিনায়ক (titular head , বলা যায়। অন্যান্য দেশের আলঙ্কারিক প্রধানদের মত সাধারণ মানুষের কাছে তিনি রাষ্ট্রের মঙ্গলকামী অভিভাবকত্বের জীবন্ত প্রতীক বলে গণ্য হন।[4]

সংবিধানের ৪৯ সংখ্যক ধারায় প্রেসিডিয়মের ক্ষমতাগুলির একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন আহ্বানের এবং ৪৭ ধারা অনুযায়ী উভয়কক্ষের চরম বিরোধের ক্ষেত্রে সুপ্রীম সোভিয়েট ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা প্রেসিডিয়মকে দেওয়া হয়েছে। দেশব্যাপী নির্বাচন সমূহ প্রেসিডিয়মই পরিচালনা করে। এই নির্বাচন নিজস্ব বিবেচনায় অথবা কোন ইউনিয়ন রিপাব্লিকের দাবীতে অনুষ্ঠিত হয়। শাসনপরিচালনার ক্ষেত্রে সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন স্থগিত থাকাকালীন মন্ত্রিদের নিয়োগ প্রেসিডিয়ম করে থাকে, যদিও পরবর্তী অধিবেশনে এই নিয়োগ সুপ্রিম সোভিয়েট কর্তৃক অনুমোদিত করিয়ে নিতে হয়। দেশের যাবতীয় সম্মানসূচক উপাধি ও পুরস্কার বিতরণ করে প্রেসিডিয়ম। সামরিক এবং কূটনৈতিক পদমর্যাদা সৃষ্টি করারও ক্ষমতা প্রেসিডিয়মের আছে। সুপ্রীম সোভিয়েট অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন দেশ যদি বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে বা অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি অনুসারে যুদ্ধের প্রয়োজন হলে দেশে যুদ্ধাবস্থা ঘোষণা এবং বাধ্যতামূলক সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের ব্যবস্থাও প্রেসিডিয়মকে করতে হয়। দেশের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে বা শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রেসিডিয়ম সর্বত্র বা বিশেষ কোন অঞ্চলে সামরিক আইন জারী করতে পারে। বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রেসিডিয়মই সোভিয়েট দেশের মুখপাত্র। চুক্তি সম্পাদন ও অবসান, কূটনৈতিক প্রতিনিধি প্রেরণ ও গ্রহণ, এমনকি বিতাড়নের ব্যবস্থাও প্রেসিডিয়মের অন্যতম কাজ। এছাড়া বিচারক্ষেত্রে প্রেসিডিয়ম কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। কেন্দ্রীয়

কার্য ও ক্ষমতা
Powers and functions

4 "As in the case of his foreign counter-parts his most important function is to mix with the ordinary citizens as a living human symbol of the paternal concern of the government with their welfare"—Carter, Herz and Ranney : The Government of the Soviet Union'.

আইনসমূহের ব্যাখ্যা, উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ, এবং যথাযথ প্রয়োগের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা এর অঙ্গীভূত। সুপ্রীম কোর্টের বিচারে দণ্ডিতদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন বা তাদের শাস্তি হ্রাস বা অব্যাহতিদানের ক্ষমতাও প্রেসিডিয়মকে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যসমূহের মন্ত্রণালয়গুলির সিদ্ধান্ত বা কার্যকলাপ কেন্দ্রীয় আইনের বিরোধিতা করলে প্রেসিডিয়ম সেইসব সিদ্ধান্ত ও কার্যকলাপ বাতিল ঘোষণা করে। অন্যান্য দেশে এই কাজটি বিচার বিভাগের ওপরেই ন্যস্ত থাকে।

সোভিয়েট মন্ত্রিসভা (The Council of Ministers of the U. S. S. R.) :

দেশের উচ্চতর রাষ্ট্রশক্তির ধারক বলে বর্ণিত সংগঠনগুলির অন্তর্ভুক্ত না হলেও, সোভিয়েট রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ক্ষমতার আধার হিসাবে (৬৪ ধারা) মন্ত্রিসভাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। পূর্বে মন্ত্রিসভার নাম ছিল Council of People's Commissars। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে এর নামের পরিবর্তন করা হয়। ৫৬ সংখ্যক ধারা অনুযায়ী, সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় কক্ষের সম্মিলিত এক অধিবেশনে এই মন্ত্রিগণ নিযুক্ত হন। মন্ত্রিসভায় একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি, রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সমিতির সভাপতি, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির উপাদানগত ও কারিগরি সরবরাহ সমিতির সভাপতি, রাষ্ট্রীয় নির্মাণ সমিতির সভাপতি এবং রাষ্ট্রীয় কলাচর্চা সংক্রান্ত সমিতির সভাপতি থাকেন। পূর্বতন People's Commissar এ দশজন সদস্য ছিলেন। বর্তমানে রাষ্ট্রের কর্মধারার প্রসার ও জটিলতার দরুন এই সংখ্যা অর্ধশতের ওপর দাঁড়িয়েছে। মন্ত্রিসভার এই আয়তনবৃদ্ধির ফলে সভাপতি ও সহ-সভাপতিকে নিয়ে একটি উপমন্ত্রিসভাই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। মন্ত্রিসভার সভাপতি প্রধানমন্ত্রী নামে পরিচিত। কম্যুনিষ্ট পার্টির সর্বাগ্রগণ্য কোন নেতাই এইপদে অধিষ্ঠিত হন।

সংগঠন
Composition

সোভিয়েটদেশে মন্ত্রিদের দুই শ্রেণী : কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং অঙ্গরাজ্যের মন্ত্রী। এঁদের মধ্যে পার্থক্য হল, সম্পূর্ণভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়গুলির ওপর যাঁরা কর্তৃত্ব করেন তাঁরা হলেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী আর যাঁরা সাধারণ বা যুগ্ম ক্ষেত্রাধিকার-ভুক্ত বিষয়সমূহ সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মন্ত্রণালয়ের সাহায্যে পরিচালনা করেন তাঁদের অঙ্গরাজ্যের মন্ত্রী বলা হয়। এর ফলে শাসন-

কেন্দ্রীয় এবং অঙ্গরাজ্যের মন্ত্রিগণ
All-Union & Union-Republican Ministries

ব্যবস্থায় কোন কোন বিভাগে চরম কেন্দ্রীকরণের পাশাপাশি কতকগুলি ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ সূচিত হয়েছে।[5]

সংবিধানে ৬৮ সংখ্যক ধারায় মন্ত্রিসভার ক্ষমতাগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্যের সমস্ত মন্ত্রণালয় এবং স্বীয় ক্ষেত্রাধিকারের অন্তর্গত সমস্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থার মধ্যে মন্ত্রিসভা সংহতি সাধন করে। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট কার্যকরী করা এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রিসভার প্রধান কাজ। জনশৃঙ্খলা, রাজ্যগুলির স্বার্থ এবং নাগরিকদের অধিকারসমূহ সংরক্ষণের দায়িত্ব মন্ত্রিসভার। বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি নিরূপণেও মন্ত্রিসভা অংশ গ্রহণ করে এবং সশস্ত্র বাহিনীতে বাৎসরিক লোকনিয়োগ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। ৬৯ সংখ্যক ধারা অনুসারে, কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রাধিকারভুক্ত সমস্ত অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যাপারে মন্ত্রিসভার কর্তৃত্ব আছে এবং কোন বিশেষ মন্ত্রী বা কোন অঙ্গরাজ্যের মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত নাকচ করারও অধিকার মন্ত্রিসভাকে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেক মন্ত্রী নিজ নিজ দপ্তরের পরিচালনাগত সমস্ত বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করেন এবং কেন্দ্রীয় আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশাদি দিয়ে থাকেন। দেশের শাসন-পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিগণ প্রত্যক্ষভাবে অথবা তদধীন বিভাগসমূহের মাধ্যমে এবং অঙ্গরাজ্যের মন্ত্রিগণ সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যের মন্ত্রিসভার মাধ্যমে কর্তৃত্ব করেন।

মন্ত্রিসভার কায ও ক্ষমতা
Power & Functions of the Council of Ministers

মুখ্যত সুপ্রীম সোভিয়েটের কাছে, এবং সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন বন্ধ থাকা কালে প্রেসিডিয়মের কাছে মন্ত্রি সভা সবসময় দায়ী থাকে (৩১ ও ৬৫ ধারা)। এছাড়া সুপ্রীম সোভিয়েটের কোন ডেপুটি কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলে লিখিত বা মৌখিক ভাবে তিনদিনের মধ্যে তার জবাব দিতে হবে (১৭ ধারা)। নানাকারণে মন্ত্রিসভার এই দায়িত্বশীলতাকে পশ্চিমী সমালোচকেরা নিরর্থক মনে করেছেন। তাঁরা বলেন, রাষ্ট্র-পরিচালনার সমস্ত সিদ্ধান্তই কমুনিষ্ট পার্টির অধিবেশনে স্থির হয়। কাজেই সুপ্রীমসোভিয়েটের কাছে যখন মন্ত্রিসভা বিবৃতি দেয়

সোভিয়েট মন্ত্রিসভার দায়িত্বশীলতা
Ministerial Responsibility in U. S. S. R.

---

5 "Administration is centralized in Moscow in the case of all-Union ministries. On the other hand in the case of Union-Republican ministries, the Control of administrative work is Centralized but the performance of it is to a considerable extent decentralized" — Munro : Governments of Europe.

তখন প্রশাসনিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত পার্টিরই একদল লোক, ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং পার্টিরই সমর্থনপুষ্ট আর একদলের কাছে জবাবদিহি করে। বিরোধী কোন দল না থাকায় আসলে সমালোচনা বা জবাবদিহি কিছুই হয়না এবং বিকল্প সরকার গঠনের সম্ভাবনা না থাকায় সরকারকে নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে সদা-সচেতন থাকতে হয় না। যতদিন পার্টির সমর্থন রয়েছে ততদিন মন্ত্রিদের স্বপদে অধিষ্ঠান। কিন্তু, বিরোধীদল থাকাসত্ত্বেও পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলিও কি এই একই অবস্থার সৃষ্টি হয় নি? সংসদে যতদিন নিজদলের সমর্থন রয়েছে ততদিন হাজার বিরোধিতা সত্বেও মন্ত্রিসভার পতন ঘটানো সম্ভব নয়। আর বিকল্প সরকারের সম্ভাবনা দিয়ে পশ্চিমী ধাঁচের গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হলেও, সোভিয়েট দেশে তার কোন উপযোগিতা নেই। কারণ এখানে মন্ত্রিসভা ছাড়াও কার্যকরী ক্ষমতা অন্যান্য সংস্থার মধ্যে বণ্টিত এবং সংবিধানে মন্ত্রিসভাকে সর্বোচ্চ প্রশাসনিক যন্ত্ররূপে বর্ণনা করা হলেও রাষ্ট্রশক্তির সর্বোচ্চ আধারের মর্যাদা দেওয়া হয়নি। এছাড়া সংবিধানবিরোধী ও অন্যান্য মনে হলেও মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত প্রেসিডিয়ম নাকচ করে দিতে পারে এবং দায়িত্ববিহীন মন্ত্রিমাত্রেরই পার্টির নির্দেশে পদচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যে পার্টি সাধারণ মানুষদের নিয়েই সংগঠিত। সর্বোপরি, সোভিয়েট দেশে সরকারের সমালোচনা হয় না বললে সত্যের অপলাপ হবে। তবে সেখানে সমালোচনার গতি-প্রকৃতি ভিন্ন ধরনের, কারণ শ্রেণীবিভক্ত সমাজের মত বিভিন্ন দলের বিভিন্ন স্বার্থ নিয়ে সংঘাত এখানে অনুপস্থিত। দেশের জনসমর্থিত সংবিধান সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিকে স্বীকার করে নিয়েছে। তাই সব সমালোচনাই সেই সমাজতন্ত্রের যথাযথ রূপায়ণ হচ্ছে কিনা তার প্রতি দৃষ্টি রাখে; সরকারের ত্রুটিবিচ্যুতির গঠনমূলক সমালোচনাই এখানে মূল উদ্দেশ্য। আর এই ধরনের রাজনৈতিক বিদ্বেষ মুক্ত 'টেকনিক্যাল' সমালোচনা করার যোগ্যতাও জনপ্রতিনিধিদের আছে। কেন না বিভিন্ন পেশা থেকে এইসব প্রতিনিধি সুপ্রীম সোভিয়েটে আসেন, রাজনীতিই তাঁদের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ও উপার্জনের পথ নয়।

সোভিয়েট বিচারব্যবস্থা

(Soviet Judicial System)

পাশ্চমী ধাঁচের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যে প্রতিপালিত সংবিধান-বিশেষজ্ঞগণ বিচারবিভাগকে সরকার ও রাজনীতির ঊর্ধ্বে অবস্থিত একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানরূপে কল্পনা করেছেন। আইনের প্রযোগ করতে গিয়ে বিচারকেরা কি সরকার, কি সাধারণ নাগরিক সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন এবং রাজনৈতিক মর্যাদা-নির্বিশেষে প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সংস্থাকেই আইন অনুসারে দণ্ড দিয়ে থাকেন। এর জন্যে বিচারবিভাগের একটি বিশেষ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে করা হয় এবং সেই মর্যাদা রক্ষার্থে বিচারকবৃন্দকে কতকগুলি নিরাপত্তার সুযোগ ও স্বাধীনতা দেওয়া হয়। সোভিয়েট রাশিয়ায় কিন্তু বিচারবিভাগকে সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিতে দেখা হয়। বিচারকদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার পরিপূর্ণ সুযোগ থাকলেও, সেখানে বিচারবিভাগকে সরকার-নিরপেক্ষ কোন সংস্থা বলে মনে করা হয় না। এই ভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গীর কারণ হল মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্বে সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতিতে আইনের স্বরূপ বিশ্লেষণ। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রবলতম শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও অন্যান্য স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যেই আইনের উদ্ভব ও প্রচলন একথা মাকর্সবাদীরা বলে থাকেন। আর রাষ্ট্রযন্ত্রকে নানাভাবে (বিচারবিভাগ, পুলিশ, সৈন্যবাহিনী ইত্যাদি) সেই সব আইন বলবৎ রাখার জন্য প্রয়োগ করা হয় শোষিত শ্রেণীর দমনের জন্য। সুতরাং রাষ্ট্র যেহেতু শ্রেণীস্বার্থেই আইন প্রণয়ন করে এবং বিচারবিভাগ যখন রাষ্ট্রের প্রবর্তিত আইনই প্রয়োগ করে তখন বিচারবিভাগকে সরকার-নিরপেক্ষ বলার সার্থকতা কোথায় ?[1] ন্যায়নীতিবোধ ও নিরপেক্ষতার (equality and impartiality) যে ধারণা পশ্চিমী বিচারব্যবস্থায় নিহিত আছে বলে মনে করা হয়, রাষ্ট্র এবং আইনকে শ্রেণীদ্বন্দ্বেরই ফলশ্রুতি রূপে কল্পনা করলে সে ধারণা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। সোভিয়েট রাশিয়ার সংবিধান-বিশেষজ্ঞগণও বিনা দ্বিধায় স্বীকার করেন যে সোভিয়েট রাষ্ট্র যে শ্রেণীর স্বার্থ

বিচারবিভাগের উদ্দেশ্য
Purposes of the Judiciary

---

1 লেনিন বলেছেন : "The court is an organ of power. This is sometimes forgotten by the liberals. But a marxist commits a sin if he forgets it." V. I. Lenin. Works (Vol. 25-p. 105)

রক্ষা করে তাহল মেহনতী মানুষের শ্রেণী যাদের চরম লক্ষ্য সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। সুতরাং রাষ্ট্রযন্ত্রেরই অন্যতম অঙ্গ বিচারবিভাগের *প্রধান কাজ হল সমাজতন্ত্রের অনুকূল সমস্ত আইনকানুন যাতে যথাযথ প্রযুক্ত হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা এবং সমাজতন্ত্রবিরোধী সমস্ত কার্যকলাপ কঠোর হস্তে দমন করা।*

বিচারবিভাগকে রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে পৃথক বলে গণ্য করা না হলেও সোভিয়েট রাশিয়ায় নানাভাবে বিচারবিভাগকে গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমতঃ প্রত্যেক বিচারালয়ই জনগণের দ্বারা বা জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত হয়। সোভিয়েট রাশিয়ার সুপ্রীম কোর্ট সুপ্রীম সোভিয়েটের দ্বারা নির্বাচিত হয়; ইউনিয়ন ও অটোনমাস রিপাবলিকের সুপ্রীম কোর্টগুলি তথাকার সুপ্রীম সোভিয়েটের দ্বারা নির্বাচিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন অঞ্চল ও নগরের বিচারালয়সমূহ সেই সেই অঞ্চলের সোভিয়েটের ডেপুটিগণের ভোটে নির্বাচিত হয়। এছাড়া ক্ষুদ্রক্ষুদ্র গণ-আদালতগুলি সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরাসরি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়। প্রত্যেক বিচারালয়ের কার্যকাল ৫ বৎসর।

সোভিয়েটবিচাব ব্যবস্থাব গণতান্ত্রিকতা
Democratic features of the Soviet Judiciary

দ্বিতীয়তঃ, জনগণের এ্যাসেসর নিয়োগ সোভিয়েট বিচারব্যবস্থার একটি স্থায়ী এবং অভিনব বৈশিষ্ট্য। সংবিধানের ১০৩ ধারায় বলা হয়েছে: "আইনে অন্য কোন বিশেষ নির্দেশ না থাকলে সমস্ত বিচারকার্য জনগণের এ্যাসেসরদের উপস্থিতিতে পরিচালিত হবে।"[2] বিভিন্ন স্থানের এ্যাসেসরগণ সেইসব এলাকার মেহনতী জনতার অধিবেশনে ২ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। এ্যাসেসরগণ ক্রমান্বয়ে (in rotation) নিজ নিজ কর্তব্য পালন করেন এবং বিচার চলাকালীন অন্যতম বিচারকের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। তৃতীয়তঃ, নির্দিষ্ট কার্যকাল শেষ হওয়ার পূর্বেই জনসাধারণের দাবীতে যে কোন বিচারক পদচ্যুত হতে পারেন। বিচারকার্যের জন্য জনসাধারণের কাছে বিচারকেরা দায়ী থাকেন। চতুর্থতঃ, বিচারকার্যের জন্য বিচারকগণ একমাত্র আইনের নির্দেশই অনুসরণ করেন, কোন প্রশাসনিক বা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ নয়। পঞ্চমতঃ, আইনের সমদৃষ্টি (equality before law) সোভিয়েট দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। সমস্ত নাগরিকদের জন্য একইরকম বিধান ও বিচারব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়। ষষ্ঠতঃ, বিচারালয়ের কার্যবিধি প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। বিচার চলাকালীন সমস্ত সাধারণ মানুষেরই বিচারালয়ে উপস্থিত

---

[2]"In all courts cases are tried with the participation of the people's assessors, except in cases specially provided for by law." – Constitution of the USSR : Art.103.

থাকায় কোন বাধা নেই। সপ্তমতঃ, অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পরিপূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয় এবং এই উদ্দেশ্যে একাধিক আইনজ্ঞ নিযুক্ত আছেন। জনসংগঠনসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দও অভিযুক্তকে সমর্থন করার জন্য উপস্থিত থাকতে পারেন। সর্বোপরি, আঞ্চলিক ভাষাতেই বিচারকার্য সম্পন্ন হয়। যাঁরা ঐ ভাষা জানেন না তাঁদের নথিপত্র পরীক্ষা ও শুনানী বুঝবার জন্য ভাষ্যকারের সাহায্য নিতে দেওয়া হয় এবং তাঁরা নিজেব ভাষাই বিচারালয়ে ব্যবহার করতে পারেন।

সোভিয়েট দেশের বিচার সংগঠন (Judicial structure of the U.S.S.R.) :

সমাজতান্ত্রিক ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংগঠিত সোভিয়েট বিচারালয়গুলি মোটের উপর দেশের আঞ্চলিক বিভাগকে অনুসরণ করে তৈরী হয়েছে। প্রধানতঃ যেসব বিচারালয়ের ওপর ন্যায়বিচারের ভার পড়েছে সেগুলি হল—(১) সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্ট। (২) ইউনিয়ন ও অটোনমাস রিপাব্লিকসমূহের নিজস্ব সুপ্রীম কোর্ট, (৩) আঞ্চলিক ও পৌর বিচারালয় (৪) জেলাগুলির গণবিচারালয় এবং (৫) সামরিক ট্রাইবুন্যাল। প্রত্যেক বিচারালয়ের নিজস্ব এক্তিয়ার স্থির করে দেওয়া হয়েছে।

বিচারালয়গুলিকে প্রাথমিক আবেদনের (Courts of first instance) এবং আপীল শুনানীর (Courts of second instance) বিচারালয়, এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। প্রথম শ্রেণীর বিচারালয়ে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার সরাসরি প্রাথমিক বিচার হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিচারালয়ের ঐসব মামলা সংক্রান্ত আপীলের শুনানী ও বিচার হয়। সোভিয়েট বিচার ব্যবস্থার প্রাথমিক ভিত্তি গণ-আদালত। এই আদালত শুধুই প্রাথমিক আবেদন শ্রবণ ও বিচার করে। অন্যান্য সমস্ত আদালতের প্রাথমিক বিচার ও নিম্নতর আদালত থেকে আগত আপীলের বিচার—উভয় ক্ষেত্রাধিকারই আছে। বিচারালয়গুলি তিনটি করে যৌথ সংস্থা নিয়ে গঠিত—দেওয়ানী সংস্থা, ফৌজদারী সংস্থা এবং বিচারপতিমণ্ডলী (Civil Collegium, Criminal Collegium and Presidium)। অঙ্গরাজ্যের সুপ্রীম কোর্ট সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন রিপাব্লিক বা অটোনমাস রিপাব্লিকের সর্বোচ্চ আদালত। এখানে একজন বিচারপতি ও দুজন জনসাধারণের এ্যাসেসর নিয়ে প্রাথমিক আবেদন এবং তিনজন বিচারকের সভাপতিত্বে আপীলের শুনানী ও বিচার হয়।

সারা সোভিয়েট দেশের সর্বোচ্চ আদালত হল সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্ট। যুক্তরাষ্ট্রীয় অঙ্গরাজ্যের বিচার সংগঠন ও বিচার পরিচালনার ওপর এই আদালত নিজস্ব সনদে প্রদত্ত ক্ষমতা অস্থায়ী তত্ত্বাবধান ও কর্তৃত্ব করে থাকে। এই আদালতের নূতন আইনের প্রস্তাব দেওয়ারও ক্ষমতা আছে। সাধারণভাবে সুপ্রীম সোভিয়েটের কাছে সুপ্রীম কোর্ট দায়ী থাকে। একজন সভাপতিস্থানীয় বিচারক একাধিক সহ-বিচারক, সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রতিনিধি এবং জনসাধারণের এ্যাসেসর নিয়ে সুপ্রীম কোর্টের সংগঠন। এছাড়া অঙ্গরাজ্যগুলির সুপ্রীম কোর্টের সভাপতিগণ পদাধিকার বলে এই বিচারালয়ের সদস্যপদ লাভ করেন। মোট কতজন বিচারপতি থাকবেন সুপ্রীম সোভিয়েট প্রতিবার বিচারক নির্বাচনের সময় সেটা স্থির করে দেয়। সুপ্রীম কোর্টের মাঝে মাঝে সর্বাত্মক অধিবেশন বসে (plenary session)। যে কোন কোর্টের প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে প্রকুর‍্যেটর বা কোর্টের সভাধ্যক্ষের আপত্তিমূলক আবেদন বিবেচনা করার জন্য। উপস্থিত সভ্যগণের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এছাড়া বিচার পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে বিচারালয়-গুলিকে এবং আইনের প্রবর্তন-পরিবর্তন এবং ভাষ্যদান সম্পর্কে প্রেসিডিয়মকে নিরিখ নির্দেশ দেওয়াও এই সর্বাত্মক অধিবেশনের অন্যতম কাজ।

এছাড়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মামলার প্রকৃতিগত জটিলতা অনুসারে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। সমর বিভাগীয় সমস্ত বিচারের ভার সামরিক আদালতের ওপর ন্যস্ত।

প্রকুর‍্যেটর জেনারেল (Procurator General) :

সোভিয়েট বিচার ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য প্রকুর‍্যেটর জেনারেলের দপ্তর। ১৯২২ সালে এই দপ্তরটির প্রথম প্রতিষ্ঠা। আঞ্চলিক প্রভাব ও ব্যতিক্রম-নিরপেক্ষভাবে দেশের সর্বত্র যাতে সমাজতান্ত্রিক আইনের সংরক্ষণ ও প্রয়োগ যথাযথভাবে হয় এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তাবিরোধী কাজকর্ম যাতে অনুষ্ঠিত না হয়—সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রকুর‍্যেটরের কর্তব্য। কোন শাসনসংস্থাতেই যাতে আইনবিরোধী কাজ না হয় বা হলে উপযুক্ত প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা তাঁর দায়িত্ব। বে-আইনী কার্যকলাপ ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাই সংশ্লিষ্ট বিভাগের উর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি আবেদন করে থাকেন। তদন্ত এবং অভিযোগ এই দুটিই প্রকুর‍্যেটরের মুখ্য কর্তব্য—বে-আইনী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে স্বয়ং কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের তাঁর কোন ক্ষমতা নাই। প্রকুর‍্যেটরের দপ্তরকে প্রশাসনিক বিচার সংস্থা (organ of administrative justice) মনে করলে

ভুল করা হবে। প্রকুরেটরের পদমর্যাদা অনেকটা পশ্চিমী দেশের সরকারী অভিযোক্তার (Public Prosecutor) মত। অপরাধ ঘটলে তিনি আদালতে অভিযোগ পেশ করেন এবং অভিযোগের সমর্থনে সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রকুরেটর জেনারেল কেন্দ্রীয় সুপ্রীম সোভিয়েট কর্তৃক ৭ বৎসরের জন্য এবং অঙ্গরাজ্য ও অঞ্চলগুলির প্রকুরেটরগণ ৫ বৎসরের জন্য প্রকুরেটর জেনারেল কর্তৃক নিযুক্ত হন। অনুরূপভাবে জেলা ও সহরের প্রকুরেটরগণ সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যের প্রকুরেটর কর্তৃক নিযুক্ত হন। প্রকুরেটরগণ কোন সরকারী বিভাগের অধীন নন। সরাসরিভাবে প্রকুরেটর জেনারেলের কর্তৃত্বাধীনে তাঁরা কাজ করেন।

ব্যক্তি, রাষ্ট্র ও দল

(The Individual, the State and the Party)

সোভিয়েট দেশে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে যোজকের স্থান দখল করে আছে সেদেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল কম্যুনিষ্ট পার্টি। তাই সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কম্যুনিষ্ট পার্টির ভূমিকা জানা ছাড়া ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কটি সম্পূর্ণ উপলব্ধি হবে না। এদেশের শাসনব্যবস্থার গণতান্ত্রিকতাই বা কতদূর সে প্রশ্নটিও নির্ভর করে কম্যুনিষ্ট পার্টির উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপের উপর।

কম্যুনিষ্ট দলের ভূমিকা (Role of the Communist Party) :

সংবিধানের ১২৬ ধারায় কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বর্ণনা করা হয়েছে সমভোগবাদী সমাজগঠনে জনতার পথপ্রদর্শক হিসাবে।[1] শোষণভিত্তিক পুরাতন শাসন-ব্যবস্থার উচ্ছেদকল্পে বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য মেহনতী মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি ও তাদের সংঘবদ্ধ করার প্রয়াসে কম্যুনিষ্ট পার্টির উদ্ভব। বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার পর বিপ্লবী সরকারের সংরক্ষণ এবং মেহনতী মানুষের স্বৈরতন্ত্র পরিচালনার উদ্দেশ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টির নিরঙ্কুশ এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার প্রয়োজনে দেশের অন্য সমস্ত রাজনৈতিক সংস্থার একে একে বিলোপসাধন করা হয়। নূতন সংবিধানেও অর্থ নৈতিক সাংস্কৃতিক ও

একমাত্র রাজনৈতিক নেতৃত্ব
Exclusive political leadership

---

[1] "The most active and politically conscious citizens in the ranks of the working class, working peasants and working intelligentsia voluntarily unite in the Communist Party of the Soviet Union, which is the vanguard of the working people in their struggle to build Communist Society and is the leading core of all organisations of the working people, both public, and state—" Constn. of the U.S.S.R. Art 126'

অন্যান্য সংগঠনে আত্মনিয়োগের অধিকার দেওয়া হলেও কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যকোন রাজনৈতিক সংস্থা গঠনের সুযোগ দেওয়া হয়নি। শুধু তাই নয় দেশের অন্যান্য অরাজনৈতিক সংগঠন গুলিরও ধারক ও বাহক বলা যায় কম্যুনিষ্ট পার্টিকে।

পশ্চিমী প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রগুলি, যা এখন দলতন্ত্রে পর্যবসিত, এই ধরণের একমাত্র রাজনৈতিক নেতৃত্বসম্পন্ন অপ্রতিদ্বন্দ্বী দলব্যবস্থায় বিশ্বাসী নয়। সেখানকার তাত্ত্বিকগণ বিরোধীদলের অস্তিত্বকে দায়িত্বশীল সরকারের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন। সোভিয়েট দেশে বিরোধীদল না থাকায় সরকারের কোন বিকল্প রূপ কল্পনা করা যায় না এবং ক্ষমতাশীল দলের বিরুদ্ধে সমালোচনার যথার্থ কোন সুযোগ নাই। দেশের রাষ্ট্রনৈতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টি এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে দল ও সরকারের পার্থক্যও সেখানে অবলুপ্তপ্রায়। এইসব দিক থেকে বিচার করলে কম্যুনিষ্টদল শাসিত সোভিয়েট দেশের শাসনব্যবস্থাকে প্রকৃত গণতন্ত্র আখ্যা দেওয়ার অনেক বাধা আছে।

কতদূর গণতন্ত্র সম্মত
How far democratic

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকায় পশ্চিমী রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে অকারণ তুলনা করে এই ধরণের সিদ্ধান্তে অনেকেই এসেছেন। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, সোভিয়েট দেশের কম্যুনিষ্টদল পশ্চিমী গণতন্ত্রের দলগুলির মত এক একটি বিশেষ শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য দাবীদাওয়া নিয়ে হাজির হয়নি। দেশের একটি মাত্র শ্রেণী—মেহনতী জনতার অর্থনৈতিক স্বার্থ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে। কম্যুনিষ্ট দলের সভ্যরাই সেই ট্রেড ইউনিয়ন সমূহ পরিচালনা করেন। কিন্তু পার্টি যে উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিন্নতর এবং মুখ্যত রাজনৈতিক। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জনতাকে সমভোগদাবী সমাজে উত্তরণ করানোই এর প্রধান কাজ। পশ্চিমী গণতন্ত্রের দলগুলি তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে তাতে এমনি ধরণের বৈপ্লবিক কোন দায়িত্ব গ্রহণের কথা থাকেনা। ক্ষমতাসীন দলের ত্রুটিবিচ্যুতির সমালোচনা এবং কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে আংশিক সংস্কারই তাদের লক্ষ্য।

সোভিয়েট দেশে বিরোধী দল নেই কেন, তার সবচেয়ে সহজ উত্তর মিলবে সেদেশে শ্রেণীবিহীন সমাজগঠনের প্রচেষ্টায়। যতদিন না দেশে মেহনতী জনতা ছাড়া শোষকশ্রেণীর অস্তিত্ব মুছে গেছে ততদিন কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে

মেহনতী জনতার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও পরিকল্পনা করা হয়েছে। পশ্চিমী দেশগুলিতে পরস্পরবিরোধী অর্থনৈতিক স্বার্থ জীইয়ে রাখা হয়েছে এবং তাদের প্রতিনিধিত্ব করার উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিকদল গঠিত হয়। আর বিরোধীদল গঠনের সাংবিধানিক সুযোগ না থাকলেই যে দেশে সরকার-বিরোধী গোষ্ঠী গড়ে উঠবেনা বা গণতন্ত্রের বদলে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে এমন কথা বলা যায়না। প্রাক্ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ নাৎসী জার্মানী ও ফাশিস্ত ইটালীতে সরকার বিরোধী সব দল বেআইনী ঘোষণা করা হলেও সেখানে অসংখ্য বিরোধী দল গুপ্তভাবে কাজ করে গেছে। সুতরাং সংবিধান বা আইনের নির্দেশ নয়, সমাজের শ্রেণীচরিত্রই দলীয় বহুত্বের জন্ম দেয় বা দলীয় বহুত্বের অবসান ঘটায়। আর বিরোধীদল নেই বলেই গণতান্ত্রিকতা ক্ষুণ্ণ হবে এমন কোন কথা নাই। বিরোধী দলের মূল যে কর্তব্য—সরকারের সমালোচনা এবং বিকল্প সরকার গঠন—সেটা একই দলের মধ্যে থেকেও পরিচালিত হতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে পশ্চিমী দেশে বিরোধী দলগুলি ভিন্ন ভিন্ন নীতি ও আদর্শে বিশ্বাসী। সোভিয়েট দেশে পার্টিঅভ্যন্তরস্থ সমালোচনা এবং নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন ও পরিবহনের ব্যবস্থা থাকলেও বিকল্প কোন নীতিকে সমর্থন জানানো সম্ভব নয়। কম্যুনিষ্ট দলের নীতি মেনে নিয়ে যতটুকু সমালোচনা ও পরিবর্তন সম্ভব ততটুকুই হয়ে থাকে। কম্যুনিষ্ট দলের আদর্শ হল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং বাস্তবিকই সোভিয়েট দেশে এর বিকল্প কিছু স্বীকার করা হয় না। কিন্তু প্রচলিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর বিকল্প কাঠামো সৃষ্টি কি ধনতান্ত্রিক দেশেই রাজনৈতিক দলগুলির মাধ্যমে সম্ভব? সরাসরিভাবে ধনতন্ত্র আখ্যায় নিজেদের বিভূষিত করতে ইতস্ততঃ করলেও পশ্চিমী গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যে ধনতন্ত্রেরই পরিপোষক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিভিন্ন দলগুলিও ধনতান্ত্রিক কাঠামো মেনে নিয়েই রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালিয়ে থাকে এবং তাদের সরকার-বিরোধী সমালোচনা সমাজগঠনের কোন মূলনীতিগত প্রশ্নকে আশ্রয় করে না, অসংখ্য পরস্পরবিচ্ছিন্ন বৈশেষিক নীতি ও কর্মপদ্ধতিতে কল্পিত ত্রুটির সমালোচনা করে মাত্র। সুতরাং একাধিক দল থাকা বা না-থাকার সঙ্গে গণতান্ত্রিকতার প্রশ্নটি এক করে দেখলে তত্ত্ব এবং প্রয়োগ উভয় ক্ষেত্রেই ভুল করা হবে। পাশাপাশি একথাও মনে রাখতে হবে যে প্রতিদ্বন্দ্বী দল না থাকলেও কম্যুনিষ্ট পার্টির নিজের সংগঠন ব্যবস্থাও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে অনুসরণ করেই রচিত হয়েছে। সমস্ত কার্যকরী সমিতি ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নির্বাচনের

মাধ্যমে নিয়োগ, সাধারণ বৈঠকে জবাবদিহি, আত্মসমালোচনা ইত্যাদি তাঁর কয়েকটি নিদর্শন।

সোভিয়েট দেশে ব্যক্তির মূলগত অধিকার (Fundamental Rights of the Individual in the USSR) :—

বিপ্লবের পর মেহনতী মানুষের স্বৈরশাসনের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি রচনার চেষ্টা যতদিন চলছিল, ততদিন প্রতিবিপ্লবী ও অন্যান্য ক্ষতিকর শক্তি-সমূহের আশঙ্কায় সোভিয়েট দেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতার অনেক সুযোগ স্বাভাবিক কারণেই সঙ্কুচিত এবং অসংরক্ষিত ছিল। অবশেষে শ্রেণীশোষণের শেষ চিহ্নগুলি মুছে ফেলা হয়েছে বলে যখন স্থিরসিদ্ধান্ত নেওয়া হল, তখন নূতন করে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্কটির সম্বন্ধে চিন্তা করা হতে থাকল। ব্যক্তি-স্বাধীনতার ওপর এই নবতর চিন্তারই পরিপ্রকাশ হল ১৯৩৬ সালের ষ্ট্যালিন সংবিধানে নাগরিকদের মূলগত অধিকার ও কর্তব্য শীর্ষক অধ্যায়ে।

কতকগুলি মূলনীতিও পূর্বশর্তের দ্বারা এই অধিকারগুলি নিয়ন্ত্রিত। যথা—

অধিকাবগুলিব নিযামক নীতিসমূহ
Principles governing the rights

(১) মেহনতী জনতার স্বার্থে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই অধিকারগুলি প্রযোজ্য (১২৫ ধারা)।

(২) অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অধিকারের প্রাধান্য সর্বথা স্বীকার্য। কারণ অন্যান্য রাজনৈতিক অধিকারগুলি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপরেই নির্ভরশীল।

(৩) পশ্চিমী তাত্ত্বিকদের মত অধিকারগুলিকে ভাবময় (abstract) ও জন্মগত (inherent) বলে মনে করা হয়নি। প্রত্যেক অধিকারই সামাজিক কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক অধিকারের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তাই তার বাস্তবরূপায়ণের উপায়টিও নির্দেশ করে দেওয়া হয়েছে।

(৪) ব্যক্তি রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্র ব্যক্তির পরিপোষক এই মতাদর্শ অনুসারে অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি অবশ্যপালনীয় কর্তব্যরও উল্লেখ করা হয়েছে।

সংবিধানের ১১৩ থেকে ১৩৩ ধারায় অধিকারগুলির যে বর্ণনা আছে সেগুলিকে নিম্নোক্তভাবে সংক্ষেপে বিবৃত করা চলে।

অধিকাবগুলিব বর্ণনা
Enumeration of the Rights

(১) কর্মসংস্থানের অধিকার—সোভিয়েট নাগরিকগণের কর্মসংস্থান রাষ্ট্রকর্তৃক প্রতিশ্রুত এবং এজন্য পরিমাণ ও গুণগত উৎকর্ষ অনুসারে তাঁরা পারিশ্রমিক লাভ করে থাকেন। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি, উৎপাদনীশক্তির দ্রুত বৃদ্ধি,

অর্থনৈতিক সংকটের সম্ভাবনা মোচন এবং বেকারত্ব দূরীকরণের মাধ্যমে এই অধিকারটি কার্যকরী হয়েছে।

(২) অবসর বিনোদনের অধিকার—সাধারণক্ষেত্রে দৈনিক ৮ ঘণ্টা (শ্রমসাধ্য কাজে আরও কম) শ্রমদানের নিয়ম, পুরাবেতনে বার্ষিক ছুটি, অবসরবিনোদনের জন্য অসংখ্য সরকার পরিচালিত বিশ্রাম নিকেতন, প্রমোদ-উদ্যান, ক্লাব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই অধিকারটি রূপায়িত হয়েছে।

(৩) বার্ধক্য ও অক্ষমতায় সাহায্যলাভের অধিকার—বার্ধক্য, অসুস্থতা এবং অক্ষমতার ক্ষেত্রে ভরণপোষণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে সামাজিক বীমাব্যবস্থা (Social insurance), বিনাব্যয়ে চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যলাভার্থে আরোগ্য-নিকেতন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

(৪) শিক্ষার অধিকার—সোভিয়েট দেশে শিক্ষার অধিকারটি বিশেষভাবে প্রতিশ্রুত। কারণ 'অশিক্ষিতের মধ্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়না।' বাধ্যতামূলক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, বিনাব্যয়ে সপ্তমমান অবধি শিক্ষাদান, মেধাবীদের জন্য রাষ্ট্রীয় বৃত্তি, মাতৃভাষায় শিক্ষাদান এবং মেহনতী-মানুষের জন্য কারিগরি-শিক্ষার ব্যবস্থা এই শিক্ষণসূচীর প্রধান অঙ্গ।

(৫) মহিলাদের সমান অধিকার—অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক সকলক্ষেত্রেই সোভিয়েট দেশে স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত। বিশেষভাবে মাতৃত্বকালে এবং শিশু ও অবিবাহিতাদের জন্য সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা আছে।

(৬) সাম্যের অধিকার—জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রত্যেক মানুষের সমান সুযোগ সোভিয়েট দেশের এক অমোঘ বিধান। কোনরকম অধিকার সংকোচন বা সুবিধাপ্রদর্শন আইনের দ্বারা দণ্ডনীয়।

(৭) বিবেকবোধের স্বাধীনতা—এই উদ্দেশ্যে শিক্ষায়তনসমূহ ও রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণভাবে ধর্মসংগঠন থেকে পৃথক করা হয়েছে। বিশ্বাসমত ধর্মোপাসনার স্বাধীনতার পাশাপশি ধর্মবিরোধী প্রচারেরও সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

(৮) মতপ্রকাশের স্বাধীনতা—মেহনতী মানুষের স্বার্থ ও সমাজতন্ত্রের অনুকূল সমস্ত মতামত প্রকাশের জন্য বাক্‌স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা শোভাযাত্রা সমাবেশের অধিকার ইত্যাদি সংবিধানে প্রতিশ্রুত হয়েছে। এজন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর জনগণের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

(৯) সংগঠনের অধিকার এইসব ব্যক্তি স্বাধীনতা ছাড়াও বিভিন্ন গণসংগঠন যেমন, ট্রেডইউনিয়ন, সমবায়, সাংস্কৃতিক বৈজ্ঞানিক বা খেলাধূলা সংক্রান্ত বিভিন্ন

প্রতিষ্ঠানে বিনাবাধায় যোগদানের অধিকারও সোভিয়েট নাগরিকদের দেওয়া হয়েছে। কেবল কম্যুনিষ্ট দলের সভ্যগণের জন্য কতকগুলি বিশেষ গুণাবলী, কার্যকলাপ ও রাজনৈতিক চেতনা থাকা দরকার।

(১০) ব্যক্তি স্বাধীনতা—দৈহিক নিরাপত্তা, বাড়ী-ঘর সংরক্ষণ এবং চিঠিপত্রের গোপনীয়তা সোভিয়েট রাষ্ট্রে প্রতিশ্রুত। কোন বিচারালয় বা প্রকুরেটরের সিদ্ধান্ত ছাড়া কোন ব্যক্তিকে আটক করা যাবে না।

(১১) বিদেশীদের আশ্রয়দান—বিদেশের যেসব নাগরিক মেহনতী মানুষের স্বার্থরক্ষার জন্য বা বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের জন্য বা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য উৎপীড়িত হয়েছে সোভিয়েট রাশিয়া সর্বদা তাদের আশ্রয়দানে উন্মুখ।

নাগরিকদের কর্তব্যসমূহ
Duties of the Citizens

মূলগত অধিকারের অধ্যায়েই নাগরিকদের কতকগুলি কর্তব্যপালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সবদেশের নাগরিকই রাষ্ট্রের প্রতি কতকগুলি কর্তব্য পালন করে। কিন্তু সেগুলি সংবিধানে লিখিতভাবে নির্দেশ করা হয় না। সোভিয়েট সংবিধানে কর্তব্যসমূহের লিখিত নির্দেশের অর্থ হল রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় নাগরিকগণ শুধু সুবিধা সুযোগের ক্ষেত্রেই নয়, দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসে। এই কর্তব্যগুলি হল: (১) সংবিধান মেনে চলা, (২) আইনের নির্দেশ পালন করা, (৩) শ্রমশৃঙ্খলা বজায় রাখা, (৪) সততার সঙ্গে সরকারী কাজ করা। (৫) পরিশ্রমে অবহেলা না করা। (৬) সমাজতান্ত্রিক আদানপ্রদানের নীতিটিকে সম্মান দেওয়া। (৭) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ। (৮) দেশরক্ষার্থে সামরিক বাহিনীতে যোগদান এবং (৯) নাশকতামূলক কার্যকলাপ ও গুপ্তচরবৃত্তি থেকে নিরত থাকা।

নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

(Selected Questions)

ব্রিটিশ সংবিধান (Constitution of U. K.) :—

1. Distinguish between Law and Conventions. Enumerate some of the important conventions prevalent in England. What are the sanctions behind the conventions ?

2 What is meant by Rule of Law in England ? Is there any shortcoming in its application ?

3. Explain the position and powers of the Monarch in the British Constitutional system. C. U. 61.

4 Explain the conceptual distinction between the King and the Crown. What are the prerogatives of the Crown ?

5. How is it that Monarchy survives in England in spite of the democratic set-up of the government there ?

6 Enumerate the basic principles and features of the British Cabinet system. Explain in this connection what is meant by 'Collective Responsibility'.

7 What are the principal functions performed by the British Cabinet ?

8 Discuss the position of the Cabinet in the British Constitution with special reference to its relation to (*a*) the Crown and (*b*) the Parliament C. U. 59.

9. Discuss the relationship between the Cabinet and the House of Commons in England—C. U. 57. How far in this connection are you prepared to accept the charge of 'Cabinet Dictatorship' ?

10. Explain the relation of the British Prime Minister to the Sovereign, the Cabinet, the Parliament and the Party. C U '53.

11. Do you think that the Supremacy of the Parliament is a legally established fact in England ?

12 Describe the composition and function of the House of Lords in Great Britain. C. U. 54.

13. "The House of Lords in England should be abolished, retained in its present from or reformed"—With which of these views do you agree ? Give reasons for your answer. C. U. 54.

14. How is the British House of Lords composed ? Is it now a very important limb of the British legislative ? C. U. 62.

15. Distinguish between a Public Bill and a Private Bill in British Parliamentary practice. What are the stages through which a Public Bill must pass before it can become an Act of Parliament ?

C. U. 61.

16. Write a short note on the position of the Speaker in England.

17. Discuss the role of opposition in the British Government.

18. "Bureaucracy thrives under the cloak of Ministerial Responsibility in England'. Do you agree ?

মার্কিন সংবিধান (Constitution of U. S. A.) :—

1. Discuss the position and powers of the President of U. S. A.

2. How does the President influence legislation ? C. U. 54.

Or, Describe the position of the President in relation to the Congress C. U. 56.

3. Describe the composition of the American Senate and discuss why it is called the most powerful Second Chamber in the World.

C. U. '57 60.

4. What are the powers of the Congress in the U. S. A ?

C. U. '53.

5. Discuss the nature and composition of the Cabinet in the U. S. A., and its role in the government of the country. C. U. '62.

Or, Comment on the relation between the President and the Cabinet in U. S. A.

6. Discuss the position and functions of the Supreme Court in the constitutional system of the U. S. A. C U. 58.

7. Write a short note on the process of amendment of the constitution of the U. S. A. C. U. 55.

সুইস সংবিধান (Constitution of Switzerland) :—

1. Discuss the peculiar features of the Swiss constitution.

C. U. '54. '56, '58, '60.

2. Point out the characteristic features of the Federal Council of Switzerland and discuss its position in relation to the Federal Assembly. C. U. '60.

Or, Discuss the position and function of the federal executive in the Swiss Constitution. C. U. '55, '57, '58.

3. Explain how the Swiss Constitution provides for direct popular legislation. C. U. '59.

4. Write a note on the working of Direct Democracy in Switzerland.

5. How are the Judges of the Federal Courts in Switzerland chosen? What is its role in maintaining the balance of powers between the Confederation and the Cantons? C. U. '62.

সোভিয়েট সংবিধান (Constitution of the U. S. S. R.) :—

1. State the salient features of the constitution of the U. S. S. R. C. U. '55.

2. Analyse the structure of the state in the U. S. S. R. and discuss in that connection the nature of the Soviet Federation. C. U. '60.

3. Discuss how far the U. S. S. R. is a socialist state of workers and peasants. Is there any scope for private enterprise in the U .S. S. R ? C. U. '58.

4. Describe the composition and functions of the Supreme Soviet of the U. S. S. R. C. U. '59, '61.

5. How is the Presidium of the Supreme Soviet in U. S. S. R. composed? Enumerate its functions. C. U. '62.

6. Describe briefly the judicial system of U. S. S. R. C. U. '56.

7. Analyse the implications of the Rights and Duties of the individual in the Soviet Constitution.

8. Discuss the role of the Communist Party in the government of the U. S. S. R. How far do you think that one-party system is repugnant to democracy?

বিশেষ সংযোজন

ইংল্যাণ্ডে 'পীয়ার' সংক্রান্ত নূতন বিল ঃ

এতদিন ইংল্যাণ্ডে লর্ডের মর্যাদা উত্তরাধিকারসূত্রে আবশ্যিকভাবে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ন্যস্ত হত। এর ফলে কমন্সসভার রাজনীতিতে যোগদানেচ্ছু লর্ডগণ ইচ্ছার বিরুদ্ধেও লর্ডস সভাতেই আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হতেন। সম্প্রতি (৩১শে জুলাই, ১৯৬৩) একটি নূতন বিল পাশ হওয়ার ফলে লর্ডগণ ইচ্ছাকরলে লর্ড উপাধি ত্যাগ করতে পারবেন এবং কমন্সসভায় নির্বাচনের অধিকার লাভ করবেন।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন			
৬৫	১২	বিস্তৃতির	স্থলে	বিবৃতি
৭৪	শেষ লাইন	Harriott	"	Marriott
১০৯	হেডিং	U. S. S.	"	U. S. A.
"	মার্জিন	Faderation	"	Federation
১৩৬	১১	house	"	chamber
১৬১	২৩	১৯১৯	"	১৯১৮
১৬৫	১৩	সাদৃশ্য উদ্দেশ্যের	"	সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দেশ্যের
১৬৫	২১	নিয়ন্ত্রণের ধাপে	"	নিয়ন্ত্রণের ফলে
১৭৫	২৭	অপ্রসারিতব্য	"	অপসারিতব্য
১৯১	১৪	অন্যান্য	"	অন্যায্য
১৯২	২১	Equality	"	Equity